GIFT

বাংলাদেশে আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আবুল হাশিমের অবদান

এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

465262

গবেষক

আবদুল মোক্তাদের
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Library
465262

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ মোহাম্মদ ইউছুফ
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

DIGITIZED

ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ইং

Dr. Mohammad Yosuf
Professor
Dept. of Arabic, University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.

الدكتور محمد يوسف
أستاذ
قسم العربية، جامعة داكا
داكا-١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No. .....

Date 21.08.2012

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ঢাকা বিভাগের অধীনে এম.ফিল গবেষক আবদুল মোক্তাদের (রেজিঃ নং-৮৪, শিক্ষাবর্ষ-২০০৮-০৯) কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"বাংলাদেশে আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আবুল হাশিমের অবদান"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে উক্ত গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এটি তথ্যবহুল ও একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতিঃপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

465262

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তারিখঃ

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

Tel: 9661920-73 Ext: 6473, 02-9673737 (R) Fax: 880-2-9615277 Mob: 01718-082595 Email: department.arabic@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশে আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আবুল হাশিমের অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম।

গবেষক

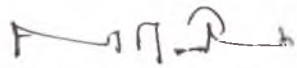

(আবদুল মোত্তালেব)
রেজিঃ নং-৮৪
শিক্ষাবর্ষ-২০০৮-০৯
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

465262

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ-সংক্ষেপ

অনুঃ	ঃ	অনুবাদ
ইফাবা.	ঃ	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	ঃ	খণ্ড
খ্রী.	ঃ	খ্রীস্টাব্দ
জ.	ঃ	জন্ম
ড.	ঃ	ডক্টর
তা.বি	ঃ	তারিখ বিহীন
তাং	ঃ	তারিখ
দ্র.	ঃ	দ্রষ্টব্য
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
মৃ.	ঃ	মৃত্যু
সং	ঃ	সংস্করণ
সম্পাঃ	ঃ	সম্পাদনা/সম্পাদিত
সাঃ	ঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	ঃ	হিজরী সাল
বাং.	ঃ	বাংলা সন
রা	ঃ	রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
রহ.	ঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহি

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য যাঁর অশেষ রহমতে অত্র অভিসন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। অসংখ্য দরূদ ও সালাম আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি।'

এই গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু 'আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪)। তাঁর জন্ম পশ্চিম বাঙলায় হলেও বিচরণক্ষেত্র ছিল উভয় বাঙলায়। তিনি ছিলেন একাধারে একজন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, রব্বানী দর্শনের উদ্যোক্তা ও রূপকার, ইসলামের বিপ্লবী ভাষ্যকার, আপোষহীন রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত আইনজীবী, পাকিস্তান আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা এবং ভাষাভিত্তিক বহু জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা। তবে আবুল হাশিমের প্রধান পরিচয় তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী প্রখ্যাত ইসলামি দার্শনিক।

তিনি ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের পূর্বের তরুণ নেতাদের থেকে শুরু করে আজকের বাংলাদেশে বিভিন্ন দলের প্রবীণ নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন আবুল হাশিমের রাজনৈতিক ছাত্র।

মাঝ বয়সেই আবুল হাশিম অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বলতে গেলে এই অন্ধত্বই তাঁর মনের অন্দর খুলে চিন্তারাজ্যে বিচরণ করার সুযোগ এনে দেয়। তিনি গতানুগতিক কোন মাদ্‌রাসায় লেখা-পড়া করেননি। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পেশাদার শিক্ষক বা কোন মসজিদের ইমামও ছিলেন না। তিনি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তথাপি তিনি মৌলভী বলে পরিচিত ছিলেন। কুরআন-হাদীসের যথার্থ শিক্ষাকে তিনি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সামনে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার কারণেই এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশে আরবী চর্চা শীর্ষক আমার এই থিসিসে আবুল হাশিমের ধর্মীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক বিশেষত ধর্মদর্শন স্থান পেয়েছে। তিনি মনে করেন, কালিমা তথা ইসলামের মানবিক মূল্যবোধগুলো এতদিন পর্যন্ত লেখাই হয়নি। তাই তিনি কালিমার মূল্যবোধগুলো সহজ-সরল ভাষায় জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে তাঁর কার্যাবলী এবং ইসলামি জ্ঞান-গবেষণায় তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, সে সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই এ মনীষীর যথার্থ মূল্য উদঘাটনের প্রয়োজনেই এ বিষয়ে আমি গবেষণা করার প্রয়াস পেয়েছি।

থিসিস রচনা করতে গিয়ে আমি আবুল হাশিমের চিন্তাধারা সম্পর্কিত যাবতীয় প্রাপ্ত সূত্রের ব্যবহার করেছি। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ছিল আমার এ গবেষণার প্রধান অবলম্বন। এখানে আবুল হাশিমের রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধাবলি, বক্তৃতাবলির অনেক কিছুই রয়েছে। তাছাড়া বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মাদ্‌রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটিসহ, দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহায়তা নিয়েছি। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি থেকেও বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

এই অভিসন্দর্ভে আমি সৈয়দ মনসুর আহমদ সম্পাদিত "আবুল হাশিম তার জীবন ও সময়"-এই গ্রন্থটি থেকে অনেক তথ্য গ্রহণ করেছি। আবুল হাশিমের লেখা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর রচনাবলি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। কোথাও কোথাও তাঁর ভাষ্যের বাংলা ভাবধারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি; যাতে করে আবুল হাশিমের চিন্তা-চেতনার সাথে পাঠক/পাঠিকার যথাযথ পরিচিতি ঘটে। প্রয়োজনীয় স্থানে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি ।

এই অভিসন্দর্ভটি আমার দীর্ঘ ২ বছরের অক্লান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফসল। এ সময়ে আমি অনেকের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর বাসায় রয়েছে ইসলামি বইয়ের বিরাট কালেকশন। রয়েছে অসংখ্য এম. ফিল ও পিএইচ.ডি. গবেষণাপত্র সেগুলো দ্বারা আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। আমার জন্য তিনি যেভাবে ত্যাগ-তিতীক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভের আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, সত্যিই তাঁর তুলনা হয় না। এজন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আজ তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রভাষক বেলাল হোসেন আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণা-কর্ম চালিয়ে যাওয়ার সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও প্রিয়জনেরা বিশেষ করে আমার পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ী এবং ভাইয়েরা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন ও সাহস যুগিয়েছেন, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী রওশন আরা আক্তার (নীলা)র কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ গবেষণার সময়কালে আমার সমস্ত চিন্তা ও কর্মকাণ্ড একনিষ্ঠভাবে পরিচালিত হত থিসিসকে কেন্দ্র করে। এজন্য সংসারের সিংহভাগ দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হয়েছে। আমার যে কোন অর্জন তাঁর কাছেও পরম আনন্দের বিষয়। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে আমার পক্ষে গবেষণা - কর্মে অধিকতর মনোযোগী হওয়া সম্ভবপর হতো না। এজন্য আজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আবুল কালাম আজাদ, মোঃ ফজলুল করিম এবং মোঃ জাহিদুল ইসলাম গবেষণা থিসিসের পাণ্ডুলিপি সযত্নে টাইপ কম্পোজ করে দিয়েছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কম্পিউটার কাজে আরো অনেকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই দো'আ করি তিনি যেন আমাদের সকলের সহযোগিতাকে কবুল করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম কল্যাণ দান করেন। (আমীন)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই উপমহাদেশে যে সব ইসলামি চিন্তাবিদ আরবী চর্চা এবং ইসলামি আদর্শ প্রচারে অন্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে আবুল হাশিম অন্যতম। তিনি একাধারে একজন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, রব্বানিয়াত মতাদর্শনের উদ্যোক্তা ও রূপকার, ইসলামের বিপ্লবী ভাষ্যকার, আপোষহীন রাজনীতিবীদ, প্রখ্যাত আইনজীবী, পাকিস্তান আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার অন্যতম প্রস্তাবক এবং ভাষাভিত্তিক বহুজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন।

তাঁর নাম আবুল হাশিম। তিনি ২৭ জানুয়ারি ১৯০৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় কাশের নগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আবুল কাশেম পশ্চিম বঙ্গের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন।

আবুল হাশিম অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে গড়ে উঠেন। পারিবারিকভাবে তাঁরা অত্যন্ত সচ্ছল ছিলেন। তাঁর পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তি তৎকালীন সরকারের উচ্চ পদে আসিন ছিলেন। বাল্যকাল হতে তাঁর শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে তিনি তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন। অতঃপর তিনি ১৯২৩ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল ইংরেজি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং পরবর্তীতে ১৯২৫ সালে বর্ধমান ঐতিহ্যবাহী রাজ কলেজ থেকে আই এ পাস করেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এই উপমহাদেশে মুসলিম চিন্তাবিদ আবুল হাশিম অত্যন্ত জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে কোন প্রকার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা ছিল না। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি খুব আল্লাহ ভীরু ছিলেন। তিনি তৎকালীন এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে ইসলামি মূল্যবোধ চর্চার অভাব অনুধাবন করতে পেরে ইসলামি মূল্যবোধ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি তমুদ্দুন মজলিশ নামে একটি সংগঠন গঠন করেন, যার মূল দর্শন ছিল 'রব্বানিয়াত'। তিনি একাধারে কোরআন বিশারদ, লেখক, দার্শনিক, রাষ্ট্রের পরামর্শদাতা ছিলেন। আরবী চর্চা ও ইসলামের মৌলিক তত্ত্বাদি কিভাবে মানুষের মাঝে প্রসার লাভ করা যায় তার উপরও ব্যাপক দিক নির্দেশনা তিনি দিয়ে গেছেন, যা সকলের জন্য অনুকরণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিমের রচিত বিশ্ববিখ্যাত দুটি গ্রন্থের (**Arabic Made Easy** এবং **The Creed of Islam**) মধ্যে ইংরেজি ভাষায় লিখিত **Arabic Made Easy** বইটিতে আরবী ভাষার ব্যাকরণকে অত্যন্ত সহজভাবে পাঠকের নিকট তিনি উপস্থাপন করেছেন যাতে করে আরবী ভাষা, বিশেষ করে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান তাপসী পাঠকবৃন্দ আরবী ভাষা বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হন। একইভাবে অপর গ্রন্থ **The Creed of Islam** এ তিনি মানবীয় কাজ কর্মের পর্যালোচনা, বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক বিপ্লব, নৈতিক বিপ্লব, বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে সকলের মাঝে তুলে ধরেছেন যার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সবার কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই ভারতীয় উপমহাদেশে দুশত বছর বৃটিশরা শাসন করাতে এই অঞ্চলের মুসলমানরা মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে। বৃটিশদের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তা ছিল ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এই ধরণের এক সামাজিক পরিস্থিতিতে আবুল হাশিম ইসলামের তথা কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান দার্শনিক মতবাদ দিয়েছেন। তাই আমি আবুল হাশিমের বিভিন্ন রচনাবলি পর্যালোচনা করত এবং তার সুদীর্ঘ সংগ্রামী কর্মময় জীবন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ কিভাবে জনসাধারণের সম্মুখে বর্ণনা করেছেন তা তুলে ধরেছি। তারই পাশাপাশি তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে আরবী চর্চা করেছেন এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী চর্চা কিভাবে মানুষের মাঝে এ অঞ্চলে প্রসার করা যায়। উপরে বর্ণিত এসব বিষয়াদিতে আবুল হাশিমের অনুসৃত দুর্লভ নীতি সমূহ পাঠকের মাঝে উপস্থাপন করা আমার অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মুমিনদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন? যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে" (সূরা আত-তাওবা ১২২)। একজন পাঠক হিসেবে অত্র আয়াতের উপর গুরুত্বারোপ করে আমি আরবী ভাষার চর্চা এবং যুগোপযোগী ইসলামী মূল্যবোধ বিষয়ে ধারণা দেয়ার উপর গবেষণা করার প্রয়াস পাই। যাতে মানুষ সহজে কোরআন ও হাদীসের মর্মকথা অনুধাবন করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুসৃত নীতিসমূহ পালন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীতে এই উপমহাদেশে আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে আবুল হাশিমের চিন্তা-চেতনা নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক। তিনি এই চিন্তা চেতনা তাঁর এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এবং লেখনী শক্তির মাধ্যমে সমাজের নিকট আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন ধর্মীয় বইয়ের মাধ্যমে একজন মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের আলোকে কীভাবে জীবন পরিচালনা করা উচিৎ তা ব্যাপক আকারে পর্যালোচনা করেছেন এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **Arabic Made Easy** বইটিতে কিভাবে সহজ পন্থায় একজন অনারব লোক শুদ্ধভাবে আরবী ভাষা শিখতে পারেন তাও তুলে ধরেছেন।

এ অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করে প্রত্যেক অধ্যায়ে পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ের নাম হল **"বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'** বাংলার আর্থ-সামাজিক, ইসলামী শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একটি সমাজের আর্থ - সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে সমাজের ব্যক্তিদের উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভার বিস্তার করে থাকে। ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা গড়ে উঠে তাঁর সমসাময়িক সার্বিক অবস্থার ভিত্তিতে। সুতরাং একজন ব্যক্তির ভাবধারার মূল্যায়ন করতে হবে তার সমসাময়িক সার্বিক অবস্থার ও ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সংগত কারণেই এ অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হল **"আবুল হাশিম-এর জীবন ও কর্ম'** কোন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, জ্ঞান-গরিমা ইসলামী চিন্তা চেতনার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর আদ্যপান্ত জানা অত্যাবশ্যক। এই অধ্যায়ে আবুল হাশিমের বংশীয় পরিচয়, পারিবারিক অবস্থান, জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা,মানসিক বিবর্তন, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি, স্বভাব-চরিত্র, মৃত্যু সংবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম হল **"আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আবুল হাশিমের অবদান'**। এ অধ্যায়ে মূলত আবুল হাশিম-এর কিছু তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ বিশেষ করে আরবী চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি তাঁর দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হল **"আবুল হাশিম-এর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি'**। ইসলামের মূলমন্ত্র কালিমাকে আবুল হাশিম বিপ্লব নামে অভিহিত করেছেন এবং গোটা ইসলামকে কালিমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত কালিমার বিপ্লবের পরিধি বর্ণনা করে কোন দিন শেষ করা যাবে না। তবে আবুল হাশিম কোন্ কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে কালিমাকে বিপ্লব এবং সম্পূর্ণ ইসলামের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করেছেন, তার যথা সম্ভব ব্যাখ্যা করার জন্য আমি কালিমার আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামী চিন্তা-চেতনা সম্পর্কীত বিষয় এ অধ্যায়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম হল **"আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিন্যাসে আবুল হাশিম-এর রচনাবলি'** এ অধ্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি বইয়ের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তাঁর আরবী চর্চার প্রতি ভালবাসা এবং স্বতন্ত্র দার্শনিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ অধ্যায়ে আবুল হাশিমের চিন্তার সাথে উপমহাদেশের সমকালীন এবং পূর্বাপর দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীর ভাবধারা ও চিন্তাধারার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যতা ও মতভেদ রয়েছে, সে সমস্ত বিষয় আলোচ্য অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

❑ **বাংলাদেশ প্রসঙ্গ** ১-৪৮

১. বাংলাদেশের অভ্যুদয় ১
২. ভৌগলিক অবস্থান ২৮
৩. বাংলার আর্থ–সামাজিক পরিস্থিতি ২৮
৪. বাংলায় মুসলমানদের আগমন ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

❑ **আবুল হাশিমের জীবন ও কর্ম** ৪৯-৯৩

১. বর্ধমান জেলা পরিচিতি ৪৯
২. আবুল হাশিমের জন্ম ও বংশ পরিচয় ৫০
৩. আবুল হাশিমের শিক্ষা ও সংগ্রামী জীবন ৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

❑ **আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আবুল হাশিমের অবদান** ৯৪-১৪২

১. ভূমিকা ৯৪
২. বাংলাদেশে আরবী চর্চার অতীত ও বর্তমান ৯৪
৩. ইসলামী মূল্যবোধ/দর্শনে আবুল হাশিমের চিন্তাধারা ১০৯
৪. আবুল হাশিমের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্যান্য চিন্তাবিদের সামঞ্জস্যতা ও বৈপরিত্য ১৩০

চতুর্থ অধ্যায়

❑ **আবুল হাশিমের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি** ১৪৩-১৬১

১. আধ্যাত্মিক বিপ্লব ১৪৩
২. নৈতিক বিপ্লব ১৫৩
৩. শিক্ষা বিপ্লব ১৫৪
৪. সামাজিক বিপ্লব ১৫৭
৫. সাংস্কৃতি বিপ্লব ১৬০

পঞ্চম অধ্যায়

❑ **আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিন্যাসে আবুল হাশিমের রচনাবলি** ১৬২-২৬১

১. জ্ঞান চর্চায় আবুল হাশিম ১৬২
২. Arabic Made Easy ১৬৬
৩. The Creed of Islam ১৭২
৪. গবেষণা ধর্মী ও গ্রন্থ রচনা ও পর্যালোচনা ১৮৯
৫. পরিশিষ্ট ২১৬
৬. উপসংহার ২৩০
৭. গ্রন্থপঞ্জি ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ

১৯৩০ সাল থেকে অনুসৃত মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি ভারত উপমহাদেশে সংগঠিত হয়েছিল তার পরিণতিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় পাকিস্তান ও ভারত এই দুই রাষ্ট্রে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পেছনে ছিল মুসলিম জাতীয়তা ভিত্তিক চেতনা। পাকিস্তানের পূর্বাংশ বাংলায় ১৯৪৭ সালের পর থেকে পৃথক জাতিসত্তার ভিত্তিতে যে রাজনীতি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দানা বাঁধতে থাকে তারই পরিণতিতে পূর্ব-বাংলা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ নামে এক নতুন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।[১] উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ সালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের জন্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত বলতে তিনি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে বুঝিয়েছিলেন। মুসলিম প্রধান বাংলা তার চিন্তায় ছিল না।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তুত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে দুটি 'স্টেট' গঠনই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা। বস্তুত এই প্রস্তাবে কনফেডারেশনের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ছিল। একটি পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে এবং অপরটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব-সিন্ধু-সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে।[২] উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থ সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন দৃষ্টিসম্পন্ন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি ১৯৪৬ সালে দিল্লী মুসলিম লীগের লেজিসলেটরস কনভেনশনে সুকৌশলে 'লাহোর-প্রস্তাব' সংশোধনপূর্বক 'স্টেটস'-এর স্থলে 'স্টেট' করে এককেন্দ্রিক পাকিস্তানের কাঠামো গ্রহণ করেন।

---

১. বদরুদ্দীন উমর, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ মুক্তধারা, ঢাকা ১৩৭৮, পৃ. ৬০।
২. তোফাজ্জেল হোসেন (মানিক মিঞা), পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা ১৮৮১.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহ সাহেবের নির্দেশে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে মূল লাহোর প্রস্তাবের 'States' শব্দটি 'State' এ-রূপান্তরিত করা হয়। অর্থাৎ পাকিস্তান হবে একটি মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র। এই প্রস্তাবের প্রথম নম্বর উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, That the Zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Pun‡jvab, hte N.W. Forntier Province Sind and Baluchistan in the North-West of India, Namely the Pakistan Zones, where the Muslims are a dominant majority be constituted into one sovereign independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay.[3] এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের পরাধীনতার সনদ রচিত হয়।

মিঃ জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের বহুবচনসূচক 'স্টেটস' কথাটির মুদ্রণবিভ্রাট হিসেবে বর্ণনা করে তাঁর নিজস্ব রাষ্ট্রীয় চিন্তা ভাবনার স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন। আসলে জিন্নাহর লক্ষ্য ছিল একটি মাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা। দিল্লী কনভেনশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বাংলার মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম এই পরিবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মুসলিম লীগ কাউন্সিলে গৃহীত লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করার অধিকার মুসলিম লীগ আইন সভার সদস্য কনভেনশনের নেই।[৪]

লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান আন্দোলনকালে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি বিধান-কল্পে ধর্মকে ব্যবহার করা হলেও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ-ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ চাকরি-বাকরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, জমিদারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সে আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা এবং ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একটি নিজস্ব শাসন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। আর এই উদ্দেশ্যেই অখণ্ড ভারতের মুসলিম অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব রচিত হয়।[৫]

---

৩. দৈনিক ইত্তেফাক সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা মার্চ, ১৯৬৪।

৪. বাঙলাদেশ (মনসুর মুসা সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী ঢাকা ১৯৯৪ পৃ-২৪৭।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত ঐ লাহোর প্রস্তাবই ছিল উপমহাদেশের মুসলিম আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রস্তাব ভিত্তিক আন্দোলনকালে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হলেও, ঐ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল মুসিলম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আর সেই কারণে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ দু'টি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি জন্মলাভ করেছিল। বৃটিশ শাসিত ভারত সাম্রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর আধিপত্য বিস্তারের আশঙ্কায় সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে একটি পৃথক আবাসভূমির জন্য প্রচেষ্টা ইতিহাসের অমোঘ বিধানে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে মুসলিম সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। তাই শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য একটা নতুন কিছু আশা করেছিল। এভাবে ঐতিহাসিক কারণেই মুসলিম জাতীয়তাবাদ জন্ম দেয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের।

ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তান ছিল একটি বিচিত্র রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধানে বিশ্বে এর দ্বিতীয় নজির বলতে গেলে নেই। পাকিস্তানের দুইটি অংশ পরস্পর হতে পনেরশো কিলোমিটার বিদেশি এলাকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। শুধু ভৌগোলিক দিক হতেই অবাস্তব নয়, অন্যান্য দিক হতেও যেমন সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং অর্থনীতি-দুটি অঞ্চলে বিরাট পার্থক্য।[৬] একমাত্র ধর্ম ইসলাম ও বিদেশি ভাষা ইংরেজি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তাদের মধ্যে মৌলিক ঐক্যবন্ধন ছিল না। পাকিস্তানের ঐ অন্তর্নিহিতো দুর্বলতা পরবর্তীকালে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া বলেছিলেন: "পাকিস্তানের সৃষ্টি সম্পূর্ণ কৃত্রিম; তার দুই অংশের মাঝখানে এক হাজার মাইল ভারতের ভূখণ্ড পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান সম্পর্ক টিকতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের দাস হয়ে পড়বে, নয়তো পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক শিথিল হতে থাকবে।[৭] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ আহমেদ হাসানদানী পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর উপর আলোকপাত করে মন্তব্য করেছিলেন যে, ইতিহাসের গতিতে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে।[৮]

---

৬. মানিক মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র দ্বাদশ খন্ড, বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২, পৃ ৬৯৪

৮. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫-৭৫, ঢাকা ১৯৮২, পৃঃ৪৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দূরবর্তী অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ নিহিতো ছিল ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থানের সকল বৈপরিত্বকে উপেক্ষা করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনার অভিনবত্ব। দ্বিতীয়ত ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন নানান ভাষাভাষীদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের উপযোগী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামো অন্বেষণে পাকিস্তানী নেতৃবর্গের সম্যক ব্যর্থতা। ফলে পাকিস্তানের কাঠামোগত স্ববিরোধিতার প্রশমন ঘটেনি, বরং এক বিরুদ্ধ স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে ওঠে।[৯] ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়েছিল। কিন্তু তারাই আবার পাকিস্তান ত্যাগ করে স্বাধীনতার মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটিই আধুনিক ইতিহাসের চমকপ্রদ ঘটনা। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের জীবনে বাংলার উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের নির্মম অন্যায়-অবিচার ও অগণতান্ত্রিক শাসন-শোষণই এর জন্য মূলত দায়ী ছিল।

মুসলিম লীগ ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তান ইস্যুর ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীরা সকলেই জয় লাভ করে। একথা বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, একমাত্র বাংলাদেশই অবিভক্ত ভারতের মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে পাকিস্তানের দাবিতে শতকরা ৯৭টি আসনে জয়লাভ করেছিল।[১০] পাকিস্তান অর্জনের প্রাক্কালে বাংলাদেশেই মুসলিম লীগ সরকার কায়েম ছিল। ঐ সময়ে বাংলাদেশের তুলনায় পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি বহুলাংশে নিস্পৃহ ছিল। তাই এসব প্রদেশে কংগ্রেস রিপাবলিকান ও মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বাংলার মুসলমানগণ পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[১১] তারা শতকরা ৯৬ ভাগ ভোট দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে জোরালো মতোমতো ব্যক্ত করেন। ঐতিহাসিকভাবে একথা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশ পাকিস্তান আন্দোলনের স্তম্ভ ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯০৬ সালে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বেই ঢাকায় মুসলিম লীগের মাধ্যমেই পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল। সর্বোপরি ১৯৪০ সালে যিনি লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তিনি ছিলেন বাংলার নেতা এ. কে. ফজলুল হক।[১২]

---

৯. মঈদুল হাসান, মূলধারা ৭১, ইউপিএল ঢাকা ১৯৮৬ পৃ.১।

১০. বাংলার বাণী (স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা), মার্চ ২৬, ১৯৭২ পৃ.৩৩।

১১. ঐ, পৃঃ ৪৯।

১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র চতুর্থ খন্ড পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আধিপত্য বিস্তার করল পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী। ভারত থেকে আগত ধনিক মুসলমানগোষ্ঠী এবং সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থনে শাসকদল তাদের আসনকে পাকাপোক্ত করে। পাকিস্তানের অন্যান্য জাতি ও অংশের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য ইসলামি জাতীয়তাবাদের জিগির তোলে এবং ভারতীয় আধিপত্যের ভয় দেখিয়ে লাহোর প্রস্তাবের ওয়াদা থেকে শাসকচক্র দূরে সরে যায়। লাহোর প্রস্তাবে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে প্রত্যেক প্রদেশ স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মর্যাদায় এক জাতি হিসেবে থাকবে। কিন্তু পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখার জন্য লাহোর প্রস্তাবকে তারা বস্তুত বর্জন করল এবং নিজেদের আধিপত্যকে কায়েম করতে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলল।[১৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জনগণের আত্মত্যাগের দ্বারা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তারা দেখেছিল তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবং আশা- আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা। তাঁরা ভেবেছিল পাকিস্তান কায়েম হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার পাবে, ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে, আল্লাহর চোখে সবাই সমান এই ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠবে। অর্থাৎ সকল প্রকার ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্তি এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন এই প্রত্যয় নিয়ে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বল্পকালের মধ্যেই সমস্ত প্রেরণা ধোঁয়ার মতো উড়ে যেতে লাগলো। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিন্ন-ভিন্ন হতে লাগালো। বাংলাদেশের মানুষ বুঝল যে, বাংলার হিন্দুদের আধিপত্যের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যের কবলে পড়েছে। বস্তুতঃপক্ষে ১৯৪৭ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের উপর মুসলিম লীগ সরকারের শোষণ ও নির্যাতন শুরু হয় এবং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানের আল্লাহ এক, ধর্ম এক, রাসূল এক এবং কিতাব এক এই যুক্তিতে রাজনৈতিক দলও হবে এক, এই বলে প্রচার চালাল তারা। একই যুক্তিতে তারা বলতে শুরু করল, বিরোধী দল মাত্রই বিদ্রোহী।[১৪]

---

১৩. দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ আগস্ট ১৯৭০।

১৪. দৈনিক সংবাদ, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানে কোন নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে দিতে সম্মত ছিলেন না। ১৯৪৮ সালে ঢাকা সফরকালে রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "ব্যাঙের ছাতার মতো যেসব পার্টিগুলো গজিয়ে উঠেছে সেগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখা হবে।" ঐ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রথম সমাবর্তন উৎসবে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও তিনি নতুন দল গঠনকারীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "ব্যাঙের ছাতার মতো নতুন পার্টি গঠন না করে মুসলিম লীগকে সমর্থন ও তাতে যোগদান করতে হবে।" তাছাড়া মিঃ জিন্নাহ ঐ দুটি ভাষণে পূর্ব বাংলার উদীয়মান নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে পঞ্চম বাহিনী, কমিউনিস্ট, ভারতের দালাল, দেশের দুশমন ইত্যাদি বলেও গালমন্দ করেন।[১৫] আসলে জিন্নাহ বাঙালি বিদ্বেষী পাকিস্তানী আমলাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই পটভূমিতে আওয়ামী লীগের জন্ম এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রায় তিনশ মুসলিম লীগ কর্মীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনেই মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতিয়ার পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐ প্রথম রাজনৈতিক দল। আওয়ামী মুসলিম লীগের ঘোষণাপত্রে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দানের দাবি উত্থাপন করা হয়।[১৬] আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন গতিবেগ লাভ করে। এ.এফ. সালাউদ্দীন আহমদ যথার্থই বলেছেন, "The break-up of the Muslim League and the emergence of Awami League signified a new Development in the political life of Pakistan. [১৭] মনে রাখতে হবে যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট, পাকিস্তান কায়েম হবার সময় পাকিস্তানে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না।

তখন জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল মুসলিম লীগের উপর। একদা মুসলিম লীগ ছিল পাক-ভারতের মুসলমানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ব প্রান্তে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব জনগণের মন থেকে মুছে যেতে থাকে।

---

১৫. আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুক্তিসংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা পৃ-৪৫।
১৬ .অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা ১৯৭২, পৃ ২৩৪।
১৭ .A.F Salauddin Ahmed, Bangladesh : Tradition Transformation UPL, Dhaka 1987.p.89.

Dhaka University Institutional Repository

তখন জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল মুসলিম লীগের উপর। একদা মুসলিম লীগ ছিল পাক–ভারতের মুসলমানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ব প্রান্তে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব জনগণের মন থেকে মুছে যেতে থাকে। এভাবে মুসলিম লীগের শোচনীয় অধঃপতনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের জয়যাত্রা সূচিত হয়।[১৮] ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের জন্ম হলো।

স্বাধীনতা অর্জনকারী দল হিসেবে ভারতীয় কংগ্রেসের মতো মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দৃঢ়তা ছিল না। কারো কারো মতে ভারতীয় উঠতি বুর্জোয়া এবং একচেটিয়া পুঁজির মুখপাত্র হিসেবে ভারতীয় কংগ্রেস সাফল্যের সঙ্গে শাসন পরিচালনা করলেও পাকিস্তান মুসলিম লীগ জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনীর কাছে নতি স্বীকার করে। মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির মূল রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল সত্য, কিন্তু ঐ মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল দু'টি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য। একটি হলো, বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের জমিদার শ্রেণি, যারা সে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য ধনিক শ্রেণির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৃটিশ আমল থেকেই পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অনেকাংশে হিন্দু ধনিক শ্রেণি কর্তৃক শোষিত হতে থাকে। তাই ১৯৪৭ সালে যখন মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ওঠে তখন পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ নতুন পথের দিগন্ত খুঁজে পায়। আর একারণে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মোহ ভেঙ্গে যায়। কেননা, তাদের কল্পিত পাকিস্তানে যে স্বপ্নের স্বাদ তারা পেতে চেয়েছিল সে পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তানের শাসকবর্গ নিজেরাই। শাসকবর্গ নিজেরাই প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকমহলো পূর্ব–পাকিস্তানকে একটি কলোনী হিসেবে গ্রহণ করে। (যার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।) পাকিস্তানী শাসনামলে বাংলাদেশের ইতিহাস মূলত শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। গোড়া থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব–পাকিস্তানের ভাষা, সাহিত্যে–সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করতে থাকে। এর ফলে বাঙালি জনমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।[১৯]

---

১৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র (প্রথম খন্ড) পৃ. ৫৯৪।

১৯. আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া, বাংলাদেশের বিপ্লবের স্বরূপ (সেমিনার পেপার), বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির৩য় সম্মেলন ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

দূরীকরণের দাবি করে এসেছে। পূর্ব ও পশ্চিমের এই বিরোধ ছাড়াও সামরিক বনাম বেসামরিক শাসনের বিষয় ছিল দেশের আর একটি মূল রাজনৈতিক বিতর্ক। ১৯৪০ সালে প্রণীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মর্মবস্তু অগ্রাহ্য করে তৎকালীন ভারতের পূর্ব ও উত্তর–পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ অবধি ক্ষমতোশীল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক শাসন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত গৌরবদীপ্ত একটানা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির সুপ্ত জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে।[২০] প্রকৃতপক্ষে লাহোর প্রস্তাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা পাকিস্তানের ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফার শুরুতেই বলেছিলেন, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনে রূপ দিতে হবে। শেখ মুজিবসহ বাংলার সকল জাতীয় নেতাই শেষ পর্যন্ত মনে-প্রাণে লাহোর প্রস্তাব–ভিত্তিক ফেডারেশন হিসেবে পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাস হচ্ছে সেনাবাহিনী ও আমলাদের ক্ষমতো ভাগাভাগির ইতিহাস। তারা সাফল্যের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের দূরে সরিয়ে রেখে যৌথভাবে দেশটাকে শাসন করেছে। সেনাবাহিনী আর আমলা নেতৃত্বের কোন জনসমর্থন না থাকায় সাধারণত এরা সংগ্রামী জনতাকে ভয়ের চোখে দেখে। পাকিস্তানের ইতিহাসে বার বার সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫৩ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর আশ্বাস ও সমর্থন নিয়ে আইন পরিষদের আস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনকে বরখাস্ত করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রিত্ব ও প্রথম গণপরিষদ বাতিলকরণ এবং পুনরায় 'কেবিনেটস্ অব ট্যালেন্টস্' গঠন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আইয়ুব খানের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ মূলত সামরিক কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যের স্বাক্ষর।[২১]

লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে রাজনীতিকদের চেয়ে আমলাদের বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জিন্নাহ মন্ত্রীদের মর্যাদাকে

---

২০. হারুণ অর রশীদ, বাংলাদেশ গণতন্ত্রের সম্ভাবনা ঃ একটি রাজনৈতিক দর্শন, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ.১০।

২১. হাসান উজ্জামান, সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনীতি, ঢাকা ১৯৮৬ পৃ.-৮।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে রাজনীতিকদের চেয়ে আমলাদের বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জিন্নাহ মন্ত্রীদের মর্যাদাকে তুচ্ছ করে আমলাদের ও সেনাবাহিনীকে সরাসরি তাঁর কাছে অভিযোগ প্রদানে উৎসাহিতো করেছিলেন।[২২]

ঐ প্রাধান্য দানের পরিণতি হিসেবে শুধু দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিই বিপর্যস্ত হয়নি, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও গণমুখী রূপ ধারণ করতে পারে নি। এমনিভাবে গোড়াতেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতো কবজা করে বসেন; যা পরবর্তীকালে এক বিস্তৃত একনায়কত্ব পাকিস্তানের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করেছিল। তাই বলা হয়েছে, "After the birth of pakistan no attempt was made to build up a democratic tradition."[২৩] পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাসে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনও গড়ে উঠেনি। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সামরিক অভ্যুত্থান, নির্বাচনের রায় নস্যাৎকরণ, আমলাতন্ত্রের উপর অধিক নির্ভরশীলতা ও মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তন ছিল পাকিস্তানের রাজনীতির অন্যতম ঘটনা। পাকিস্তানের রাজনীতি কখনো সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে প্রবাহিতো হয়নি।[২৪] কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেন। তিনি গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে বিভিন্ন প্রদেশের সবল ও জনপ্রিয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত উপায়ে অভিযান শুরু করেন।[২৫] লিয়াকত আলীর চক্রান্তের ফলে সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। বাংলার যেসব মুসলিম নেতা পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল তাদেরকে ভারতের দালালরূপে চিহ্নিত করে তাদের উপর 'জেল জুলুম' চালাতে থাকেন।

---

২২. এ্যান্থনী মাসকারেহাস, বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা (ড. মযহারুল ইসলাম অনূদিত) বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৩ পৃ. ২২।

২৩. এ.চ ইযধঃঃধপযধৎলবব, জবহধরংংধহপব ধহফ ভৎববফড়স সড়াবসবহঃ রহ নধহমষধফবংয, ঈধষপঁঃঃধ, ১৯৭৩, চ় ১৪২-৪৩,

২৪. সাঈদুর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩, পৃ.২৮০।

২৫. তোফাজ্জল হোসেন, পূর্বোক্ত , পৃ. ৩৮৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গণপরিষদের মূলনীতির নির্ধারক কমিটির (Basic Principles Committee) রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট মূলত পূর্ববঙ্গের স্বার্থ পরিপন্থী ছিল। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার উপর একটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সারা প্রদেশব্যাপী স্বত:স্ফূর্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে সকল বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে 'গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের' লক্ষ্যে সংগ্রাম করার জন্য একটি 'কমিটি অব অ্যাকশন' গঠন করেন। পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বপক্ষে জনমতো সংগঠিত করার ব্যাপারে বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেন। এই কমিটির উদ্যোগে ১৩ই অক্টোবর ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং ঐ সভায় পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঢাকায় একটি 'জাতীয় মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর, ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন আয়োজিত মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের তদানীন্তন গণপরিষদের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন গণপরিষদ নির্বাচন করার ডাক দেয়া হয়। BPC সুপারিশমালার বিপরীতে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাল্টা সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। এই পাল্টা সুপারিশমালায় পাকিস্তানের জন্য একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইন সভার প্রস্তাব করে বলা হয় যে, এই আইন সভায় সদস্য সংখ্যা জনসংখ্যা হারের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হতে হবে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলা উর্দু দুটোকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়। এছাড়া কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতো বিভাজনের প্রশ্নে প্রস্তাব করার কথা বলা হয়। কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয় দু'টি থাকবে কেন্দ্রের হাতে, বাকিগুলো প্রদেশের এখতিয়ারে থাকবে।[২৬]

সম্মেলনে আতাউর রহমান খান সভাপতি হিসাবে যে ভাষণ দেন তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন যে, অগণতান্ত্রিক, অনৈসলামিক শাষণচক্র কর্তৃক স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করে জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রয়াস হলো ঐ নীতিগুলো যা সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে নিন্দা করেছেন। জনগণের ন্যায়সংগত দাবিগুলোকে অগ্রাহ্য করে উপরতলার অল্প কয়েকজনের স্বার্থে স্বৈরাচারী শাসনকে কায়েম রাখার জন্য ঐ নীতিসমূহকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে[২৭]। BPC বিরোধী আন্দোলন জনগণের ব্যাপক অংশের এমনই সমর্থন পায় যে অ্যাকশন কমিটির ডাকে সারাদেশে স্বত:স্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ঐ সময় মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবসহ নেতৃত্বের একাংশ জেলে আবদ্ধ থাকলেও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিশেষত আতাউর রহমান খান, তাজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখের নেতৃত্বে আন্দোলন এগিয়ে চলে[২৮]।

---

২৬. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (২য় খন্ড) পৃ. ৪০০-৪০০৪।

২৭. ঐ, পৃ. ৩৯৫।

২৮. মেজবাহ কামাল, আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ.১৬।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার BPC সুপারিশমালার উপর গণপরিষদে আলোচনা স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। পরে ১৯৫২ সালের ২২শে ডিসেম্বর গণপরিষদে দ্বিতীয় সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ দ্বিতীয় সুপারিশও অকেজো হয়ে যায়[২৯]।

বাংলাদেশের পশ্চিম পাকিস্তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বাঙালির রাজনৈতিক অধিকার হরণের লক্ষ্যে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি, এক কথায় বাঙালির চেতনার যা কিছু মহত্তম প্রকাশ, ১৯৪৮ সাল থেকেই বার বার তা ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জিদ করেছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালের মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের রক্তে তাদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যথার্থই জনগণের অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়েছিল। মওদুদ আহমদ যথার্থই বলেছেন, "The state language movement led to an open struggle between Bengali nationalist and the central elite of Pakistan. Forces of nationalism began to consolidate and peoples unity was achieved more than even before." [৩০] ভাষা আন্দোলন পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুতঃপক্ষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৮ সালে ঢাকার অগ্রণী ছাত্র সমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন। তখন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ছাত্রসমাজ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তখনই সরকারের চূড়ান্ত দমননীতি নেমে এসেছিল তাদের উপর। ছাত্র জনতার দুর্বার শক্তির সম্মুখে বিশ্বাসঘাতক নাজিমউদ্দীন সরকার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনের চরিত্র ছিল গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির ইতিহাসকেই বদলে দেয়।[৩১]

---

২৯. Maudud Ahmed, Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy, Dhaka, 1979, p.27

৩০. ঐ, পৃ. ২৯।

৩১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র (১ম খন্ড), পৃ. ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙালিকে একত্রিত করে। ঐ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একুশ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফজলুল হক–ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগসহ ছোটখাট অনেকেই শরীক হয় এই যুক্তফ্রন্টে। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, জনগণ মুসলিম লীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। তারা সমস্ত লীগ বিরোধী দলগুলোর সমন্বয়ে মুসলিম লীগকে পূর্ব বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠন করার আওয়াজ তুলেছিল। যুক্তফ্রন্ট গঠনের পর পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের মতো ব্যাপক গণজাগরণ দেখা দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য পূর্ববাংলার গ্রামে-গঞ্জে প্রচার অভিযান চালান। নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করে গোপালগঞ্জ থেকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[৩২৩২] এই নির্বাচনে বাঙালিরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে এবং স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রায় প্রদান করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রাদেশিক লীগ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসী ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করে। শাসক মুসলিম লীগ কল্পনাও করতে পারে নি যে, তারা এইভাবে পূর্ব-বাংলায় পর্যুদস্ত হবে। লীগ সরকার তাই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়।

১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল এ.কে.ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৫ এপ্রিল শেখ মুজিব সমবায় কৃষি ও বন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতোয় অধিষ্ঠিত হয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে। নতুন মন্ত্রিসভা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং মুদ্রা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলল বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে এই মন্ত্রিসভা কিছুই করতে পারে নি।[৩৩] [৩৩]প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ৩০ এপ্রিল কলকাতা সফরে যান এবং সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও সংবর্ধনার উত্তরে যে ভাষণ দেন তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

---

৩২. সিরাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ গড়ল যারা, ভাস্কর প্রকাশনী ঢাকা ১৯৮৭, পৃ ১৩৪।

৩৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, মুক্তধারা ১৯৭২, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩রা মে তারিখে নেতাজী ভবনে ফজলুল হক বলেছিলেনঃ "বাঙালি এক অখণ্ড জাতি। তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সুসংহতো দেশে বাস করে। তাদের আদর্শ এক এবং জীবন ধারণের প্রণালীও এক। বাঙালি অনেক বিষয় সারা ভারতকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে এবং দেশ বিভাগ সত্ত্বেও জনসাধারণ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের উর্ধ্বে থাকিয়া কাজ করিতে পারে।" ৪ঠা মে, প্রিন্সেস গ্রান্ড হোটেলে এক সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেন: "পশ্চিম বঙ্গের চেয়ে পূর্ব বঙ্গে বাংলা ভাষার জন্য উৎসাহ বেশি। এমনকি, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র শিশুও প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আসুন আমরা রাজনীতি ভুলিয়া আমাদের মহান সংহতির ধারক শ্রেষ্ঠ ভাষার ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করি। বাংলার মঙ্গলের মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর রচিত হয়েছে তাহা অপসারিত করিবার কাজ যদি আরম্ভ করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব। দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা একটি স্বপ্ন ও ধোঁকামাত্র। করুণাময় আল্লাহর দরবারে আমার একটি প্রার্থনা তিনি যেন এই ব্যবধান দূর করেন [৩৪]কলকাতায় 'Statesman' পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল "Haq hopes to end artificial barrier"[৩৫] ফজলুল হক কলকাতা থেকে ফিরে এলে রাষ্ট্রদ্রোহিতোার অভিযোগ তুলে ৯২ক ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পাকিস্তান সরকার ভেঙ্গে দেয়। ফজলুল হককে Traitor আখ্যা দিয়ে তাঁকে বাসভবনে নজরবন্দী করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদী মহলো ষড়যন্ত্রের জাল বুনে বাঙালিদের ক্ষমতায় থাকতে দেয় নি[৩৬]। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা মাত্র ৪৫ দিন ক্ষমতোয় অধিষ্ঠিত ছিল।

১৯৫৪ সালে পাক–মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তির সঙ্গে সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানকে পশ্চিমা শক্তিজোটের লেজুড়ে পরিণত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিল। ১৯৫৪ সালে শেখ মুজিবসহ ৬৭ জন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে কঠোর ভাষায় পাক–মার্কিন সামরিক চুক্তির নিন্দা করেন এবং উহা বাতিলের দাবি জানান[৩৭]।

---

৩৪. মনসুর মুসা, বাংলাদেশ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ৪৮০।

35. The Statesman, May 5, 1954.

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১।

৩৭. অলি আহাদ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সেই সময় থেকেই রাজনীতিতে সশস্ত্র বাহিনীর অনুপ্রবেশের ফলে পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমস্যা ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করে। তখন থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নিজ ভূমিকা পালনে বাধা দেয়া হয়। যখন ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৫৯'র মার্চে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা, তার কয়েক মাস আগেই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারি করা হয়[৩৮]। বস্তুত ঐ নির্বাচনে বাঙালিদের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতোায় বসার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আবার ১৯৬৯ সালের মার্চে আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আইয়ুব খানের পদত্যাগ সম্পর্কে মতৈক্য স্থাপিত হলো, ঠিক তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানের স্থলে ক্ষমতোা দখল করেন এবং সামরিক আইন জারি করেন। যার ফলে দেশের কর্তৃত্ব সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায়। ইয়াহিয়া খানের 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' অর্ডারের ভিত্তিতে দেশে নির্বাচনও হলো; কিন্তু জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসতে দেয়া হলো না। জেনারেল ইয়াহিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতোা হস্তান্তর না করে নানা ফন্দি-ফিকির করতে থাকলে দেশ এক রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। মূলত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার দিকটি উপেক্ষা করে সামরিক অভিযান শুরু করে।

এভাবে সামরিক বাহিনী বেসামরিক সরকার গঠনের সকল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেশে এক চরম রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। বস্তুত পাকিস্তানী আমলের চব্বিশ বছরই কেটেছে সামরিক শাসনের অধীনে। কখনো সরাসরি, কখনো পরোক্ষ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সকল তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে সামরিক বাহিনীর প্রভাব ছিল অপ্রতিহতো।[৩৯]

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যোার পর পাকিস্তানে পুরোপুরি পাঞ্জাবী প্রভুত্ব কায়েম হয়। সামরিক অফিসার ও পাঞ্জাবী আমলাতন্ত্র পাকিস্তানকে কার্যত পাঞ্জাবীস্থানে পরিণত করে। সাবেক বৃটিশ আমলা গোলাম মোহাম্মদ সুকৌশলে পাঞ্জাবী প্রভুত্বের খুঁটি শক্ত করতে থাকলেন। তাঁর খামখেয়ালীতে পাকিস্তানে একের পর এক মন্ত্রিসভা গঠন ও ভাঙ্গা হয়। আর তাঁর চক্রান্তের দোসর হিসেবে পেলেন সেনাবাহিনী ইস্কান্দার মীর্জা ও আইয়ুব খানকে[৪০]।

---

৩৮. এয়ার মার্সাল আসগর খান, জেনারেল ইন পলিটিকস (অনূদিত), ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ১৫৫।

৩৯. হাসনউজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৪০. বাংলার বানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে গণতন্ত্রের রীতিনীতি বিসর্জন দেয়া হয়। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাসের জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখা হলো। কিন্তু চক্রান্ত করেও যখন বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কিছুতেই নস্যাৎ করা গেল না, তখন পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণত করে তারা প্রদেশ হিসেবে বাংলাদেশকে শায়েস্তা করতে উঠে পড়ে লাগল। ১৯৫৫ সালের ১৪ অক্টোবর 'ওয়ান ইউনিট স্কীম' আইনে পরিণত হয়। এই পরিকল্পনার অর্থ হলো পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র এলাকা মিলে হবে একটি ইউনিট [৪১]। পূর্ববঙ্গ বৃহত্তম প্রদেশ এবং তার লোকসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশি হলেও, কেন্দ্রীয় আইন সভায় পশ্চিম পাকিস্তানের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। অর্থাৎ জাতীয় পরিষদের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এক ইউনিটকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'ওয়ান ইউনিট স্কীম' প্রস্তাবকে সমর্থন করলেও তাঁর শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাবকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রগতিশীল নেতা ঐ সময় Why Autonomy শীর্ষক পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় বলা হয় যে, 'ওয়ান ইউনিটের' মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের কুচক্রী শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের গণতান্ত্রিক দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে চায়। পুস্তিকায় আরো বলা হয় যে পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এক চরম ভেদাভেদনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় কেন্দ্রীয় সরকারী পদ সবই পশ্চিম পাকিস্তানীরা পেয়ে থাকে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম সংকটের সম্মুখীন [৪২]। এইভাবে ঐ পুস্তিকাতে দেখানো হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সব দিক দিয়েই পিছিয়ে আছে।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যিনিই কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, করাচী ও পিণ্ডির শাসকচক্রের চোখে তিনিই হয়েছেন দেশদ্রোহী। বৃটিশ আমলের আমলা গোলাম মোহাম্মদ এ.কে.ফজলুল হকের মতো বরেণ্য নেতাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে বিচার করার হুমকি দিয়েছিলেন। ইস্কান্দার মীর্জাও মওলানা ভাসানীকে গুলি করে মারার হুমকি দিয়েছিলেন। আইয়ুব শাহীর চক্রান্তে শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশের বাইরে সুদূর বৈরুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের চক্রান্তে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করা হলো [৪৩]।

---

৪১. সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, রক্তের মূল্যে মুক্তি, কলিকাতা ১৯৭২,পৃ. ১৩৫।

৪২. ঐ, পৃ. ১৪৬।

৪৩. রঞ্জন, রক্তাক্ত বাংলা, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭১ পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের এমন একজন নেতা নেই যিনি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হন নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও স্বাধীকারে দাবি যিনিই করেছেন তিনিই অভিযুক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহিতোর দায়ে। স্বায়ত্তশাসনের প্রতিটি দাবির মধ্যে তাঁরা 'ইসলাম বিপন্ন' দেখেছেন এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। আসলে বাংলাদেশকে উপনিবেশ রেখে শাসন আর শোষণকে স্থায়ী করাই ছিল পাকিস্তানী শাসকচক্রের প্রধান লক্ষ্য। যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে, 'The colonial attitude of the west Pakistani Politicians, Bureaucrats, Capitalists and Military leaders, greatly strengthened regionalist feeling in East-Pakistan'[৪৪]। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তানের শাসকচক্রকে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন পূর্ব–পাকিস্তান হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানকে জানাবে "আচ্ছালামো আলাইকুম"। তুমি তোমার পথে যাও আমি আমার পথে।[৪৫]

ষাটের দশকের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৬২ সালে ছাত্রদের শিক্ষা কমিশন ও শাসনতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলন রূপে ব্যাপ্তি লাভ করে। ঐ সালেই আইয়ুব খান একটি স্বৈরতান্ত্রিক সংবিধান জাতির সম্মুখে উত্থাপন করেন। ঐ শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি এমন একটা রাজনৈতিক কাঠামো দাঁড় করালেন যা নামে গণতন্ত্র কিন্তু কার্যত ছিল একটি গণবিরোধী ষড়যন্ত্র।

'মৌলিক গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চিরতরে দমন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন তিনি। ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। তাঁর ক্ষমতোকে পাকাপোক্ত করার জন্য পোডো (PODO) এবং 'এবডো' (EBDO) নামক দুটি কুখ্যাত আইন তৈরি করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকদের রাজনীতি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছিল।[৪৬] গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গভীর আলাপ-আলোচনার পর সংবাদপত্রের মাধ্যমে এক জোরাল বিবৃতি দান করেন। এই বিবৃতি Nine Leader's Statement বা নয় নেতার বিবৃতি নামে

---

৪৪. সালাউদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

৪৫. দৈনিক আজাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫।

৪৬. আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃ. ২২০-২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬২ সালের ২৪ জুন এই বিবৃতি দেয়া হয়, পরদিন ২৫ জুন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিই ছিল তৎকালে পাকিস্তানী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। এই বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর দান করেন তারা হলেন আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, কৃষক শ্রমিক পার্টি থেকে হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক, পীর মোহসীনউদ্দিন আহমদ, মুসলিম লীগ থেকে ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), নূরুল আমিন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি থেকে মাহমুদ আলী মূলত এই নয় নেতার বিবৃতি সারা বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে।

বিবৃতিতে বলা হলো: "সত্যিকার জন-প্রতিনিধি ছাড়া কোন ব্যক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকারী নয়। করলে তা স্থায়ী, সহজ ও কার্যকরি হতে পারে না। জনগণ সার্বভৌম এই হচ্ছে গণতন্ত্রের সারকথা। জনগণই সমস্ত ক্ষমতোার উৎস। তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী সকল ক্ষমতো প্রয়োগ করতে হবে। এই ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বাধাবিঘ্নমুক্ত ও অবাধ বিকাশের একান্ত প্রয়োজন।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় জন-প্রতিনিধির লক্ষ্য থাকে যাতে কালের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে শাসনতন্ত্র টিকে থাকতে পারে এবং সম্ভাব্য বাধা-বিপত্তি ও সংকটমুক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্বও রক্ষা করতে পারে।

শাসনতন্ত্রকে স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ও গুণসম্পন্ন হতে হলে সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধির প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্রণীত বিধানগুলোই বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবী বংশধরদের মনে অকৃত্রিম আনুগত্য ও আবেগের প্রেরণা দিতে পারে। এই আনুগত্য ও আবেগই শাসনতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন ও দুর্ভেদ্য বর্মবিশেষ। জনমতের উপর নির্ভর না করে বাইরে থেকে চাপানো শাসনতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে জনসমর্থন লাভ করতে পারে না।

বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই গুণাবলি না থাকায় এটা অন্তঃসারশূন্য। যতই প্রচার করা হোক না কেন, জনমতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাস্থাই হচ্ছে এই নয়া শাসনতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। আট কোটি (তখন যা ছিল) জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র আশি হাজারকে দেয়া হয়েছে ভোটের অধিকার। আবার এই অতি কমসংখ্যক ভোটারের ভোটে নির্বাচিত যে পরিষদ তাকেও সত্যিকার কোন ক্ষমতো দেয়া হয় নি। মাত্র তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমূল পরিবর্তন না করলে এই শাসনতন্ত্র কাজের অনুপযোগী।

সরকারি নীতি ও কার্যকলাপ নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতো সদস্যদের না থাকার ফলে শুধুমাত্র সরকারের তীব্র ও চরম সমালোচনার মাধ্যমে সদস্যরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রলুব্ধ হবে। যোগ্য ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি শাসনব্যবস্থায় যোগ দিতে কোন আগ্রহ বোধ করবে না। ফলে শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রাণ আমলাতন্ত্রের হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বে।

যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করে দেশবাসী বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার আহ্বান আমরা জানাই। ছয় মাসের মধ্যে একটি সুষ্ঠু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব বলে আমরা মনে করি। শাসনতন্ত্র প্রেসিডেন্সিয়াল না পার্লামেন্টারী হওয়া উচিত, সে প্রশ্নের জবাব আমরা এখন দিতে চাই না। তবে দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ পার্লামেন্টারী ধরনের সরকারী কায়েমের পক্ষপাতী,কেননা বহুকাল ধরে ঐ ধরনের শাসন-পদ্ধতির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে এবং তার অভিজ্ঞতা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শাসনতন্ত্র ফেডারেল বা য়ুনিটারী হবে, এ প্রশ্নেরও জবাবের প্রয়োজন হবে না। বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেল শাসনতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। একটি জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান করা একান্ত কর্তব্য। সেটা হচ্ছে দুই অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বৈষম্য। উভয় অংশের জনগণের সদিচ্ছার অভাব নেই। তাই আমরা মনে করি গণপ্রতিনিধিদের সত্যিকার দায়িত্বভার দিলে, তারা সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে মনোযোগ দেবে আর অনুন্নত অঞ্চলগুলোর দিকে অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, এটা সুনিশ্চিত।

এতেঠকাল ধরে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণের ব্যাপারে জনগণের কোন কথা বলার সুযোগ না থাকায় সংকীর্ণমনা ও শ্রেণীস্বার্থের রক্ষকদের হাতে পড়ে দুই অংশের ভেতর উন্নয়ন ক্ষেত্রে পর্বতসম বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে একবার যদি রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমতো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তাহলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের দিন শেষ হয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ব্যাপারে সত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতোয় অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়নি বললেই চলে। এই সব কারণেই দুই অঞ্চলে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। আজাদি লাভের পর সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতোর সমাবেশ হয়েছিল মুষ্টিমেয় সরকারি অফিসারদের হাতে। তার উপর দেশে একটিও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার ফলে জনগণ রাষ্ট্র চালানোর ব্যাপারে কথা বলার সুযোগই পায় নাই। এমতোবস্থায় অন্তর্বর্তীকালে কী করণীয়, সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার ফলে দেশে যে সদিচ্ছার উদ্ভব হয়েছে, তাকে আরও জোরদার করে তোলার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার। জনসাধারণ ও সরকারি শাসনতন্ত্রের ব্যবধানের প্রাচীর আর গড়ে উঠতে দেয়া যাবে না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের দায়িত্ব অপরিসীম। আমরা আশা করি, তিনি এটা বুঝতে অক্ষম নন।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি মতে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া সাপেক্ষে দেশের সরকার পরিচালনার কাজও চালিয়ে যেতে হবে।

তাই আমাদের প্রস্তাব উনিশ শ'ছাপ্পান্ন সালের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো নয়া শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করতে হবে।

যে পরিষদ বর্তমান বিধান অনুযায়ী গঠিত হয়েছে তার উপর সরকারের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। লাভজনক পদ বণ্টন করে ভাগ্যবান সদস্যদের দিয়ে পরিষদগৃহ ভর্তি করার আসক্তি বর্জন করতে হবে। তা না হলে যে ক্ষীণমাত্র স্বাধীনতা পরিষদের আছে তাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একথা ভুললে চলবে না যে, বিশ্বাসেই বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

সরকারের উপর জনগণের আস্থা যাতে ফিরে আসে তার জন্য বিনা বিচারে আটক সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু। দেশে অবাধে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পথে যতকিছু বাধা-অন্তরায় আছে তার অবসান ঘটাতে হবে। দেশের সকলকে সমবেতভাবে এইসব সমস্যা সমাধানের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। কারা, বর্তমানে দেশ একটি বিরাট পরীক্ষার মুখে। এক অস্থির অবস্থায় দেশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আমাদের শেষ আহ্বান-আসুন, সকলে মিলে যতশীঘ্র সম্ভব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে সমস্ত বিতর্ক বন্ধ করে দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবার এক দুর্জয় সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করি।[৪৭]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশের সভাপতিত্বে তাঁর বাসভবনে সাবেক আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পূর্ণ গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কয়েকটি রাজনৈতিক দাবি সর্বসম্মতিক্রমে

---

৪৭. জনাব আতাহার রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তারি ৬-২-১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবাকারে গৃহীত হলো। যেমন–

১. দেশে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন।

২. আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করা।

৪. পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা।

৫. রাজবন্দিদের মুক্তি ইত্যাদি।[৪৮]

৬ই মার্চ ঢাকার গ্রীনরোডে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী এক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এর আগে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগকেও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। কাউন্সিলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের জাতীয় পরিষদ সদস্যসহ প্রায় এক হাজার কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন। সেদিন সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ "আওয়ামী লীগের ইতিহাস আপনাদের সংগ্রামের ইতিহাস। আপনারা জানেন, কোন্ অবস্থায় কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। আপনারা জানেন, সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কত রকম প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা–বিপত্তির মধ্য দিয়ে আপনারা আওয়ামী লীগকে দেশের সেরা ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পেরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের মূলনীতি যে দেশ থেকে যখন তখন মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতোসীন মহলের ইঙ্গিতে নির্বাসন দেয়া হয়, যে দেশে কথায়-কথায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও কর্মীদের জেলে আটক করা হয়, সে দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করা এক বিরাট কাজ, সুকঠিন দায়িত্ব"।

এই সুকঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাঁর সহকর্মীদেরকে উদাত্ত আবেদন জানালেন। তিনি বললেন, "আসুন, আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি যে, যতদিন না পাকিস্তানের বুক থেকে স্বার্থান্বেষী মহলের পরাজয় ঘটবে, যতদিন না এদেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পারব, যতদিন না দেশকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে পারব, যতদিন না সমাজ থেকে শোষণের মূলোৎপাটন হবে, যতদিন না, দেশের প্রত্যেক নাগরিক দল–মতো –ধর্ম নির্বিশেষে অর্থনৈতিক মুক্তি ও আর্থিক প্রাচুর্যের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, যতদিন না শ্রেণি–বিশেষের অত্যাচার থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে মুক্তি দেয়া যাবে–ততদিন আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। ন্যায়

---

৪৮. মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ২১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের নীতি, আমাদের আদর্শ। জয় আমাদের অনিবার্য।[৪৯] শেখ মুজিবের এই ভাষণ সেদিন কর্মীদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

১৯৬৪ সালের ১১ই মার্চ ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি (All Parties Action Committee) করা হয়। এই সংগ্রাম কমিটির ঘোষণাপত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষে স্বাক্ষর করেন শেখ মুজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, ১৮ই ও ১৯ শে মার্চ সারা পূর্ব বাংলায় 'প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন দিবস' পালন করা হবে।

১৮ই মার্চ ভোটাধিকার দাবি দিবসের প্রথম দিনেই পুলিশ তাজউদ্দিন আহমদ ও কোরবান আলীকে গ্রেফতার করে। ঐদিন ছাত্র-জনতার মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ১৯ মার্চ ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। বিকেলে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা শেষে এক বিশাল জনসমুদ্র মিছিলের আকারে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়ে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান। জনসভায় ভাসানী ও শেখ মুজিব উভয়েই হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দান করেন। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন, 'সভ্যতার কোন পর্যায়েই জন্মগত অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় নি। ফেরাউন মানুষকে জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি, হিটলার পারে নি, আজ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীও পারবে না। একদিন দেশবাসী দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের জন্মগত অধিকার ছিনিয়ে আনবেই আনবে।" তিনি লক্ষ লক্ষ জনতাকে উদ্দেশ্য করে আরো বললেন: 'বাংলার ভায়েরা আমার, স্পষ্ট করে আজ আপনাদের থেকে জেনে যেতে চাই আমরা যদি জেলে চলে যাই পারবেন কি আপনারা আপনাদের অধিকার ছিনিয়ে আনার জন্য গ্রামে-গ্রামে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যেতে? জেল-জুলুমের মুখে আপনাদের ছেলেরা আজ যেমন বুক পেতে দিয়েছে, পারবেন কি আপনারা তেমনি করে ত্যাগ ও সাধনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে। পারবেন কি আপনারা হাজারে হাজারে আইয়ুব সরকারের কারাগার ভরে তুলতে?" লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ সমস্বরে গর্জে উঠলো-"পারব, পারব।"

---

৪৯. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

সেদিনের জনসভায় মওলানা ভাসানীও এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি আইয়ুব সরকারকে সতর্ক করে বললেনঃ "বাঙালি সম্রাট অশোককে মানে নি। মোগল ও পাঠানেরও অনুগত হয় নি। ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করেনি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেয়ায় জনতার রুদ্ররোষে প্রবল ক্ষমতোশালী মুসলিম লীগ আজ কবরে শায়িত। এবারো সরকার যদি ভোটাধিকারের দাবি মেনে না নেন, তবে দেশে আর এক রাষ্ট্রভাষার ঘটনা ঘটবে।"[৫০]

স্বৈরাচারী আইয়ুবের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য ১৯৬৪ সালের ১২ জুলাই সারা পূর্ব বাংলায় 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' উদযাপিত হয়। ঐদিন পল্টন ময়দানে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন: "সোনার বাংলার ভাইয়েরা আমার! স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে আবার জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নামতে হবে, ১৭ বছর পরে আবার ভোটে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, ১৭ বছর পরে আবার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে হবে–একথা কোন দিন ভাবিনি। নিজ দেশে নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেও ব্রিটিশ আমলের মতো জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে ভাবলে মন আমার শিউরে ওঠে।

গত কদিনে দিনাজপুরের পঞ্চগড় থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের কক্সবাজার পর্যন্ত সিলেটের সীমান্ত থেকে বরিশাল পর্যন্ত ঘুরেছি। অন্তত ৬০টি জনসভায় বক্তৃতা করেছি–দাবি করেছি, প্রস্তাব পাস করেছি, 'জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দাও, বাঁচার মতো বাঁচতে দাও।' কিন্তু ফল কিছুই হয়নি, সরকার কানে তুলো দিয়েছেন।[৫১] বাংলার সংগ্রামী জনতা সামরিক শাসনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রের দাবিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং ক্রমে-ক্রমে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। মুজিব বুঝেছিলেন যে, বুর্জোয়া রাজনীতির বাঁধাধরা নকশা অনুসরণ করে আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে কার্যকরি লড়াই গড়ে তোলা যাবে না। মধ্যবিত্ত চিরায়ত নেতাদের জড়তা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালির একটি অংশের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যকে কাটিয়ে ওঠার একমাত্র পথ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী স্লোগানের মাধ্যমে সহযোগিতায় নতুন করে পার্টি গড়ে তুললেন।[৫২] "By 1966, under the dynamic leadership of Sheikh Mujibur Rahman the Bangladesh."[৫৩]

---

৫০. ঐ. পৃ. ২১২-২১৩।

৫১. ঐ. পৃ. ২১৫।

৫২.রেহমান সোহান, বুর্জোয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সঙ্কট, ঢাকা ১৯৮২,পৃ. ৯২-৯৩।

৫৩. সালহউদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত , পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খানের শাসনতান্ত্রিক একনায়কত্ব, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শক্তিশালী জনমতো গড়ে উঠতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ অনেকদিন ধরেই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যায়-আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। আওয়ামী লীগ ঐ স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জনগণ যে মুহূর্তে আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই শেখ মুজিবুর রহমান উথাপন করেন তাঁর ৬–দফা কর্মসূচি। ঔপনিবেশিক সরকারের বাঁধা ছকের বাইরে ৬-দফা আন্দোলন ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণির শক্তি ও জঙ্গীপনার প্রত্যক্ষ পরিচয় দেখা গিয়েছিল এবং চরম নিপীড়নের মধ্যেও ৬ দফা কর্মসূচি জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য যে বিরাট নৈতিক সাহস ও মনোবলের প্রয়োজন ছিল, শেখ মুজিব সেই সাহস ও শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ ছাত্র, যুব ও শ্রমিকের সংগ্রামী সংগঠনে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ একটি সুসংগঠিত দল হিসেবে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়। তাই সরকার ১৯৬৮ সালের শুরুতে শেখ মুজিব কারারুদ্ধ থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। মামলায় শেখ মুজিব ও তার সহচরদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিযুক্ত করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় এক গণজাগরণের সৃষ্টি হয়, ফলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৬৮–৬৯ সালে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে যে গণ–বিপ্লব শুরু হয় এর অগ্রভাগে ছিলেন সংগ্রামী ছাত্র সমাজ। ছাত্রদের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার আন্দোলন সমগ্র দেশকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। পূর্ব বাংলার জাগ্রত ছাত্র–জনতা দুর্বার গতিতে মোকাবিলা করে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনকে। জনগণের আন্দোলনের সম্মুখে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতো হস্তান্তর করে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।[৫৪]

---

৫৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র (পঞ্চম খন্ড) পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আইয়ুব শাহীর পতন এবং ইয়াহিয়ার ক্ষমতো গ্রহণ এই পটভূমিতে পাকিস্তানের দীর্ঘ তেইশ বছর পর ১৯৭০ সালের প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারাভিযান এবং তার পরিণতিতে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় সামরিক চক্রকে একথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে, কোনোরকম সমঝোতা বা আপোস সম্ভব নয়। নির্বাচনী ফলাফল পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে এবং পাক–সামরিক চক্রের চোখে এই বিপদ এড়ানোর একমাত্র পথ ছিল বল প্রয়োগ। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় সমস্যাবলির সমাধান করতে এবং দেশের দুই অংশের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ করতে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ও তার সামরিক বাহিনী রুদ্ধ করে দেয় গণতন্ত্রের পথ।

নির্বাচনী ফলাফলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কেন্দ্রীয় সরকার গঠন ও ক্ষমতোর ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্নে দেশের দুই অংশের জনমতো সম্পূর্ণ বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী।

এই পরস্পর বিরোধী জনমতোকে একত্রিত করার ক্ষমতো কোন রাজনৈতিক দলের নেই। পাকিস্তানের এই তীব্র রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য ক্ষমতোসীন শাসকদের সামনে দুইটি মূল পথ খোলা ছিল। ছয় ৬ দফার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতোর ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা করা নতুবা নির্বাচনের রায় অগ্রাহ্য করে নগ্ন সামরিক ক্ষমতোর বলে পূর্ব বাংলায় সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তন করা। পাকিস্তানী সামরিক চক্র তাদের পেশাগত প্রবণতার দরুন সামরিক শক্তি প্রয়োগের পথকে বেছে নেয়। পাকিস্তানের মারাত্মক রাজনৈতিক সংকটের উপর সামরিক সমাধান চাপিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের বিপর্যয় ত্বরান্বিত হয়।[৫৫] পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ভুলে গেলেন যে, সামরিক শক্তি দিয়ে রাজনৈতিক রোগ নিরাময় করা যায় না। সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু সময়ের। কাজেই জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহবানে নানা গড়িমসির পর ভুট্টোর মাধ্যমে কিছু শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়। সামরিক জান্তা পরোক্ষভাবে একথাই জানিয়ে দেয় যে, ৬–দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং আওয়ামী লীগ ৬ দফার সংশোধনে সম্মত না হলে পরিষদ অধিবেশনের

---

৫৫. মাঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ৬-দফার পক্ষে বাংলাদেশের মানুষের সর্বসম্মত রায়ের ফলে আওয়ামী লীগের কাছে এমন আপোস-রফা ছিল খুবই দুরূহ ও কঠিন ব্যাপার। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভুট্টোর আপোসহীন মনোভাব এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিস্ফোরণ ঘটে। এই অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানকে একটি অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করতে আওয়ামী লীগ অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। গণ-আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রদেশের সমগ্র প্রশাসন বিভাগ কার্যত এক বিকল্প সরকারে পরিণত হয়। বাংলার মাটি থেকে পাকিস্তানী শাসন ক্রমে উঠে যেতে বসে। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। জনগণ শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। শেখ মুজিবের শান্তিপূর্ণ অহিংস -অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল ১৯৪২ সালের ভারত-ছাড় আন্দোলনের চেয়েও অনেক বেশি। সেই আন্দোলনের স্রোতের টানে বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ ভেসে এল, এমন কি সামরিক বিভাগের লোকজন, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের কর্মীরাও। ১লা মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক গণবিক্ষোভ সাধারণ মানুষ ও সর্বদলীয় নেতাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তাঁর সামরিক বাহিনীর সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলল যে, সারা বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। সামরিক শাসক তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র চূড়ান্ত আঘাতের মাধ্যমেই বাঙালিদের আত্মপ্রত্যয় প্রতিহতো করা সম্ভব হতে পারে।

অসহযোগ ও গণআইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে মুজিব আশা করেছিলেন কোনরকম একটা আপোস মীমাংসার। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তাঁকে জয়মাল্য এনে দেবে। মুজিব আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের সূত্র খুঁজতে চাইলেন। অন্যদিকে পার্টির উগ্রপন্থী সদস্যরা তাকে বার বার বলেছে যে, ইয়াহিয়া ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনায় আর যোগ না দিতে। অযথা কথা বাড়িয়ে দেরি করার কৌশল গ্রহণ করে ওরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র আনতে থাকে। অন্যদিকে জনগণ আপোসের পথ পরিহার করে লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুজিবের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। 'স্বাধীন বাংলা' রব উঠেছে চারিদিকে এবং 'জয় বাংলা' শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু শেখ মুজিব তখন পাকিস্তানের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে

Dhaka University Institutional Repository

পারছিলেন না। কারণ, তিনি আলোচনার শেষ দেখতে চান।[৫৬] তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিয়মতোন্ত্রিক উপায়ের পথে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্র সব নিয়মতোন্ত্রিক পথকে রুদ্ধ করে বাঙালিদেরকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ঠেলে দিলেন। ২৫ শে মার্চ রাতে পাকবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন দাঁড়াল–হয় প্রতিরোধ, নয় মৃত্যু। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রামের' আহ্বান সাধারণ মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামে টেনে আনল। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা সাতটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবিলম্বে আক্রমণ করবে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এই খবর নিয়ে ছাত্রলীগ নেতারা ছুটে গেলেন শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাড়িতে। শেখ মুজিব নেতা ও কর্মীদেরকে অযথা সময় নষ্ট না করে শহর থেকে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে বললেন। তাঁর নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠলে তিনি বললেন যে, বাসস্থান ছেড়ে তিনি কোথাও নড়বেন না। কেননা, তাঁকে না পেলে ইয়াহিয়ার সৈন্যরা ঢাকায় কাউকে বাঁচতে দেবে না। গোটা শহরটাকে ধ্বংস করে দেবে। ২৫ মার্চ রাতে তাজউদ্দিন আহমদ ও জেনারেল ওসমানীও বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা ত্যাগ করার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তাদেরকেও বলেছিলেন, "আমি এখান থেকে চলে গেলে ইয়াহিয়া ও তার সঙ্গীরা নানা রকম কুৎসা রটাবে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।[৫৭] তিনি সহকর্মীদের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রয়ে গেলেন নিজ বাসভবনে এবং সেখান থেকে গ্রেফতার হলেন হত্যোযজ্ঞের প্রথম প্রহরে। এ প্রসঙ্গে এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের বক্তব্য হলো যে, ২৫ মার্চ সেনাবাহিনী যখন ঢাকার বুকে আঘাত হানে, তখন পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি আনুগত্যই শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের মুখে ঠেলে দেয়। অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে তিনি সহজেই পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের গা ঢাকা দিতে নির্দেশ দিলেন; কিন্তু নিজের জন্য বেছে নিলেন বন্দী জীবন।[৫৮] মুজিব আশায় ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত একটা রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানো যাবে। এ প্রসংগে মওদুদ আহমদ বলেন, "In fact, Mujib did not want to take the blame for the division of Pakistan directly".[৫৯]মনে হতে পারে, শেখ মুজিবুর রহমান কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে

---

৫৬. সাপ্তাহিক দেশ কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ পৃ. ৭২।

৫৭.মযহারুল ইসলাম,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ১৯৭৪পৃ. ৭৯৭।

৫৮. এ্যান্থনী মাসকারেনহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

৫৯. এ্যান্থনী মাসকারেনহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানকে জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ ২৫ মার্চের গভীর রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া টিক্কা-ভুট্টোচক্র বেয়নটের খোঁচায় পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটাল। বস্তুতপক্ষে ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চে যে অন্যায় ও অবৈধ যুদ্ধ শান্তিপ্রিয় বাঙালির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়-তারই ফলশ্রুতি হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

২৫ মার্চের মধ্যরাত্রিতে কারাবরণ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চোখে শেখ মুজিবই ছিলেন মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৭১, এই দুই যুগান্তকারী আন্দোলনের কোনোটিতেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারেন নি। কারণ সংগ্রামের ডাক দেবার অভিযোগে দু'বারই কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও এর মাঝখানে ১৯৭০-এর নির্বাচনকে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির গণভোটে রূপান্তরিত করে সমগ্র দেশকে তিনি যেভাবে এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় সুসংহতো করেন, যেভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির বৈধতা সম্পর্কে পূর্ববাংলার মানুষের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলেন এবং যেভাবে পহেলো মার্চ থেকে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে এক দুর্বার অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করে মানুষের সংগ্রামী চেতনায় মৌল রূপান্তর সাধন করেন-তার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে সাধারণ গণমানসে তিনি সর্বোচ্চ আসন অধিকার করেন। পঁচিশে মার্চের পর জেনারেল ইয়াহিয়ার গণহত্যোকারী সৈনিকেরা যখন এ দেশের মানুষকে সশস্ত্র যুদ্ধের পথ গ্রহণে বাধ্য করে তখন সংগ্রামের লক্ষ্য ও পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে তাঁর সেই আসন অক্ষুণ্ন থাকে। বাংলার আপামর জনসাধারণ হত্যো ও বিভীষিকার মধ্যেও শেখ মুজিবকেই মনে করেছে তাদের মুক্তি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এজন্যই স্বাধীনতার ঘোষণা তাঁর নামে, এজন্যই মুজিবনগর নামকরণ। স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা সগর্বে উচ্চারিত করেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম। সমগ্র স্বাধীনতা যুদ্ধ তাঁর নামেই পরিচালিত হয়েছিল। সর্বোপরি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রথম কয়েক বছর তাঁর উপস্থিতির ফলেই বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল।[৬০৬০] মওদুদ আহমদ যথার্থই বলেছেন, "Sheikh Mujibur Rahman was a man who might be considered as the greatest phenomenon of our history. The whole political history of Bangladesh centred round him till his death and after".[৬১ ৬১] শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের

---

৬০. মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬-৪৭।

61. Maudud Ahmed, Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman. UPL, Dhaka 1983, P VII.

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় ইতিহাসের সব চাইতে বড় ঘটনা। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয় নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।[৬২৬২] মূলত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির বহু যুগের লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন।

ভৌগোলিক অবস্থান:

দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত, ২০৩৪ থেকে ২৬৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০১ থেকে ৯২৪১ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর-উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কিলোমিটার।

সময় +৬.০০ ঘণ্টা গ্রীনিচ প্রমাণ সময়।

আয়তন ও সীমা:

আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ; উত্তরে ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং সেই সঙ্গে মায়ানমার; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আন্তর্জাতিক স্থলসীমার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৪০০ কিমি: এ মধ্যে ৯২ শতাংশ ভারতের সঙ্গে এবং বাকি ৮ শতাংশ মায়ানমারের সঙ্গে। উপকূলীয় সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪৮৩ কিলোমিটারের অধিক। ভূ-খণ্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল (২২.২২ কিমি) এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০.৪০ কিমি) পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি:

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের বিরাট অঞ্চল বিজয়ের (১২০১-৩ খ্রী.) ফলে এ বাঙলায় সর্বপ্রথম মুসলিমশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়[৬৩] এবং নদীয়ায় অস্থায়ী রাজধানীর বিকল্পস্বরূপ দিনাজপুরের দেবকোটে স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয়। এ সময় মুসলিম শাসকগণ এ অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি করেন

---

৬২. মওদুদ আহমদ বাংলাদেশ ঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ঢাকা ১৯৯৪ পৃ. ৩৫৮।

৬৩. আবদুল মান্নান তালিব, ইসলাম, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

এবং কুর' আনখানী, দরসে কোরআন ও দরসে হাদিস পরিচালনা করে এদেশের মুসলিমদের ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তখন থেকে এ ভূখণ্ডে 'আরবি ও ফার্সি র অনুশীলন চলতে থাকে।[৬৪] প্রতিপাদ্য বিষয়ে যাওয়া আগে আবুল হাশিমের সমকালীন বাঙলার আর্থ-সামাজিক, ইসলামি শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য, ইসলাম প্রচার ও বসবাসের উদ্দেশ্য পশ্চিম ভারত, আফগানিস্তান, ইরান, 'আরব এবং তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলমান বাঙলায় ক্রমাগত আগমন করে বসতি স্থাপন করেন।[৬৫] ধীরে ধীরে বাঙলায় মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র বাঙালায় এর প্রসার ঘটে।[৬৬] মুসলিম শাসক শ্রেণি এ দেশকে মনে-প্রাণে ভালবাসে এবং এদেশের অমুসলিমের সাথে মিলে-মিশে 'এতেঠদ্দেশীয়' হয়ে যায়। জনসাধারণও তাঁদের শাসন মেনে নেয়।[৬৭] বাঙলায় একনাগাড়ে সাড়ে পাঁচশ' বছর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৬৮] ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমান সম্প্রদায় বাঙলায় শাসক শ্রেণি থেকে শাসিত শ্রেণিতে পরিণত হয়। ব্রিটিশ বেনিয়া বাঙলায় বাণিজ্যের নামে আসন জমালেও ছলে-বলে-কলা-কৌশলে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশের শাসন ক্ষমতোয় অধিষ্ঠিত হয়। একশ' নব্বই বছর (১৭৫৭-১৯৪৭) ব্যাপী তারা এ দেশের অংশবিশেষ থেকে শুরু করে গোটা ভূখণ্ড শাসন করে। মোগল শাসন আমলে বাঙলার মুসলমানগণ অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর (১৭৫৭-৬০) নামেমাত্র নওয়াব থাকলেও সামরিক শক্তি নিহিতো ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে।[৬৯] ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের পর মুসলমানরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতো থেকেই অপসারিত হয়নি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদেরকে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। বাঙলাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ কোম্পানি এখন ভারতের অন্যান্য অংশেও কায়েম করে। কৃষি প্রধান পূর্ববাঙলা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পের পশ্চাতভূমি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, রাস্তাঘাট,

---

[৬৪] আবদুল করিম, বাংলায় ইতিহাস, ঢাকা, একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৫১৬।

[৬৫]. আব্বাস খালী খান, বাংলার মুসলমানদের ইসতিহাস, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ২১।

[৬৬]. আবদুল করিম, ড. বাঙলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, অনুঃ মোকাদেসুর রহমান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৮।

[৬৭]. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫।

[৬৮]. ওয়াকিল আহমদ, ড. উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৩; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

[৭]. হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

রেলপথ ও কলকারখানা না থাকায় পূর্ববাঙলায় কোন উন্নয়নমুখী কাজ হয় নি। ব্রিটিশদের ব্যাপক কাঁচামাল লুণ্ঠনের ফলে বাঙলা তথা ভারত ইংল্যান্ডের পণ্যের কাঁচা বাজারে পরিণত হয়। এজন্য প্রথমেই তারা এ দেশীয় শিল্প ধ্বংসের কাজে হাত দেয়।

ব্রিটিশরা এ দেশ দখল করে নেয়ার অনেক পূর্বেই বাঙলায় মোটা-চিকন কাপড়সহ বিভিন্ন দেশীয় শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল। বিদেশে বাঙলার মসলিনসহ বিবিধ পণ্যের প্রচুর চাহিদা ছিল। বাঙলার অর্থনীতিকে দুর্বল করার জন্য কোম্পানি শাসকরা মুসলিম উৎপাদকদের হাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কেটে দিয়েছিল। আবার ইংরেজ ব্যবসায়ীরা নীল চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করতো। তেমনি তাঁতীদেরকে ভয় দেখিয়ে কাপড় বুনতে বাধ্য করতো, অথচ কাপড়ের ন্যায্য দাম দিত না। বাজারের চেয়ে অনেক কম মূল্য দেয়া হতো। এ সম্পর্কে এ, আর মল্লিক বলেনঃ " The prices received from company's agents would often be 10 p.c. or even 40 p.c. less than the market value."[70]

এমনিভাবে ব্রিটিশরা একদিকে দেশয়ী ও ইংল্যান্ডের পণ্য ব্যবসায়ে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে, অন্যদিকে এদেশীয় শিল্পের উপর দমননীতি চালায়। এ দেশের তাঁত (বয়ন) শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে দেবার জন্য কোম্পানির ডিরেক্টররা অচিরেই এই আইন পাশ করেঃ "They adopt a policy of discouraging finished products from India and encouraging the manufacture of raw cotton and silk. They also recommended that silk dealers should be forced to work in the company factories and prohibited from working their own looms."[71] এ সম্পর্কে এইচ. লাপেন্ট নামক জনৈক ইংরেজ আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, "We have destroyed the manufacture of India."[72]

---

[70]. Azizur Rahman mallick, british Policy and the Muslims in bengal, Dacca, bangla Academy, 1961 p.57.
[71]. Ibid, p. 57.
[72]. Romes Dutta. The Economic History of India in the Victorian Age: London, 1908 (3rd Ed.) p.110.

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে রমেশ দত্ত বলেনঃ

"আঠারো শতকে ভারত ছিলো একটি বিশাল শিল্প উৎপাদক ও সেই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক দেশ এবং ভারতের তাঁতজাত দ্রব্যাদি তখন সরবরাহ হতো এশিয়া ও ইউরোপের বাজারে। একথা দুঃখজনকভাবে সত্য যে, শত বর্ষ আগের স্বার্থপর বাণিজ্যের নীতি অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকেই ইংল্যান্ডের উঠতি শিল্প উৎপাদকদেরকে উৎসাহিতো করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্প উৎপাদকদেরকে নিরুৎসাহিতো করতো। তাদের অপরিবর্তনীয় নীতি, যা ছিলো ভারতকে গ্রেট বৃটেনের শিল্পের অধীনস্ত করা এবং ভারতীয় জনগণকে শুধু সেই কাঁচামাল উৎপাদন করতে বাধ্য করা, যা গ্রেট বৃটেনের তাঁত কারখানাগুলোতে সরবরাহ করা যেতে পারে।"[৭৩] এ দেশীয় বয়ন শিল্প ধ্বংস করার ফল যে কতদূর শোচনীয় হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ট্রেভেলিয়ানের প্রদত্ত তথ্যে। তিনি বলেন, এক সময় এদেশের মসলিন শিল্পের অধঃপতন ঘটতে থাকে।

জনসংখ্যা দেড় লাখ থেকে কমে ত্রিশ-চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়।[৭৪] ব্রিটিশ শাসকেরা প্রথমে ইংল্যান্ডে ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর উপর অধিকহারে করারোপ করে এবং সেখানে কোন কোন পণ্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। এমনকি ভারতের অভ্যন্তরেও ভারতীয় পণ্যের উপর নানারকম শুল্ক বসানো হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন ভারতীয় পণ্যের উপর শতকরা আশি ভাগ ট্যাক্স বসানো হয়। অপরদিকে ব্রিটিশ পণ্যের শুল্ক মওকুফ করে দেয়া হয়। ফলে প্রচুর বিলেতি পণ্য আসতে থাকে ভারতবর্ষে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে সারা ভারতবর্ষই বিলেতি পণ্যে ছেয়ে যায়। ফলে ভারতের হস্তচালিত শিল্প ধ্বংস হতে থাকে। অসংখ্য কারিগর বেকার হয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ায় বাঙলার গ্রামগুলো জনাকীর্ণ হয়ে উঠে।

এ নীতির ফলে এক সময়কার শিল্পকার পণ্য রপ্তানীর দেশ পরিণত হলো আমদানীকারকের দেশে। এখানকার কাঁচা পাট ও কৃষি দ্রব্য কলকাতার কারখানায় ব্যবহৃত হতো এবং কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে সেই পণ্য বিদেশে প্রবেশ করতো।[৭৫] বলতে গেলে তখন দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল। সিরাজুদ্দৌলাকে ক্ষমতোচ্যুত করার জন্য উমিচাঁদ ও মীর জাফরের সাথে কোম্পানির যে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি হয়, তার অর্থনৈতিক দাবি পূরণ করতে গিয়ে

---

[৭৩]. বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭, পৃ.২৩।
[৭৪]. Romesh Dutta, Opeit, p. 105
[৭৫]. নিতাই দাস, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে।[৭৬] ফলে ১১৭৬ সনে (১৭৬৯ খ্রী.) বাঙলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' দেখা দেয়।[৭৭] আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের পরের বছর ইংরেজরা আগের তুলনায় শতভাগ বর্ধিত খাজনা আদায় করেছিল।[৭৮] অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু[৭৯] জমিদারের সন্তানের জন্ম-উৎসব বিবাহোৎসব ও মৃত্যুর শ্রদ্ধানুষ্ঠানে প্রণামী দিতে হতো মুসলমান প্রজাদেরকেও। কথিত আছে যে, জনৈক হিন্দু জমিদার এই কর বা সেলামীতে তুষ্ট ছিলেন না; বরং নিজ মেয়ে-জামাইরের ভরণ-পোষণের জন্য জামাই খরচও দাবি করতো।[৮০] অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের কারণে মানব সন্তান যখন ক্ষুধা-পিপাসা ও মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, তখন তাদের শোষণ করে উল্লাস করছিল ইংরেজ ও তাদের রাজস্ব আদায়কারীরা।[৮১]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আর্থিক সচ্ছলতাই জাতির সমৃদ্ধি ও শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু ইংরেজ সরকারের নীতি ছিল এদেশের মুসলমানদের আর্থিক সঙ্গতি নষ্ট করে তাদের শক্তির উৎস বন্ধ করা। মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতাকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্য তারা যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) অন্যতম।[৮২] লর্ড কর্ন ওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩) কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলার অধিকাংশ প্রাচীন জমিদারী প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় এবং এক নতুন জমিদারী শ্রেণির উদ্ভব হয়।[৮৩] এতে এ অঞ্চলের শতকরা আশি জন মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭১ সালে এক তৃতীয়াংশ লোকের (এক কোটি) মৃত্যু ঘটে।

---

৭৬. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৪।

৭৭. উদ্ধৃতিঃ বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৭৮. নিতাই দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড), কলিকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স তন্ত্র পাবলিশার্স লিঃ ১৩৮১ বাংলা, পৃঃ৪। ভারতে মুসলিমদের আগমনের পূর্বে এ ইপমহাদেশের সাহিত্যে 'হিন্দু' শব্দটির প্রচলন ছিল না। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে মুসলীম আরবেরা সিন্দুরত আগমণ করেন এবং এর নামকরণ করেন হিন্দু, আর এএখানকার জনগণকে হিন্দু বলে আখ্যায়িত করা হয়। ক্রমে ক্রমে হিন্দু শব্দটি ভাবার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশইল 'হিন্দী' নামে পরিচিত হয়ে যায়। এখন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদেরকে 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। (আবুল হাশিম, পাকিস্তানের সংহতি, (বাংলা), অনুঃল ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৬৯, পৃ. ১০৫)।

৭৯. ভারতে মুসলিমদের আগমনের পূর্বে এ ইপমহাদেশের সাহিত্যে 'হিন্দু' শব্দটির প্রচলন ছিল না। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে মুসলীম আরবেরা সিন্দুরত আগমণ করেন এবং এর নামকরণ করেন হিন্দু, আর এখানকার জনগণকে হিন্দু বলে আখ্যায়িত করা হয়। ক্রমে ক্রমে হিন্দু শব্দটি ভাবার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশই 'হিন্দী' নামে পরিচিত হয়ে যায়। এখন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদেরকে 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। (আবুল হাশিম, পাকিস্তানের সংহতি, (বাংলা), অনুঃ ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৬৯, পৃ. ১০৫)।

৮০. হুমায়ুন আবদুল হাই, পূর্বোক্ত, পৃ.৪। আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫।

৮১. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫।

৮২. বিস্তারিতঃ সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ.৮৪-১১৬; হুমায়ুন আবদুল হাই, পূর্বোক্ত, পৃ.৫।

৮৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ) বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ১ম খন্ড, ১৯৯৩, পৃ. ২৭৫; হুমায়ুন আবদুল হাই, পূর্বোক্ত, পৃ.৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক দেশই আশা করে যে, কর হিসেবে যা কিছু আদায় করা হয়, তা দেশেই ব্যয় করা হোক। অতীতে ভারতের ভাল-মন্দ সকল শাসকের আমলেই তা করা হতো। কিন্তু ইংরেজরা খাজনার মাধ্যমে যে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতো, তা থেকে ভারতের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য কিছুই ব্যয় করতো না। প্রশাসন ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয় নির্বাহের পর বাদ-বাকি অংশ পাচার হতো ইংল্যান্ডে। এক কালের বিখ্যাত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রজনী পাদ দত্তের মতে,

"যে বঙ্গদেশ বহুকাল কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল, সে বাংলা ইংরেজ শাসনামলে বৃটেনে উৎপাদিত পণ্যের কৃষি নির্ভর কলোনীতে পরিণত হয়ে যায়। সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর বাংলা মোগল রাজত্বে আখ্যা পেয়েছিল 'জিন্নাত-উল-বেলাত'। (স্বর্গভূমি)।[৮৪]

রমেশ দত্ত বলেন,

"ভারতীয় কবির ভাষায় রাজা কর্তৃক উঠানো কর সূর্য কর্তৃক মাটি থেকে শুঁষে নেয়া আর্দ্রতার মতো, যা আবার মাটিতেই ফিরে আসে উর্বরশীল বৃষ্টিরূপে। কিন্তু ভারতের মাটি থেকে ওঠানো আর্দ্রতার এমন উর্বরশীল বৃষ্টিরূপে ফিরে আসে অন্য ভূমিতে (ইউরোপে), ভারতের উপর নয়"।[৮৫]

কোম্পানির এমনি শোষণ আর বঞ্চনার এক শতাব্দী শাসনের রাজস্ব নীতির ফলে উপমহাদেশের অর্থনীতিতে যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে উত্তর ভারতের বিশিষ্ট ইসলামি

চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৯৯৮) বলেন,

"দারিদ্র্যভাবে জর্জরিত সাধারণ মানুষকে রোজ এক আনা, দেড় আনা বা একসের খোরাকের জন্যও বিদ্রোহীদের অধীনে চাকরি নিতে হয়েছে"।[৮৬]

মজার ব্যাপার হচ্ছে ইংরেজরা যখন নিজেদের শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিনিময়ে এ দেশের কাঁচামাল অবাধে লুণ্ঠন করছিল, তখন মুসলিম বিদ্বেষী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এটাকে "বঙ্গদেশের কৃষক" শীর্ষক বইতে 'বাণিজ্য বিনিময়' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

---

৮৪. সিরাজুল হোসেন খান, উপমহাদেশের সামাজিক -রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ২০০২, পৃ.২৫।

৮৫. বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, (রমেশ দত্ত রচিত Economic History of India থেকে গৃহীত) পৃ.২১।

৮৬. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারণা, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮২, পৃ.১৫।

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা যদি ইংল্যান্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংল্যান্ডে পাঠাইতে হইবে, নাহলে আমার বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অধিকাংশের বিনিময়ের আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল পাঠাই–যথা, চাউল, রেশন, কার্পাশ, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলাবাহুল্য, যে পরিমাণে বাণিজ্য বৃদ্ধি হইলে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে"।[৮৭]

তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে আরো বলেন,

মুসলমান আমলে এদেশের শাসন, দেওয়ানী, বিচার, সৈন্য, পুলিশ প্রভৃতি বিভাগের চাকরিতে মুসলমানের প্রাধান্য ছিল। এ সম্পর্কে ১৮৭১ সালে ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টার[৮৮] এর উক্তি ।

"Three distinctive streams of wealth ran perennially into the ceffers of a Noble Musalman House-Military Command, the collection of Revenue and Judicial or Political or Political Employ"[89]

নিজেদের সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে মুসলমানরা একে একে এসব কিছু হারায়। ছোট বড় সব রকম চাকরি ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দুদের দেয়া হয়।[৯০] ব্যবসায়–বাণিজ্য হতে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়। ফলে অগণিত লোক বেকার হয়ে পড়ে। এরূপে শিক্ষা–সংস্কৃতি, ব্যবসায়–বাণিজ্য ও প্রভাব–প্রতিপত্তির সকল ক্ষেত্রে মুসলমানরা (পঞ্চাশ বছরের মধ্যে) নিমজ্জিত হয় এক মহাদুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায়। মাঝে মাঝে মুসলমানরা তীক্ষ্ণ

---

৮৭. মঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, সাহিত্য সংসদ ১৩৬৬, পৃ.৩০৭–৮।

৮৮. স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার (১৮৪০–১৯০০) ছিলেন ইংরেজ নাগরিক। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্বিস কর্মচারী এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও পন্ডিশ ব্যক্তিরূপে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বাঙলায় আসেন ১৮৬২ সালে এবং অ্যানালস্ অব দি রুর‍্যাল বেঙ্গল (১৮৬৮) রচনা বাঙলায় আসেন ১৮৭১ সালে ষ্ট্যাটিসটিকস বিভাগের মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি (১৮৭৫–৭৭) সালের মধ্যে ২০ খন্ডে ষ্ট্যাটিসটিকস অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল প্রকাশ করেন। ১৮৭১ সালে তিনি 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান রচনা করেন। এই গ্রন্থের দ্বারা ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অবগত হয়। ১৯৭৪ সালে মরহুম বিচারপতি আবদুল মওদুদ এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাংলা একাডেমী থেকে এটি প্রকাশ করা হয়। ১৮৮১ 'ব্রিক হিসটোরি অভ দি ইন্ডিয়ান পীপলস রচনা করেন। টাইমস পত্রিকায় তিনি ভারত বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি ১৮৮১–৮৭ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল আইন সভার অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। ১৮৮২–৮৩ পর্যন্ত শিক্ষা কমিশনের সভাপতি এবং ১৮৮৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন (আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পর্বোক্ত, পৃ. ২৬ বিস্তারিত দেখুন বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড ১৮৭৬, ৭৬৩।

৮৯. Hunter, W.W. The Indian Musulman, Bangladesh First Edition, 1975 p. 114.

৯০. আব্বাস আলী খান, জামায়েত ইসলামীর ইতিহাস, ঢাকা, বই বিজ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৬ পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তার মনোভাব ও যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রচণ্ড ক্ষমতো প্রদর্শন করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[৯১] মুসলমানদের দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং তাদের প্রতি ইংরেজ সরকারের অবিচারের ফলে একশ সত্তর বছর আগে যে কোন প্রতিষ্ঠিত পরিবারের একজন বাঙ্গালি মুসলমানের পক্ষে গরীব হওয়া ছিল অকল্পনীয়। আজ সত্যিকার বলতে গেলে, তার পক্ষে ধনীরূপে টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার বলেন,

"A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well Musalman in Bengal to become poor; at present it is almost impossible for him to continue rich."[৯২]

"Before the country passed to us. They (Musalmans) were not only the politicked but the intellectual power in India".[93]

বস্তুত ইংরেজদের আগমনের পর তৎকালীন ভারতের গোটা মুসলিম জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার মুসলমানগণ। হান্টার বলেন,

"I am best acquainted, and in which, so far as I can learn, the Muhammadans have suffered most severely under British Rule"[94]

সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার মুসলমানদের অবস্থা তখন এমন এক অবস্থা এসে দাঁড়ায় যে, তাঁদের

ভাগ্যে জুটত শুধু কাঠ কাটা, পানি টানা ও কলম মেরামতো করার চাকরি। সরকারি উচ্চপদসমূহে তাদের কোটা প্রায় শূন্যের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।[৯৫]

এক সময় বাঙলা ভারতের মধ্যে ধন -ঐশ্বর্যে অতুলনীয় ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিল। তখন আয়ের উৎস ছিল প্রধানত তিনটি। যথা- সামরিক আধিপত্য রাজস্ব সম্পদ এবং বিচার

---

[৯১]. এমাজ উদ্দীন ড. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ ১৯৬৪, পৃ. ৬০২।
[৯২]. Hunter, w.w op. cit, p. 141.
[৯৩]. Ibid, p. 113.
[৯৪]. Ibid, pp. 140-41
[৯৫]. Ibid, p.152.

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। কিন্তু ক্রমে সেদেশে অভাব ও দারিদ্র্য দেখা দিল।[৯৬] তাই দেখা যায় উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে পূর্ব বাংলায় মুসলমান কৃষকদের ঋণের বোঝা আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছিল। মুসলমানদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষে বাঙলার জনপ্রিয় নেতা এ কে ফজলুল হক এগিয়ে আসেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাঙলার বিভিন্ন স্থানে স্কুল–কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি 'ঋণ শালিশী বোর্ড' গঠন করে কৃষকদের ঋণের বোঝা খানিকটা হালকা করেন। তখন থেকে বাঙলার মুসলমানরা শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। এর পর বাঙালার শত নদী বিধৌত পলিমাটিতে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তেমন একটা দেখা যায়নি। বরং হিন্দু–মুসলিম প্রায় সমানতালে এগুতে থাকে।

বাংলায় মুসলমানদের আগমনঃ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাসহ পূর্ব ভারতে মুসলমান রাজনৈতিক শক্তির প্রবেশ ঘটে। ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে লক্ষ্মৌতিকে (গৌড়) রাজধানী করে বখতিয়ার খলজী বাংলায় একটি মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। তখন থেকে অন্যান্য অংশে মুসলমান শাসন বিস্তার লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় তাঁর বিস্তার ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা মুসলমান শাসনাধীন থাকে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান এ দুটি রাষ্ট্র হিসেবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তান নামে অভিহিতো পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ এবং পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত বাংলার পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর অংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান এখন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশ একটি মুসলমান রাষ্ট্র; এর জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের প্রাধান্য। এ দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে ৮০%

---

[৯৬]. অনেকে তাঁকে 'আল্লামা বলে অভিহিত করেন। আল্লামা আরবী শব্দ। এর অর্থ সর্বাধিক জ্ঞান। (আল কাওসার, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩য় স্করণ, ১৯৮৯ পৃ. ৪১৬) বস্তুত ইসলাম সম্পর্কে যিনি গভীর জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন তাকে 'আল্লামা' বলা হয়ে থাকে। আবুল হাশিম ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। তাই তাঁকে এই পদবীতে ভূষিত করা হয়েছে। বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী বলেন, আবুল হাশিমকে কোন একটি রাজনৈতিক দলের নেতা যখন আল্লামা বলে প্রথম সম্বোধন করেন তখন আমার মনে জাগে আবুল হাশিম তো স্ব নামেই সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচিত, তাঁকে আল্লামা খেতাবে আখ্যায়িত করার প্রয়োজন কি? তিনি বলেন যতই দিন যাচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম যে আল্লামা পদবীটি যদি এ দেশের কারো নাম সাথে প্রযোজ্য হতে পারে, তবে তিনি হলেন আবুল হাশিম। একাডেমিক দিক থেকে আবুল হাশিম বড় ডিগ্রিধারী ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন 'ড. হাসান জামান পণ্ডিত মানুষ; আমি পণ্ডিত নই।' কিন্তু তিনি ছিলেন জ্ঞানের দিক থেকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ও একজন প্রজ্ঞা ব্যক্তি যিনি তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন প্রশ্ন ও সমস্যার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন। এমন প্রাজ্ঞজন এ দেশে আর জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। (মনসুর আহমদ সৈয়দ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০)

Dhaka University Institutional Repository

জনেরও বেশি ইসলাম ধর্মের অনুসারী।[৯৭] এমনকি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ, উভয় নিয়ে গঠিত বাংলাও (১৯৪৭ এর আগে) ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসন বিস্তারের তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়। তিনি ছিলেন উমাইয়া খিলাফতের অধীনে পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক দিক থেকে এ বিজয়ের কোন স্থায়ী ফল ছিল না। কিন্তু এটা আরবের মুসলমান ও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইয়ামনী সুলতান আমীর সুবুক্তগিন ও তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদ বারবার ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। বিশেষত শেষোক্তজন তাঁর সতের বার অভিযানকালে উপমহাদেশের বেশ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু পূর্বে কনৌজ ও দক্ষিণে গুজরাটের সোমনাথ পর্যন্ত আক্রমণ করলেও তিনি শুধু লাহোরকে কেন্দ্র করে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক ক্ষুদ্র অংশে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করে সে অঞ্চল তাঁর গজনী সুলতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় তরাইনের যুদ্ধ থেকে যখন ভারতের ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘোরী নামে অধিকতর পরিচিত সুলতান মুইজউদ্দীন মোহাম্মদ বিন সাম পৃথিবীরাজ চৌহানকে পরাজিত করেন এবং দিল্লীকে রাজধানী করে তাঁর ভারতীয় বিজয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৮] সমগ্র উপমহাদেশে মুসলমান শাসনের আওতায় না আসা পর্যন্ত বিজয়ের এই তৃতীয় পর্যায় অপ্রশমিতোভাবে চলতে থাকে। বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় ছিল এই তৃতীয় পর্যায়ের ক্রম পরিণতি।

মুসলমানদের প্রথম পর্যায়ের বিজয়ের প্রভাব পড়েছিল আরব সাগর উপকূলে। এর সঙ্গে বাংলার কোন সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয় পর্যায়ও বাংলা পর্যন্ত সুদূর পূর্বাঞ্চলকে প্রভাবিত না করলেও এটা পূর্ব ভারতের শাসকবৃন্দ ও জনগণের মনে তুর্কীদের সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করেছিল। তবে মোহাম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধু ও মুলতান দখল করেছিলেন প্রায় সে সময়েই আরবগণও বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এ সম্পর্কের প্রকৃতি পরীক্ষা করাই এ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলার সঙ্গে যে আরবদের যোগাযোগ ছিল তার নিশ্চিত সাক্ষ্য আছে। এর ধরনের সাক্ষ্যকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য, আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পরম্পরাগত কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ দুটি

---

৯৭. জে.এস.বি. (ঢাকা), খণ্ড ২৪-২৬, ১৯৭৯-১৯৮১, পৃ.১-১০।

৯৮. সংস্কৃত লিপিগুলোতে আক্রমণকারিগন গজ্জনেশ্বর এবং তুরুষ্ক নামে অভিহিত। পৃষ্ঠাংশের জন্য দেখুন,

Dhaka University Institutional Repository

রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কার করেছেন। একটি পাওয়া গেছে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের খননকৃত স্থানে এবং অপরটি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে। প্রথম মুদ্রাটি ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুন-উর-রশিদ কর্তৃক মোহাম্মদিয়া টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ। তথ্যের অভাবে দ্বিতীয় মুদ্রাটির সনাক্তকরণ দুরূহ, কিন্তু মনে হয় যে এ মুদ্রাটিও আব্বাসীয় আমলের। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির ভিত্তিতে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, সেই প্রাথমিক আমলে আরব ধর্মপ্রচারকগণ বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন। কিন্তু মুদ্রাটি যে বণিকদের মাধ্যমেও বাংলায় এসে থাকতে পারে সে কথা এ সকল পণ্ডিত উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখনই যেমন দেখা যাবে যে, বস্তুত সেই প্রাথমিক আমলে বাংলার সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। রংপুরের গড় গ্রামে সাম্প্রতিককালে আবিস্কৃত একটি ফার্সি শিলালিপিতে এর সম্পাদক তারিখ গড়েছেন ১২৩ হিজরি। এটাকে তিনি হিজরি দ্বিতীয় বা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু শিলালিপির নির্ভুল পাঠ থেকে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এটি মোঘলো আমলের শেষ দিকের। ৯৯ফলে ঐ প্রাথমিক আমলে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল বা উত্তর বাংলায় মুসলমানদের কোন বড় বসতি ছিল এসব প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য একথা প্রমাণ করে না।[৯৯]

খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী আরব ভৌগোলিকগণ ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় সমুদ্রবন্দর ও বাণিজ্য স্থানগুলোর মূল্যবান বিবরণ রেখে গেছেন। এগুলোর কতগুলোকে সাধারণভাবে পূর্ব ভারতের এবং বিশেষভাবে বাংলার কিছু স্থান হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে। ভৌগোলিকদের মধ্যে সুলায়মান হচ্ছেন সর্বপ্রথম। তিনি তাঁর সিলসিলাত- উত-তাওয়ারীখ লিখেছিলেন ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। ভৌগোলিকদের মধ্যে ইবনে খুরদাদবিহ (মৃত্যু ৯১২ খ্রিঃ) হচ্ছেন প্রথম যিনি তাঁর কিতাব -উল-মামালিক ওয়াল মামালিক গ্রন্থে আরব সাগরের উপকূল থেকে চীন উপকূল পর্যন্ত বাণিজ্যপথের আলোচনা করেছেন। প্রধানত ইবনে খুরদাদবিহের বিবরণ অনুসরণ করে আল ইদ্রিসী (জন্ম ১১শ শতকের শেষ ভাগ) এবং আল মাসুদী (মৃত্যু ৯৫৬ খ্রিঃ) একই কাজ করেছেন। এটা ছিল আরবিয় বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ যখন আরব বাণিজ্য বিভিন্ন দেশ থেকে ও বিভিন্ন দেশে পণ্যাদি আমদানি ও রপ্তানি করার জন্য ভূ-মধ্যসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সকল পূর্বাঞ্চলীয় সাগরেই যাতায়াত করতো। সুমদ্র বন্দরের অবস্থান ও প্রকৃতি, পণ্যাদি প্রাপ্যতা, তাদের

---

৯৯. জে.এ.বি. খণ্ড ৯, ১৯১৫ ; পৃ. ৪২, টীকা, খণ্ড ১৮, ১৯৫২, পৃ.১৪০; এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, ২য় খণ্ড, পৃ

Dhaka University Institutional Repository

উৎপত্তিস্থান, মূল্য এবং এ ধরনের সকল সমস্যাদির মতো ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে গবেষণার দায়িত্ব উত্তধিকারী সূত্রে আরব ভৌগোলিকদের উপরে বর্তে ছিল।[১০০] পরবর্তীকালে অর্থাৎ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যের চরম উন্নতির সময়ে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণও তাদের বণিকদের সুবিধার্থে একই ধরনের গবেষণা করেছিলেন।

আরব ভৌগোলিকগণ দুই ধরনের তথ্য সরবরাহ করেন। প্রথমতো যেসব দেশে তাদের বাণিজ্য পথগুলো গিয়েছিল সে সব দেশের বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন–এ রকম একটি দেশকে বাংলা হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত তাঁদের বর্ণনায় এমন একটা বন্দরের উল্লেখ রয়েছে যেটাকে বাংলার উপকূলের একটি সমুদ্র–বন্দর হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে। সুবিধার কারণে আমরা প্রথমেই সুলায়মানের প্রাসঙ্গিক পুস্তকাংশটি উদ্ধৃত করছি।

"রুহমী নামক একটি রাজ্যের সীমান্তে এ তিনটি রাজ্য (জুর্জ, বলহার ও তফক) অবস্থিত। রুহমীর সঙ্গে জুর্জ যুদ্ধে লিপ্ত। রাজা খুব সমাদৃত নন। জুর্জের সঙ্গে তিনি যেমন যুদ্ধে লিপ্ত তেমনি বলহারের সঙ্গেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত। তাঁর সৈন্য সংখ্যা বলহার, জুর্জ তফকের রাজার সৈন্য সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। কথিত আছে যে তিনি যখন যুদ্ধ–যাত্রা করেন, প্রায় ৫০,০০০ হাতী তাঁর অনুবর্তী হয়। হাতী তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে না এবং কেবল শীতকালেই বাইরে যেতে পারে বলে তিনি শুধু শীতকালেই যুদ্ধ–যাত্রা করেন। কথিত আছে যে তাঁর সৈন্যদলে দশ পনের হাজার লোক শুধু কাপড় তৈরি করার এবং কাপড় ধোলাই–এর কাজে নিযুক্ত থাকে।[১০১] তাঁর দেশে এমন বস্ত্র তৈরি হয় যেটা অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। এটা এতেঠ সূক্ষ্ম ও মিহি যে এ বস্ত্রে প্রস্তুত একটি পোশাক একটি মোহরাঙ্কিত আংটির ভেতর দিয়ে যেতে পারে। এটা সুতার তৈরি এবং আমরা একখণ্ড দেখেছি। কড়ি হচ্ছে দেশের প্রচলিত মুদ্রা এবং এর মাধ্যমেই ব্যবসা চলে। তাদের দেশে সোনা ও রুপা এবং চন্দন কাঠ আছে এবং সমারা (সোম) নামে একটি জিনিস আছে যা দিয়ে মাদব (মাদক বা উত্তেজক পানীয়) তৈরি হয়। ডোরাকাটা ভূষণ বা কারকদম এদেশে পাওয়া যায়। এ জন্তুটির কপালের মাঝখানে একটি মাত্র শিং আছে এবং শিং–এ মানুষের প্রতিকৃতির মতো একটি আকৃতি আছে।" পরবর্তী লেখকগণ আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণসহ একই ধরনের তথ্য সরবরাহ করেছেন।

---

১০০. ৩৬১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

১০১. মেমোয়েরস অব দি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, নং ৫৫, পৃ.৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয় সুলায়মান তাঁর বর্ণিত দেশগুলো সফর করেন নি। ইলিট মনে করেন যে সুলায়মান তাঁর বর্ণিত দেশগুলো বহুবার সফর করেছেন। কিন্তু মোহাম্মদ হোসেন নাইনারের মতে বিভিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি সিলসিলাত-উত-তাওয়ারীখে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১০২] সে যাই হোক, আধুনিক পণ্ডিতগণ সুলায়মান বর্ণিত রুহমী রাজ্যটি সনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। হোদিভালা নিম্ন লিখিতভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন: আমার মনে হয় যে মামুদী যে 'রাহমা'কে রাজার উপাধি বা নাম এবং তাঁর রাজ্যের নাম বলে বলেছেন যেটাকে এ তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে যে সুলায়মান ও মামুদী তাঁদের জ্ঞানের জন্য যে মূল গ্রন্থের কাছে ঋণী সে গ্রন্থে এ রাজ্যকে মালিক-উদ-দায়হসি বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। এ শব্দগুলো দ্ব্যর্থবোধক এবং এটা 'ধর্মের রাজ্যকে' এবং রাজা ধর্মকেও বুঝতে পারে। পরবর্তীকালে দালকে মনে করা হয়েছিল। 'রে' এবং 'রে' কে 'ওয়া'। ফলে এ শব্দগুচ্ছকে 'রুহমী রাজ্য' হিসেবে ভুল পড়া হয়েছিল।" [১০৩]বর্তমান পণ্ডিতগণ মোটামুটি একমতো যে, পালবংশের রাজা ধর্মপাল ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল সুলায়মানের সিলসিলাত -উত-তাওয়ারীখের সমসাময়িক এবং এ অর্থে রুহমীকে ধর্মপালের রাজ্য, অর্থাৎ বাংলা রূপে সনাক্ত করা যেতে পারে।

রুহমীর সনাক্তকরণ যাই হোক না কেন, সুলায়মান প্রদত্ত রুহমীর বর্ণনা যে বাংলা সম্পর্কে প্রযোজ্য সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। হাতী, মিহি সূতীবস্ত্র, গণ্ডার এবং বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কড়ি-এসবই বাংলাকেই যে নির্দেশ করা হয়েছে সে ইঙ্গিত দান করে। মিনহাজ-ই-সিরাজ ও ইবনে বতুতার মতো পরবর্তীকালের লেখকগণ এবং প্রায় সব ইউরোপীয় পরিব্রাজকে বাংলা সম্বন্ধে একই রকম তথ্য রেখে গেছেন। [১০৪]একস্থানে মামুদী বলেছেন "রাহমা রাজ্য সমুদ্র ও অন্তবর্তী ভূ-ভাগ উভয়দিকেই বিস্তৃত ছিল। অন্তবর্তী ভূ-ভাগের দিকে কামন রাজ্য বই এর সীমান্তে অবস্থিত। কারন হচ্ছে কামরূপের ভিন্নরূপ। সুতরাং রাহমাকে বাংলারূপে সনাক্ত করা যেতে পারে।

---

১০২. সোহরাব আলী: একশ তেইশ হিজরীর শিলালিপি, দিনাজপুর যাদুঘর সিরিজ নং ৪।

১০৩. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী: অ্যাসপেক্টস অব সোসাইটি অ্যান্ড কালচার অব দি বরিন্দ, ১২০০-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১০৪. অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পৃ.৪৫৪-৪৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

আরবদেশ থেকে চীন পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী ব্যবসায়িক স্থানগুলোর নামও আরব ভৌগোলিকগণ দিয়েছেন। ইবনে খুরদাদবিহ কর্তৃক তালিকাভুক্ত এবং বাংলার উপকূলের নিকটে অবস্থিত বলে যে কেন্দ্রগুলোকে মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

বুলিন হতে বাবওন =দুই দিনের পথ। এখানে চাল উৎপন্ন হয় এবং সরান্দীবে (শ্রীলঙ্কা) রপ্তানি করা হয়।

বাবওন থেকে সিঞ্জিলি এবং কবশকন =একদিনের পথ, এখানে চাল উৎপন্ন হয়।

সিঞ্জিলি ও কবশকন থেকে কুদাফরিদের মোহনা–দূরত্ব ও ফরসং।

কুদাফরিদ থেকে কইলাকন, লাওয়া এবং কংগজা=দুই দিনের পথ। এখানে চাল ও গম উৎপন্ন হয়। কইলকন, লাওয়া এবং কংগজা থেকে সমন্দর =দূরত্ব ১০ ফরসং।[১০৫] কামরুন থেকে ১৫/২০ দিনে মিঠাপানি দিয়ে [অর্থাৎ নদীপথে] এখানে চন্দন কাঠ আনা হয়।

এসব নাম বহু বিজ্ঞ পণ্ডিতকে হতোদ্যম করেছে। সমুদ্র পথ সম্বন্ধে ইবনে খুরদাদবিহের কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না এবং এলোমেলোভাবে তিনি নামগুলো তালিকাভুক্ত করেছেন এ অভিযোগ তুলে এস.এইচ. হোন্দীভালা স্থানগুলোর সনাক্তকরণের চেষ্টাই ত্যাগ করেন।[১০৬] এ.এইচ. দানী সনাক্তকরণের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে বলেন যে, আরব ভৌগোলিকদের সমন্দর ছিল বাংলার উপকূলীয় কোন স্থানে অবস্থিত, খুব সম্ভবত এটা মেঘনা মোহনায় অবস্থিত।"

আমরা এখানে শুধু সমন্দরের সঙ্গে জড়িত, কারণ এটাই একমাত্র স্থান যাকে বাংলার উপকূলীয় কোন স্থানের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা যেতে পারে। অন্যগুলোর সনাক্তকরণ সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। সমন্দর সম্পর্কে আরব ভৌগোলিকগণ নিম্ন লিখিত বর্ণনা দিয়েছেন:

ইবনে খুরদাদবিহ:

"এখানে চাল উৎপন্ন হয়। কামরুন ও অন্যান্য স্থান থেকে ১৫ দিনে মিঠাপানি দিয়ে [অর্থাৎ নদীপথে] এখানে চন্দন কাঠ আমদানি করা হয়।

---

১০৫. ইলিয়ট অ্যান্ড ডাওসন: হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস্ হিস্টোরিয়ান্স, প্রথম খন্ড পৃ.৫।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইদ্রিসী:

"সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সমৃদ্ধিশালী স্থান, যেখানে অনেক লাভবান হওয়া যায়। এ বন্দর কনৌজের অধীন। কাশ্মীর দেশ থেকে আসা এক নদীর তীরে এটা অবস্থিত। চাল এবং অন্যান্য শস্য বিশেষত উৎকৃষ্ট গম এখানে পাওয়া যায়। ১৫ দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরূত দেশ (কামরূপ) থেকে এখানে মিঠাপানির নদী পথে চন্দনকাঠ আনা হয়। এ দেশ থেকে যে চন্দন কাঠ আসে তা উৎকৃষ্টতর এবং মনোরম সুগন্ধযুক্ত। এটা করন পর্বতমালায় জন্মায়। এ শহর থেকে নৌকায় একদিনের দূরত্বে জনপূর্ণ এবং বৃহৎ দ্বীপ আছে যেখানে সব দেশের ব্যবসায়ীরা রীতিমতো যাতায়াত করে। এটা সন্দ্বীপ থেকে চার দিনের দূরত্বে অবস্থিত।[১০৭] সমন্দর থেকে উত্তরে সাতদিনের দূরত্বে কাশ্মীর নগরী অবস্থিত। এই নগরী ভারতের সর্বত্র আদৃত এবং এটা কনৌজের রাজার অধীন। কাশ্মীর থেকে কামরূত চারদিনের এবং কাশ্মীর থেকে কনৌজ প্রায় সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এটা একটা সুন্দর বাণিজ্যিক শহর যা এ দেশের রাজাকে খ্যাতি দান করেছে।

উপরে উদ্ধৃতাংশগুলো থেকে নিম্ন লিখিত নির্দিষ্ট বিবেচ্য বিষয়গুলো পাওয়া যায়:

১. কাশ্মীর ভূ-খণ্ড থেকে আসা এক নদী তীরে সমন্দর অবস্থিত,

২. সমন্দর কাশ্মীরের দক্ষিণে অবস্থিত,

৩. ১৫/২০ দিনে নদীপথে কামরূত নামক স্থান থেকে সমন্দরে চন্দনকাঠ আনা হতো,

৪. সমন্দর থেকে নৌ-পথে একদিনের দূরত্বে জনবসতিপূর্ণ এবং বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিশালী একটি দ্বীপ ছিল,

৫. সমন্দর ছিল কনৌজের অধীন একটি বন্দর।

সমন্দরের সঙ্গে আল-ইদ্রিসী কাশ্মীর, কনৌজ এবং কামরূত এ তিনটি স্থানেরও উল্লেখ করেছেন। কাশ্মীর ও কনৌজকে সনাক্ত করতে কোন অসুবিধা নেই, কারণ দুটো নামই একই আকারে আমাদের কাছে এসেছে। সব আধুনিক পণ্ডিতই একমতো যে, কামরূত ও এর ভিন্নরূপ কামরূনকে কামরূপত অর্থাৎ বর্তমান আসামের সঙ্গে অভিন্ন বলে সনাক্ত করা উচিত।[১০৮] সুতরাং উপরের ২ ও ৩ নং উক্তি অনুযায়ী অনুমান করা যেতে পারে যে সমন্দর ছিল কাশ্মীর ও কামরূপ

---

১০৭. এম. এইচ. নাইমায়: আরাব জিওগ্রাফার্স নলেজ অব সাউদার্ন ইন্ডিয়া, পৃ.১২।

১০৮. এস.এইচ.নাইমায় হেদিতাবাদ: স্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রী, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ের দক্ষিণে। ৪নং বিবরণটি এ ইঙ্গিত দেয় যে, কাশ্মীর থেকে আসা নদীর ঠিক সাগর-সঙ্গমস্থলে সমন্দর অবস্থিত ছিল। সুতরাং প্রথম উক্তির সঙ্গে এ উক্তি পড়লে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সমন্দর ছিল গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত। কারণ গঙ্গাই হচ্ছে একমাত্র নদী যেটা কাশ্মীরে শুরু হয়ে বাংলার উপকূলে সাগরে পড়েছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সমন্দর ছিল বাংলার উপকূলের একটি শহর। ৫নং উক্তি এ ইঙ্গিত দেয় যে সমন্দর ছিল কনৌজের অধীন। আগে যেমন দেখানো হয়েছে রুহমী রাজ্য বা ধর্মের রাজ্য হিসেবে পরিচিত ভূ-খণ্ডকে পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের শাসনাধীন বাংলা হিসাবে সনাক্ত করা যায়। কনৌজ ছিল ধর্মপালের অধীন। সুতরাং সমন্দর বাংলার উপকূলে অবস্থিত ছিল ৫নং উক্তিও এ মতোকে সমর্থন করে। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে ইদ্রিসী কর্তৃক উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বগুলো একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীর থেকে কনৌজের দূরত্ব ৭ দিনের যাত্রাপথ হলে কাশ্মীর থেকে সমন্দরের দূরত্ব একই সময়ের হতে পারে না, কারণ আল-ইদ্রিসীর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই সমন্দর ছিল নদীর মোহনায়।[১০৯] সুতরাং আল ইদ্রিসীর প্রদত্ত দূরত্বগুলো এলোমেলো এবং এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

আরব ভৌগোলিকদের সমন্দর বাংলার উপকূলে অবস্থিত ছিল এ সিদ্ধান্তে আসার পর আমরা এর নিশ্চিত অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি। ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকের জোয়াও ডি ব্যারোসের একটি মানচিত্রে আমরা দেখি যে, বাংলায় প্রবেশ করে গঙ্গা ফতিয়াবা (ফতেহাবাদ) নামক এক স্থানে দুটি মাথায় বিভক্ত হয়ে দুটি প্রধান জলস্রোত হিসেবে প্রবাহিতো হয়েছে।[১১০] এ দুটির পশ্চিমেরটি বর্তমানে যেটাকে ভাগিরথী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে সে খাতে প্রবাহিতো হয়েছে এবং পূর্বের এবং প্রশস্ততরটি অর্থাৎ, পদ্মানদী চট্টগ্রামে সাগরে পড়েছে। আবুল ফজলের মতোনুসারে "এর (বাংলার) নদীগুলো অসংখ্য এবং এগুলোর মধ্যে এ প্রদেশে প্রধানটি হচ্ছে গঙ্গা: এর উৎস খুঁজে বের করা যায় না। উত্তরের পর্বতমালা শুরু হয়ে এটা দিল্লী, রাজকীয় আগ্রা, এলাহাবাদ এবং বিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতো হয়ে এটা বাংলায় প্রবেশ করে এবং বরবকাবাদ সরকারের অন্তর্গত কাজিহাট্টার কাছে দুটি প্রধান খাতে ভাগ হয়ে যায়। এর একটি পূর্বদিকে প্রবাহিতো হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে সাগরে পড়েছে।

---

১০৯. ইলিয়ট অ্যান্ড ডাওসন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬, ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা একই রকম তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "বাংলায় প্রথম যে শহরে আমরা প্রবেশ করি তার নাম সুদকাওয়ান। বিশাল সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত এটি একটি বিরাট শহর।

হিন্দুরা যে নদীতে তীর্থে যায় সে গঙ্গা এবং যুন (যমুনা) নদী সাগরে পড়ার আগে এর কাছে মিলিত হয়েছে।" ইবনে বতুতার সুদকাওয়ানকে চট্টগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাঁর ভূগোল লিখতে গিয়ে টলেমী নিম্ন গঙ্গা এর শাখাসমূহ এবং যে সব অঞ্চলের উপর দিয়ে এগুলো প্রবাহিতো হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এর পাঁচটি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে সর্বপশ্চিমে ছিল ১৪৪.৩০ দ্রাঘিমাংশ ও ১৫.১৫ অক্ষাংশে অবস্থিত অ্যান্টিবেগ নামে পরিচিত মোহনা। কাম্বিসন মোহনাকে তাম্রলিপ্ত বা আধুনিক তবলুকের ভাগিরথী খাত হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে এবং সর্ব পূর্বের অ্যান্টিবেগ মোহনাকে সনাক্ত করা হয়েছে সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী সন্দ্বীপখাল হিসেবে।[১১১] পণ্ডিতবর্গ এটাও দিয়েছেন যে টলেমীর সময় সর্বপূর্বের জলস্রোতই ছিল গঙ্গার প্রধান গতিপথ। সর্বপূর্বের এ জলস্রোতই যে গঙ্গার প্রধান গতিপথ ছিল তা পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী থেকেও জানা যায়। এ নদীর ঠিক অপরদিকে সাগরে একটি দ্বীপ আছে যা হচ্ছে উদীয়মান সূর্যের নীচে পূর্বদিকে মনুষ্য বসতিপূর্ণ পৃথিবীর শেষ অংশ। এর নাম ক্রাইস।

এন.কে. ভট্টশালী এ গঙ্গা নদীকে টলেমীর অ্যান্টিবোল শাখা এবং সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম উপকূলের মধ্যবর্তী সন্দ্বীপ খাল হিসেবে সনাক্ত করেছেন। তিনি ক্রাইস দ্বীপকে সন্দ্বীপ হিসেবে সনাক্ত করেছেন। গঙ্গার সর্বপূর্ব মোহনা নদীর অপর দিকের দ্বীপ নদীর তীরের বাণিজ্যিক শহর –এ সব সম্পর্কে সব তথ্যই আরব ভৌগোলিকদের প্রদত্ত তথ্যের প্রায় অনুরূপ।[১১২]

উপরে আলোচিত উৎসগুলো থেকে অনুমেয় বিষয়গুলো আমরা এখন সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে পারি। গঙ্গানদী যে সাগর অভিমুখে প্রবাহিতো হয়ে মানব বসতিপূর্ণ পৃথিবীর শেষ অংশে গিয়ে সাগরে পড়েছে এ তথ্য পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী সমর্থন করে। মোহনার কাছে নদী তীরে একটি বাণিজ্যিক শহর এবং এবং নদীর বিপরীত দিকে মোহনাতেই সাগরে একটি দ্বীপ ছিল। সুতরাং এটা

---

১১১ এস. এইচ. হোদিভালা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮।

১১২ প্রসিডিংস অব দি পাকিস্তান হিস্ট্রী কনফারেন্স, প্রথম অধিবেশন, করাচী, পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গার সর্বপূর্বের মোহনারই উল্লেখ করছে।[১১৩] টলেমীর মতোনুসারে বাংলায় গঙ্গা পাঁচটি জলস্রোতে ভাগ হয়ে যায় যার সর্বপূর্ব ও প্রধানটি হচ্ছে চট্টগ্রাম খাত হিসেবে চিহ্নিত অ্যান্টিবোল। আরব ভৌগোলিকগণ আরও বলেছেন যে কাশ্মীরে শুরু হওয়া নদী (অর্থাৎ গঙ্গা) নিম্ন অভিমুখে প্রবাহিতো হয়ে এমন জায়গায় এসে সাগরে পড়েছে যেখানে একটি বাণিজ্যিক শহর এবং তাঁর বিপরীত দিকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ একটি দ্বীপ রয়েছে। ইবনে বতুতা বলছেন যে চট্টগ্রাম (সুদকাওয়ান) সাগর তীরে অবস্থিত এবং সাগরে পড়ার আগে গঙ্গা এবং যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদী এর কাছে মিলিত হয়েছে। আবুল ফজল বলেছেন যে, চট্টগ্রাম বন্দরে গঙ্গা নদী সাগরে পড়েছে।[১১৪] জোয়াও ডি ব্যারোসের মানচিত্রও এ উক্তিকে সমর্থন করে। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে পেরিপ্লাস ও আবুল ফজলের মধ্যবর্তী বহুশত বছরের ব্যবধান কালে মাঝে মাঝে পরিবর্তন সত্ত্বেও গঙ্গা নদীর সর্বপূর্বের খাতটি সব সময়ই তার দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, যথাঃ

ক. এর মোহনায় বা তার কাছে একটি বন্দর–নগরীর অবস্থিতি।

খ. তার মোহনার বিপরীত দিকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ একটি দ্বীপের অবস্থিতি। আবুল ফজলের আইন এবং ডি ব্যারোসের মানচিত্রের মতো অপেক্ষাকৃত আধুনিক উৎসে বন্দরটিকে চট্টগ্রাম ও দ্বীপটিকে সন্দ্বীপ হিসেবে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১১৫] ইবনে বতুতার সুদকাওয়ান (চট্টগ্রাম) এবং পেরিপ্লাসে ক্রাইস সন্দ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত। সুতরাং এটা সম্ভাব্য যে আরব ভৌগোলিকদের সমন্দরকে চট্টগ্রাম এবং সমন্দরের বিপরীত দিকের দ্বীপটিকে সন্দ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

আরাকানী রাজাদের উপাখ্যান রাদজায়েং এ রক্ষিত একটি কিংবদন্তি বলছে, "কথিত আছে যে তাঁর সময়ে (৭৮৮–৮১৩ খ্রিঃ) বহু কূ–ল বা বিদেশী জাহাজ রনবী দ্বীপে ধ্বংস হয়ে যায়। এই জাহাজগুলোয় মুসলমান হিসেবে কথিত আরোহীদেরকে আরাকানের মূল–ভূখণ্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানকার গ্রামগুলোতে তারা বসবাস করতে থাকে। বাংলার ঠিক পার্শ্ববর্তী আরাকানের সঙ্গে

---

১১৩. এম.এইচ. নাইনার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

১১৪. ইলিয়ট অ্যান্ড ডাওসন, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০–৯১।

১১৫. এম.এইচ. নাইনার, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

যে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মতো প্রাচীনকালেই আরবদের যোগাযোগ ছিল[১১৬] এবং কিংবদন্তি এ রূপ ধারণার সমর্থন দানকারী এক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ একই কিংবদন্তি আরও বলছে যে ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকীন রাজা সু-লা তেইং সন্দা-ইয়, সুরতন নামে এক দেশের বিরুদ্ধে এক অভিযানে গিয়েছিলেন এবং সেট-টা-গোইং নামে অভিহিতো এক স্থানে, সাধারণত যেমন লেখা হয় চট্টগ্রামে একটি পাথরের বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। এতে রাজার একটি মন্তব্য যে যুদ্ধ করা অনুচিত তার প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। সাধারণত মনে করা হয় যে রাজার কথিত বাক্য সেটা-ই-গোইং থেকেই চট্টগ্রাম নামে উৎপত্তি হয়েছিল আবার কেউ কেউ মনে করেন যে সুরতন হচ্ছে সুলতানের আরাকানী এবং এ সময়ে চট্টগ্রামে একটি আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে আরাকানী কিংবদন্তীর সুর-তন-হচ্ছে একটা জায়গার নাম, অথচ সুলতান হচ্ছে কোন পদ বা প্রশাসনিক প্রধানের নাম। জোয়াও ডি ব্যারেসের মানচিত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষিণে বার নামের একটি স্থান রয়েছে। সম্ভবত আরাকানী কিংবদন্তীতে তাকেই বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং চট্টগ্রামে আরব রাজ্য স্থাপন সম্পর্কে কিংবদন্তীতে কিছুই বলা হয় নি।[১১৭]

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের বিজয়ের আগে হিন্দু মুসলমান সুফি ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলায় এসেছিলেন এরকম ইঙ্গিত প্রদানকারী বহু কাহিনী বাংলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে এসব কাহিনীর ঐতিহাসিকতা রক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা যাবে যে কাহিনীগুলোতে প্রদত্ত এসব সাধকদের সময়কাল ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়।[১১৮] তুর্কীদের বিজয়ের আগে কোন মুসলমান সাধক বাংলায় এসেছিলেন কিনা এখন প্রমাণসাপেক্ষ।

মুসলমান মাহিসওয়ার সাধকগণ তুর্কিদের বিজয়ের জন্য বাংলায় এসেছিলেন এ কথা প্রমাণ করার জন্য কোন কোন মকতুল হোসেনের রচয়িতা, সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি মোহাম্মদ খানের বংশ তালিকা উল্লেখ করে থাকেন।[১১৯] মোহাম্মদ খান উল্লেখ করেন যে আরব থেকে চট্টগ্রামে আগত জনৈক মাহিসওয়ার ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। একই উৎসানুসারে কবির পূর্বপুরুষ মাহিসওয়ার গ্রহণ

---

১১৬. আইন ২য় খণ্ড, পৃ.১৩৩।

১১৭. এন.কে. ভট্টাশালী: কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনোলজী অব দি আর্লি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুলতান্স অব বেঙ্গল, পৃ. ১৪৫-১৪৯।

১১৮. অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড বাই টলেমি, জে. ডব্লিউ. ম্যাকক্রিণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৭২-৭৩।

১১৯. সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৫, পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন সিদ্দিকের পরিবারে (ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক) এবং তিনি ছিলেন উমর, উসমান, আলী হামজার গুণাবলি সম্পন্ন। জলপথে বিশ্বভ্রমণে ইচ্ছুক জনৈক হাজী খলিল পীর মাহিসওয়ারকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে চেয়েছিলেন। হাজী খলিল পীর সিংহের চামড়া পরিধান করেছিলেন এবং দুজনে মাছের পিঠে চড়ে সাগর পথে তাঁদের যাত্রা শুরু করেন। তাঁরা চট্টগ্রামে পৌছালে কদল খান গাজী এবং বদর আলম তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। চট্টগ্রামে অবস্থানকালে মাহিসওয়ার একজন ব্রাহ্মণ মেয়েকে বিয়ে করেন।[১২০১২০] কিছুদিন পর তিনি চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মণ স্ত্রীর গর্ভজাত বংশধরগণ এখানেই থেকে যান।

এখানে মাহিসাওয়ারের সমসাময়িক হিসেবে আরও তিন ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন হাজী খলিল পীর, কদর খান গাজী এবং বদর আলম। হাজী খলিল পীর আরব থেকে মাহিসওয়ারের সঙ্গী হিসেবে এসেছিলেন এবং অন্য দু'ব্যক্তি তাঁদের চট্টগ্রামে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কবি হাজী খলিলকে পীর হিসেবে আখ্যায়িত করলেও তাঁর সম্পর্কে প্রচুর অলৌকিক ঘটনা আরোপ করা হয় নি যা ছিল সে যুগে স্বাভাবিক। তাঁর সিংহের চামড়া পরিধান করা বিশেষ ধরনের কাপড়কে এবং তাঁদের মাছের পিঠে চড়া বিশেষ ধরনের জাহাজকে বুঝিয়ে থাকতে পারে। এ দুটি অলৌকিক ঘটনাকে (এগুলো যদি আদৌ অলৌকিক ঘটনা হয়ে থাকে) বিবেচনা না করলে সহজ ঘটনাটা এই দাঁড়ায় যে হাজী খলিল পীর ও মাহিসওয়ার দু'জনই পর্যটক হিসেবে বা খুব সম্ভবত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে এসেছিলেন।চট্টগ্রামে মাহিসওয়ারের একজন স্থানীয় স্ত্রী গ্রহণ করা এটাই প্রমাণ করে যে সে সময়ে কিছু কিছু আরব ব্যবসায়ী তাঁদের বাণিজ্যস্থলে, বিশেষত কোন স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে হলে স্থানীয় স্ত্রী গ্রহণ করতেন।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের এবং আরাকান উপকূলে বদর মুকাম বা বুদ্দুর মুকাম নামে আখ্যায়িত কিছু স্থান আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে এ স্থানগুলোর সময়কাল ৯ম–১০ম শতাব্দী থেকে নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং আরব মুসলমানদের উপস্থিতির প্রভাবে এগুলো হয়েছিল।[১২১১২১] কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ এমতোকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। এ স্থানগুলো যত প্রাচীন বলে

---

১২০. দি পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ানসী, ডব্লিউ. ডব্লিউ. শফ কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৪৭–৪৮।

১২১. সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৫, পৃ. ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

এতেঠদিন যাবত ধারণা করা হচ্ছিল এগুলো ততটা প্রাচীন এমন ইঙ্গিত দেয়ার মতো কোন প্রমাণ নেই এবং খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আগে এগুলোর তারিখ নির্ধারণ করা যায় না।

উপরিউক্ত প্রধান বিষয়গুলো এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের আগে থেকেই বাংলার সঙ্গে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এ যোগাযোগ ছিল একান্তভাবেই বাণিজ্যিক।[১২২] চীন পর্যন্ত বাণিজ্যিক পথ বর্ণনাকালে আরব ভৌগোলিকগণ একটি দেশ ও সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে যথাক্রমে বাংলা ও চট্টগ্রামরূপে সনাক্ত করা যেতে পারে। তাঁদের সাক্ষ্য নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে আরব থেকে ব্যবসায়ীরা বাংলার উপকূলে ও সামুদ্রিক বন্দরে আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহজতর করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে হতো এবং কখনও কখনও তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় স্ত্রী গ্রহণ করতেন। সেই প্রাথমিক আমলে বাংলার সঙ্গে কোন মুসলমান সুফির যোগাযোগ ছিল কিনা এবং তাঁরা স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন কিনা তা এখনও বিশ্বাসযোগ্য উৎসের সাহায্যে প্রমাণসাপেক্ষ।[১২৩] আমাদের জ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে আমরা এ ইঙ্গিত দিতে পারি যে, বাংলার সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক পর্যায়ের। বাংলায় ইসলাম প্রচার এবং মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি বিজয়ের সময় থেকে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

---

১২২. ই. হক ও এ. করিম: আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃ: ১৩।

১২৩. জে.এ.এস.পি. ৭ম খণ্ড সংখ্যা ১, পৃ. ১৭-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবুল হাশিমের জীবন ও কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লামা আবুল হাশিম এর জীবন ও কর্ম

বর্ধমান জেলা পরিচিতি :

১ বিভাগ (১৩,৯৮৪ ব.মা.; জন.১,১১,০২,৫৩০), পশ্চিম বঙ্গ, ভারত। বিভাগীয় কমিশনার চুঁচুড়ায় থাকেন। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, ও পুরুলিয়া (পূর্বে বিহারের অধীনে ছিল) জিলা সমবায়ে গঠিত। ২ জিলা (২,৭০৫ ব.মা.; জন. ২১,৯১,০৬৬), বর্ধমান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ; রাজ, বর্ধমান। উত্তরে অজয় নদ। বর্ধমান সদর, আসানসোল, কালনা ও কাটোয়া মহকুমা সমবায়ে গঠিত। প্রধানতঃ দামোদর নদ দ্বারা বিধৌত এবং দামোদর সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দ্বারা বহুভাবে উপকৃত। ধান, গম, ছোলা, ডাল, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জিলার পশ্চিমাংশে আসানসোল মহকুমার প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়; এখানে বহু শিল্প-কেন্দ্র রয়েছে। রাণীগঞ্জ একটি কয়লা খনি কেন্দ্র; বারুলের নিকটে লৌহখনি রয়েছে; দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা; অন্ডালে রেলওয়ে ওয়াকশপ। বর্ধমান ও কালনায় শিবলিঙ্গ মন্দির আছে। ৭ম শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের এবং ১২শ শতকে সেন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ১৬শ শতকে এখানে মোগল-পাঠানদের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ হয়। ৩ শহর (জন. ৭৫, ৩৭৭), বর্ধমান জিলার সদর, বাঁকা নদীর তীরে ঈস্টার্ন রেলওয়ের স্টেশন (কলিকাতার উ.প.৫৯ মা.), শেরশাহ নির্মিত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড শহরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। কলিকাতা হতে সড়ক যোগাযোগ। চাউল ও তৈলের কল; হোসিয়ারী কারখানা; সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং; ধান, পাট, শরিষা, ইক্ষু প্রভৃতির ব্যবসা কেন্দ্র; বিশ্ববিদ্যালয়, ও মেডিক্যাল কলেজ আছে; অদূরে ১৭৮৮ খ্রী. নির্মিত ১০৮ টি শিবলিঙ্গ মন্দির আছে। পাঠান সুলতান দাউদ খান পরাজিত ও নিহতো (১৫৭৫) হওয়ার পর তাঁহার পলায়নপর পরিবার এখানেই মোগলদের হাতে ধৃত হয়; মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগান এখানেই নিহতো হন; তাঁর কবরও এখানে। স্বামীর মৃত্যুর পর নূরজাহান (তখন মেহেরুন্নিসা) বর্ধমান হতে মোগল প্রাসাদে নীত হন। জাহাংগীরতনয় খুররম (পরে শাহ্‌জাহান) ১৬২৪ খ্রী. বর্ধমান অধিকার করে তিন বছর এখানে ছিলেন। শহরের বড় মসজিদ তাঁর সময়ে নির্মিত। শাহজাহানের সময় লাহোর হতে কাপুর নামে একব্যক্তি বর্ধমানে আসেন; তিনিই বর্ধমানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা; ১৬৫৭ খ্রী. তিনি স্থানীয় চৌধুরী ও ফৌজদার নিযুক্ত হন। শহরে রাজাদের বহু কীর্তি বর্তমান। ১৭৬০ খ্রী. মীর কাসিম বাংলার নওয়াব হয়ে বর্ধমান, মেদিনীপুর, ও

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দান করতে বাধ্য হন। ১৮৬৩ খ্রী. এখানে ম্যালেরিয়া এমন মহামারী আকারে দেখা দেয় যে পরবর্তীকালে এই রোগ "বর্ধমান ফীভার" নামে অভিহিতো হয়।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আল্লামা[১২৪] আবুল হাশিম[১২৫] এর জন্ম ১৯০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার[১২৬] পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাশিয়ারা বা কাসেম নগর[১২৭] গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। সাত ভাই-বোনের মধ্যে সর্বশেষ ও একমাত্র পুত্র সন্তান হলেন আবুল হাশিম।[১২৮] আবুল হাশিম এর পিতা ও মাতা উভয়ে ছিলেন চাচাতো ভাই-বোন।[১২৯] তাঁর দাদা মাওলানা আব্দুল মজিদ এবং নানা নওয়াব আবদুল জব্বার ছিলেন সহোদর ভাই।[১৩০] জন্মের ছয় বছরের মাথায় আবুল হাশিম তার মাতাকে হারান। এর পর তিনি বর্ধমানের বাড়িতে তার খালা নাসিবা খাতুনের (১৮৭০-১৯৬৪ (খ্রী.) লালন-পালনে বড় হন।

বংশ পরিচয় ঃ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই আবুল হাশিমের পূর্বপুরুষগণ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামী ছিলেন। ইংরেজদের সাথে এই পরিবারে পূর্বপুরুষগণের সুসম্পর্ক থাকায় পরবর্তী প্রজন্মও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গড়ে উঠেছিল। ফলে ১৮৫৭ সালে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ বংশের লোকজন একাধারে সরকারি কর্মকর্তারূপে সমাজ সংস্কার ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তখনকার আর দশটি মুসলিম পরিবারের মতো এই পরিবারেও নারী-পুরুষদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা তথা আরবি, ফার্সি , উর্দু শিক্ষার বেশি প্রচলন ছিল। তথাপি তাঁরা দৈনন্দিন কাজকর্ম ও কথাবার্তায় উর্দুর পরিবর্তে

---

[১২৪]. আবুল হাশিম। একটি আরবী শব্দ। 'হাশমুন' শব্দের বিশেষণ হল 'হাশিম' এর সাথে 'আলিফ-লাম' যুক্ত করে আল হাশিম করা হয়েছে। হাশমুন শব্দের আভিধানিক অর্থ হল to ধ্বংস করা, চূর্ণ করা। to bruise দুমড়ানো, মুচড়ানো। (জে.জি.হাডা, আল ফারায়িজুল দুররিয়্যাহ, বেরুত, ক্যাথলিক প্রেস, ১৯৬৪, পৃ. ৯৬৪) উল্লেখ্য, রাসূল (সাঃ) এর পর দাদা (প্রপিতামহ) ইবনে হাশিমের সময় মক্কায় ভীষণ অভাব দেখা দেয়। তখন ইবনে হাশিম আটার রুটির সঙ্গে 'শুরবা' (ঝোল) মিশিয়ে (দুমড়ে-মুচড়ে) গরীবদের খাওয়াতেন। এ জন্য লোকেরা তাকে 'হাশিম' বলে অভিহিত করে। (আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সলাইমনা নাদভী, সীরাতুন নবী, (১, খন্ড), বাংলা, অনুবাদঃ এ, কে, এম ফজলুল রহমান মুন্সী, ঢাকা, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি. ১৯৮৮, পৃ. ৬০) হাশিম শব্দের সাথে 'আবু' শব্দটি যোগ করে পিতা আবুল কাসিম রাসূল (সাঃ) এর প্রপিতামহের অনুকরণে আলোচ্য পুত্রের নাম রাখেন আবুল হাশিম।

[১২৫]. Abul Hasiam, In Retrospect, Chattagong Dhaka, Bangladesh Co-operative Book society Ltd. 1974, P.13.

[১২৬]. পিতা আবুল কাসেমের নামে এ গ্রামের নাম রাখা হয়। সে নামেই এখন ঐ গ্রাম ও ডাকঘর পরিচিত। (বদরুদ্দীন উমর, আমার জীবন, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৪১)

[১২৭]. আবুল হাসিমের অন্যান্য বোনরা হলেন আসিয়া খাতুন, হাবিবা খাতুন, হাফসা খাতুন ও সুফিয়া খাতুন। দুই বোন শৈশবেই মারা যায়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১৪-১৫)

[১২৮]. Abul Hashim, In Retrospect, OP, cit p, 13.

[১২৯]. Ibid, 13.

[১৩০]. Ibid, 14. নিঃ সন্তান ও বিধবা খালা নাসিবা খাতুন আবুল হাশিমকে নিজ সন্তানের মত প্রতিপালন করেন। আবুল হাশিমও তাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। ১৯৬৩ সালে এই মহিলা ইন্তেকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানত বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন। তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর হতে বর্ধমানে আগত আবুল হাশিমের পূর্বপুরুষ কাজী শায়খ হামিদ দানশমন্দ বা হামিদ বাঙ্গালী (১৮৯৮–১০৫০ হি.) মুগল যুগেই হামিদ বাঙালি খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। মূলত তাঁর কারণেই এই পরিবারটি অধিক প্রভাব অর্জন করেছিলেন। এ পরিবারের অন্যতম পূর্বপুরুষ হলেন পবিত্র মক্কা হতে আগত খান বাহাদুর গোলাম আসগর জাহেদী কোরাইশী (মৃ–১৮৫৭)। তিনি ছিলেন শাহ হায়াত মজিদ জাহেদী কুরাইশী পরবর্তী চতুর্থ সিঁড়ির বংশধর। তাঁর পিতার নাম গোলাম বদর জাহেদী। খান বাহাদুর গোলাম আসগর ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। মুসলমান সম্প্রদায় যখন ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষাকে প্রায় এড়িয়ে চলছিল, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অন্যান্য মুসলিমদের মতো তারাও যদি ইংরেজদের বিরোধিতা করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, তবে অগ্রসরমান হিন্দুদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। এ জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তারাও ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে হিন্দুদের মতো তারাও সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুরু থেকেই এই পরিবারে মূল পেশা ছিল সরকারি চাকরি।[১৩১] আবুল হাশিমের প্রপিতামহ খান বাহাদুর গোলাম আসগর ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন সাব জজ[১৩২] কোম্পানির অধীনে চাকুরি করলেও বরাবরই তিনি ছিলেন এ দেশের আজাদীর পক্ষে। 'সিপাহী বিদ্রোহ' তথা আজাদীর আন্দোলনে সরাসরি জড়িত না থাকলেও এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ও যোগাযোগ ছিল। এজন্য কোম্পানির প্রশাসন বিভাগ তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলেও আখ্যায়িত করেছিল। সেই সময়কার একটি ঘটনা আবুল হাশিম তাঁর মাতাসহ নওয়াব আব্দুল জব্বারের কাছে শিশু বয়সে শুনেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"According the then custom, the Governor of the Province summoned for an exclusive interview the dignitaries of the Province at least once in a year by turn. His father Khan Bahadur Gulam Asgar was once summoned to appear before the Governor. My great grandfather took his son Abdur jabber was then a small boy. The East India Company's Administration Suspected my

---

১৩১. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p. 15.
১৩২. Ibid, p. 13.

Dhaka University Institutional Repository

great grandfather's association with the sepoy Mutiny. The Governor said, O You are traitor" My great grandfather immediately, replied, "Definitely so, or else how could you ruls us"? the Governor appreciated his reply and did not take any action against him." [133]

গোলাম আসগরের সন্তানরাও যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতি অর্জন করতে পারে এ জন্য তৎকালীন হিন্দু অভিজাত শ্রেণির সাথে তাল রেখে তিনি তাঁর দুই পুত্র আব্দুল জাব্বার (১৮৩৭-১৯১৮) এবং আবদুল মজিদকে (১৮৪৯-১৯২২) ইংরেজি শিক্ষা দেন। তাঁরা ছিলেন এ পরিবারে দ্বিতীয় প্রজন্মের অগ্রণী পুরুষ। পিতার পথ অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল জব্বার বি.এ শেষ বর্ষে পড়ার সময়ই ইরেজ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেছিলেন।[১৩৩] উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার মুসলমান কেন্দ্রীক রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছিল। তার অনেকগুলোর সঙ্গে নওয়াব আবদুল জব্বার যুক্ত ছিলেন।[১৩৫]

---

১৩৩. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p. 16. অর্থাৎ তখনকার দিনে নিয়ম ছিল প্রাদেশিক গভর্নর বছর অন্তে একবার কেবলমাত্র গণ্যমান্য উচ্চদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য তাদের সঙ্গে মিলিত হতেন। মাতাসহ প্রায়ই তাঁদের আলাপ আলোচনা কি হত তা আমাকে বলতেন। একবার তিনি একটা খুব মজার ঘটনা আমাকে বলেছিলেন। তাঁর পিতা খান বাহাদুর গোলাম আসগরকে গভর্নর তলব করেছিলেন এবং তিনি তাঁর পালকপুত্র আবদুল জব্বারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকবর্গ সে সময় সন্দেহ করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমার প্র-পিতামহের সংযোগ রয়েছে। সে জন্য গভর্নর তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যায়িত করলেন। (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের আকস্মিক আঘাতের ফলে হত চকিত এ সময় মুসলিমদের প্রতি ভারা বিশেষ সন্দেহগ্রস্ত) প্রপিতামহ (খান বাহাদুর গোলাম আসগর) উত্তরে বলেছিলেন, সেতো অবশ্যই, নতুবা আপনারা আমাদের শাসন করেন কি ভাবে? গভর্নর (তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ) উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকেন। (আবুল হাশিম, আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬. অনুবাদে ইষৎ পরিবর্তন।)

১৩৪. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p. 16.

১৩৫. ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে বিদ্রোহ দমনে তিনি সহায়তা করেছিলেন। এই সময় বাঙলা তথা ভারতের কতিপয় মুসলমানের প্রথম প্রতিষ্ঠান Mahammedan Association (১৮৫৫) সালে প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর সদস্যপদ লাভ করেন। (ড. ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৮) কর্মজীবনে তিনি ১৮৮৪, ১৮৮৬, ১৮৮৩ বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৯-১৮৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সদস্য এবং ১৮৯৫ সালে সি.আই.সি উপাধি লাভ করেন। নওয়াব আব্দুল লতীফের সাথে তাঁর নিভির সম্পর্ক ছিল। সে সূত্রে Muslim Literary Socity' র সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০০ সালে তিনি ঐ সোসাইটির সভাপতি হন (চতুরঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯) ইসলামী শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য তিনি দুটো 'উর্দু পুস্তিকা' ও 'ইসলাম ধর্ম পরিচয়' নামে একটি বাংলা বই লেখেন। (সৈয়দ মনসুর আহমদ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ.৪০৯) আব্দুল জব্বার ব্যক্তিগত জীবনেও ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। (Abul Hasim, In Retrospect, Op, cit, p. 22.) মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর মতে মেয়েদের কর্তব্য হল ঘরে অবস্থান করা এবং ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা. তবে প্রয়োজনে স্বামীর কাছে চিঠি পত্র লেখার মত বাংলা শিখতে পারে। কিন্তু কখনোই ইংরেজি শিখবে না। (Sufia Ahamed, Muslim Comminuty in Bangla (1884-1912), oxford university press,

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম আসগরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং আবুল হাশিমের দাদা আবদুল মজিদও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি এন্টাস পাস করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সিনিয়র অফিসার (আবগারি ডিপার্টমেন্ট) পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন।[১৩৬] এর পর তিনি বর্ধমান জেলার কালনা মুহকুমার রসুলপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বিবাহ করেন।[১৩৭] তাঁর ঔরসেই আবুল হাশিমের পিতা মৌলভী আবুল কাসেমের (১৮৭২-১৯৩৬) জন্ম হয়। শৈশবে মাতৃবিয়োগের পর মৌলভী আবুল হাসেম তাঁর চাচা নওয়াব আব্দুল জব্বারের পরিবারে চাচী মোসাম্মৎ সাদেকা খাতুনের মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত হন। আবদুল মজিদের প্রথম স্ত্রী সায়েমা খাতুনের অকালমৃত্যু হলে তিনি শালিকাকে বিবাহ করেন। বিয়ের তিন মাসের মাথায় তিনি মারা যান।[১৩৮] এই স্ত্রীর কোন সন্তানাদি ছিল না। এরপর আব্দুল মজিদ তৃতীয় বিয়ে করেন তাঁরই এক আত্মীয় মুসাম্মৎ তায়্যেবা খাতুনকে। এই স্ত্রীর গর্ভে চার পুত্র এবং তিন কন্যা জন্ম লাভ করে।[১৩৯]

আবদুল মজিদ অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তাঁর মানসিক স্থিরতার অভাবে তিনি ভারসাম্যপুর্ণ জীবন-যাপনে সক্ষম ছিলেন না। অনেক সময় সামান্য কারণেই

---

first published, Nov, 1974 p. 344) আবদুল জব্বারের এই চিন্তাধারা পরবর্তী প্রজন্মেও প্রভাব ফেলে। ফলে এই পরিবারে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় না। সরকারি চাকরি করাতে নওয়াব আবদুল জব্বারের জীবনকালে কংগ্রেস, কিংবা মুসলিম লীগ কোন দলের সাথেই যোগাযোগ ছিল না। তবে রাজনীতির ব্যাপারে যথেষ্ঠ সচেতন ছিলেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এক Muhammadan Educational Conference ডাকা হয়। সে সভায় আব্দুল জব্বার উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সেবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের জন্য বৌ বাজারে ১৮৯৬ সালে টেলর হোষ্টেল স্থাপিত হয়। হোস্টেলে ছাত্র সংকুলান না হওয়ায় আরো বড় হোস্টেলের দাবীতে ১৯০৮ সালে আবদুল জব্বার নতুন হোস্টেল নির্মানের দাবি জানান। (Kazi Safia Rahaman, Change and Continently Aegse of certain aspests of the Muslim Society of Burdan District (1817-1947) an unpublished M phi thesis Jadappur University, p.63) তাঁরই চেষ্টায় ১৯০৯ সালে কলকাতার তালতলার স্মিথ লেনে মুসলমান ছাত্রদের 'বেকার হোস্টেল' স্থাপিত হয়। (Mojibur Rahaman, Histroy of Madrasha Education Calcutta, 1977, P. 151) কাশিয়াড়া গ্রামের একটি রাস্তাও তাঁরই চেষ্টায় পাকা হয় এবং এ রাস্তার নামকরণ করা হয় নওয়াব আবদুল জব্বার রোড। (সৈয়দ মনসুর আহমদ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ.৪১০) এ সমস্ত কারণে নওবাব আবদুল জব্বারের স্থান অতি উর্ধ্বে উল্লেখ করে জনৈক রামধন গুপ্ত বলেন, "বঙ্গ দেশে বহু শিক্ষিত মুসলমান আছেন, অনেকেই হিন্দু সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন বটে কিন্তু আব্দুল জব্বার সাহেবই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।" (ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ.১০৮) নওয়াব আবদুল জব্বারের ন্যায় পরবর্তীতে তাঁর সন্তানরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। (জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী মুহম্মদ আব্দুল্লাহ (১৮৬৫-১৯২২) এন্ট্রাস পাস করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন। (Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p. 17) দ্বিতীয় পুত্র খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন (১৮৭২-১৯৪৬) প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তিনি ছিলেন বর্ধমানের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের ডিভিশনাল কমিশনার ছিলেন। (Abul Hashim, In Restrospect, Op, cit, p.15) বাংলা বিশ্বকোষ (১ম খন্ড), ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২ পৃ.১৭০) তৃতীয় পুত্র আবদুস সামাদও (১৮৮০-১৯২৯) পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হন। কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল হালিম মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে আরবী ফার্সীতে পান্ডিত্য অজন করেন।

[১৩৬]. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p. 16.

[১৩৭]. Ibid, 17.

[১৩৮]. Ibid, 17.

[১৩৯]. Ibid, 17.

Dhaka University Institutional Repository

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। তিনি সহজ সরল জীবন-যাপন করতেন। দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে এতেঠই উদার ছিলেন যে, দান-খয়রাত করতে গিয়ে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। এই ঋণ অনেক সময় পরিশোধ করতে পারতেন না।[১৪০] তাঁর অতি দান-খয়রাতের ফলে পরবর্তী প্রজন্ম যাতে নিঃস্ব ও পরমুখাপেক্ষী না হয়ে পড়ে, সে জন্য তাকে তাঁর অতি দান-খয়রাত হতে বিরত রাখার লক্ষে পরিবারের মুরুব্বিরা তাঁকে এ পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ও ভিটেবাড়ি তাঁর তৃতীয় স্ত্রী তাইয়েব্যা খাতুনের নামে লিখে দেন। সরল প্রাণ আবদুল মজিদ তাই করলেন। ফল হয় অত্যন্ত খারাপ। আব্দুল মজিদের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর সন্তানরা তাদেরই সৎ ভাই মৌলভী আবুল কাসেম ও সৎ বোন আফিয়া খাতুনের সমুদয় সম্পত্তি দখল করে নেয়।[১৪১] আবুল হাশিমের পিতা আবুল কাসেমের নাবালেগ থাকাবস্থায় তাঁর পিতা আব্দুল মজিদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী তাদের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এ কারণে আবুল কাসেম তাঁর পিতার কাছ থেকে কোন সম্পত্তি পাননি।[১৪২] তাই পরবর্তীতে আবুল হাশিমও উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তি পান নি। এ জন্য আবুল হাশিমের নানা (আবদুল জব্বার) বর্ধমান শহরে লস্কর দিঘীর পাড়ের একটি পাকা দালান তাঁকে দান করেছিলেন।[১৪৩]

আবুল হাশিমের পিতা আবুল কাসেম হলেন এই বংশের দ্বিতীয় ধাপের লোক। তাঁর বাপ-চাচা ও পূর্বপুরুষেরা সরকারি আমলা থাকলেও তিনি আমলা ছিলেন না। তাঁর সময় থেকে সকলেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফলে আগের প্রজন্মের মতো ইংরেজদের সাথে তাঁদের আর নিবিড় সম্পর্ক থাকেনি। মৌলভী আবুল কাসেমই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতির সূচনা করেন। শৈশবে আবুল কাসেমের মাতৃবিয়োগ হলেও চাচা নওয়াব আবদুল জাব্বার এবং চাচী নাসিবা খাতুনের বিশেষ স্নেহভাজন হওয়ার ফলে তাঁকে অর্থনৈতিক সংকটে খুব একটা পড়তে হয় নি। মাতৃবিয়োগের বেদনাটুকু ছাড়া আবুল কাসিমের তেমন কোন দুঃখবোধ ছিল না। পরে তিনি এই চাচারই সর্বকনিষ্ঠা কন্যা মোকাররমা খাতুনকে বিয়ে করেন। বিয়ের পরও তার স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের দায়-দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন খুব একটা হয় নি। এ দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর উপর। তাই তাঁর চাকরি করারও খুব একটা প্রয়োজন ছিল না।

---

[১৪০]. Ibid, 17.
[১৪১]. Ibid, 18.
[১৪২]. Ibid, 18.
[১৪৩]. Ibid, 18.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতির নেশাই তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এ সময় বাঙলার কংগ্রেস ছাড়া উল্লেখযোগ্য এমন কোন রাজনৈতিক মঞ্চ ছিল না, যাতে মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ করতে পারে। সঙ্গত কারণেই তিনি উদারপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপধ্যায়ের (১৮৪৮–১৯২৫) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসের রাজনীতি করেছেন এবং জীবনের শুরুতেই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৯৬ সালে আবুল কাসেম কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সর্বপ্রথম কলকতার উত্তর অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন।

এ সময় তাঁর চাচা (শশুর) নওয়াব আবদুল জব্বার (সি.আই.ই) ভুপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তখন তিনি আবুল কাসেমকে সম্ভবত রাজনীতি হতে দূরে রাখার জন্য) ১৮৯৭ সালে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ করেন এবং এ পদে তিনি ১৯০২ সাল পর্যন্ত ছিলেন। চাচার অবসর গ্রহণের পর তিনি পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে আসেন।[১৪৪] ১৯০৪ সালে আবুল কাসেম কংগ্রেস কন্সটিটিউশন কমিটির সদস্য এবং ১৯০৫ সালে কংগ্রেস স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হন।[১৪৫] স্বদেশী মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে তখন তিনি বঙ্গবঙ্গের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন এবং মুসলিম লীগের পাল্টা সংগঠন হিসেবে Bengla Mahammedan Association প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন শুরু হলে আবুল কাসেম তাঁতে যোগ দেন। ১৯২০ সালে মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে বৃটিশ সরকারের সাথে আলোচনার জন্য তুরস্কের খলীফাকে ক্ষমতোচ্যুত করার বিপক্ষে ১ম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী ইংরেজি সরকারকে প্রতিবাদ জানাতে যে খিলাফত প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন তার মধ্যে আবুল কাসেম ছিলেন অন্যতম।[১৪৬]

আবুল কাসেম সুরেন্দ্রনাথের অনুসারী হলেও ১৯১৯ সালে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করলে সুরেন্দ্রনাথের অন্যান্য অনুগামীর ন্যায় তিনিও তা সমর্থন করেন নি। তিনিই একমাত্র বাঙলার মুসলিম কংগ্রেস রাজনীতিবিদ যিনি ১৯০৫–১৯১৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিতোভাবে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করতেন।[১৪৭] ১৯২০ সালের পর তাঁর রাজনীতি ক্রমাগত দক্ষিণপন্থী রূপ নিলেও সাধারণভাবে শিক্ষা প্রসারের জন্য এবং গ্রামবাসীর নানা দুঃখ-দুর্দশা ও অসুবিধা দূর করার জন্য আইন সভার ভিতরে ও বাইরে বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উন্নত স্তরের রাজনীতির ধারক ও

---

১৪৪. আব্দুল্লাহ, মুহম্মদ, বাঙলায় খিলাফত–অসহযোগ আন্দোলন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০ মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত পৃ.৪১১।

১৪৫. চতুরঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭।

146. রুহুল আমিন, মোহাম্মদ, ফুরফুরার হযরত পীর ছাহেব কলিকাতা, আবদুল মাজেদ ১৩৪৬/১৯৩৯ পৃ. ৭১।

১৪৭. Sufia Ahmed, Op. cit P. 374-393

Dhaka University Institutional Repository

বাহক হলেও ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ জনগণ ও পেশাদারদের জন্য আন্দোলন করেন। তার দাবি ছিল চৌকিদারদেরকে পুলিশের মতোই সঠিক বেতনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নথীভুক্ত করতে হয়ে।[১৪৮] বলাবাহুল্য তাঁর এই দাবি ১৯৭৮ সালে বাস্তবায়িত হয়। মোকদ্দমা পরিচালনা করবার অধিকার লাভ করেন। ১৯৩৪ সালের ওয়াকফ আইনের ফলে সারা ভারতের মধ্যে ১৯৩৬ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়। এর মূল প্রস্তাবক ছিলেন আবুল কাসেম।[১৪৯] ১৯১৩ সালের Wakf Validiting Act এর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাছাড়াও তিনি কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং একবার কলকতা পৌরসভার কমিশনারও নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৫০]

আবুল কাসেম বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন। তবে বাংলা ভাষার প্রতি টান ছিল প্রবলতর। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করলে কবিকে অভিনন্দন জানাতে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনগামী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন আবুল কাসেম।[১৫১] তিনি The Musalman (১৯০৩) ইংরেজি পত্রিকার প্রথম সম্পাদক এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) পরিচালিত 'দৈনিক বেঙ্গলী' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া Progrss, Muslim Standard, মোসলেম বাণী, নব যুগ প্রভৃতি পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।[১৫২] তারই ইচ্ছায় নব পর্যায়ের নবযুগ পত্রিকায় তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সম্পাদক হিসাব যোগদান করেন।[১৫৩] বর্ধমানে আবুল কাসেমের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর জীবদ্দশায় বর্ধমানের পারকাস রোডের বাড়িটি হয়ে উঠেছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ সকল রাজনীতিকের এক মিলনক্ষেত্র।[১৫৪] বর্ধমানের টাউন স্কুল (১৯১৫) তারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। বর্ধমানের মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১৫৫] আবুল কাসেম তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই প্রশাসন অনুগত প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং বৃটিশের প্রতি আনুগত্য নীতির বিরোধিতা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি মফস্বল এলাকায় বিভিন্ন সভা-সমাবেশের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের বিভেদনীতির বিরুদ্ধে

---

১৪৮. চতুরঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭।
১৪৯. ঐ পৃ. ১৬৭।
১৫০. ঐ পৃ. ১৬৮।
১৫১. ঐ পৃ. ১৬৮।
১৫২. আব্দুল্লাহ, মুহম্মদ, বাঙলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০ চতুরঙ্গ শরৎ ১৪০০, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬৮।
১৫৩. চতুরঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।
১৫৪. চতুরঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৮।
১৫৫. মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

জনমতো গঠনের উদ্যোগ নেন। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাথে তিনি নিয়মিতোভাবে কংগেসের প্রতিটি অধিবেশনেই বাঙলার শিক্ষিত মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। একই সাথে তিনি জাতীয়বাদী মুসলিম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ১৯২২ সালে সাধারণ নির্বাচনে আবুল কাসেম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেই নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী বর্ধমানেরই বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল মোহাম্মদ ইয়াসিনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।[১৫৬] অবশ্য পরবর্তীকালে আবুল কাসেম প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় উভয় আইন সভায় সদস্য পদে নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু বহাল ছিলেন।[১৫৭]

এক পর্যায়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তখন আবুল কাসেমও তাঁর পথ অনুসরণ করেন।[১৫৮] অবশ্য ইত:পূর্বেই তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯২০ সালে আবুল কাসেম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৫৯] ১৯৩৬ সালে আবুল কাসেমের মৃত্যু হলে আবুল হাশিম উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতিতে আগমন করেন।

শিক্ষা:

আবুল হাশিমের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে। মাওলানা আব্দুস সামাদ ও আরবি-ফার্সি তে সুপণ্ডিত মাওলানা আবদুল হালিম ছিলেন তাঁর দুই মামা। তাঁদের নিকট তিনি নিজ গৃহে ধর্মীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। কুরআন পাঠ ও নামায শিক্ষার মধ্যদিয়ে তখন মুসলিম ছেলে-মেয়েদের তালিম শুরু হতো। ঐ রীতি অনুযায়ী আবুল হাশিম মাওলানা গিয়াসউদ্দীন নামক দেওবন্দ মাদ্‌রাসার একজন যোগ্য পণ্ডিতের কাছে কুরআন পাঠ ও নামাজ শিক্ষা লাভ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তখন থেকেই তিনি বাংলা, ইংরেজি, অংকেরও প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর কাছে লাভ করেছিলেন।[১৬০]

---

[১৫৬]. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p. 15.

[১৫৭]. Harun-or-Rashid, The Foreshadowing of Bangladesh, op, cit, p. 162

[১৫৮]. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p.19-20.

[১৫৯]. বদরুদ্দীন উমর, আমার জীবন, পূর্বোক্ত পৃ. ২৩।

[১৬০]. এস মুজিবুল্লাহ, আবুল হাশিম ও জীবন-দর্শন (প্রবন্ধ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-১৯৮২, পৃ ১৩০; ঐ সুপার প্রতিটি ছাত্রকে নিজ পুত্রের মত স্নেহ করতেন। স্কুলের পাঠ্য বিষয় ছাড়া নামাজ, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, কর্তব্যপরায়ণতার প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৩ সালে আবুল হাশিম ঐ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন।[১৬১] ঐ সালেই তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে টেলর ছাত্রাবাসে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত আবুল হাশিমের নিকট কলকাতার ছাত্রাবাস ভাল লাগল না।

তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং ১৯২৩ সালে বর্ধমানে ঐতিহ্যবাহী রাজ কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯২৫ সালে আই, এ একই কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন।[১৬২] অতপর উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ ও আইন ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানকার পরিবেশও তাঁর মনপুত না হওয়ায় তিনি বাঙলায় ফিরে আসেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আইন কলেজে ভর্তি হন।[১৬৩] প্রথম বছরের কোর্স শেষ করে তিনি সন্ধ্যা ক্লাসে নাম লিখিয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। ১৯৩১ সালে তিনি আইন পরীক্ষা পাস করেন।[১৬৪] ছাত্র জীবনেই ১৯২৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আবুল হাশিম ২২ বছর বয়সে শাহ সৈয়দ জিয়াউদ্দিনের কন্যা মাহমুদা আক্তার মেহের বানু বেগমকে বিবাহ করেন।[১৬৫]

বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নঃ

প্রথাগত শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত ছিলেন না আবুল হাশিম। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করেন; যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান অর্জন ও পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। মার্কসবাদসহ বিভিন্ন আধুনিক মতোবাদবিজ্ঞান, ইতিহাস দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। অবশ্যই মার্কসসীয় দর্শন তাঁর কাছে কোন সময়ই গ্রহণযোগ্য ছিল না।[১৬৬] তিনি প্রাণিবিদ্যা এবং জীববিদ্যা সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন।[১৬৭] বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এবং আরো অনেকের গল্প ও উপন্যাস তিনি পড়তেন। তিনি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও শেক্সপীয়ারের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভারতীয় দর্শন, বেদান্ত, যোগ

---

[১৬১]. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p.21.
[১৬২]. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p.21.
[১৬৩]. Ibid, P.23
[১৬৪]. Ibid, P.23
[১৬৫]. Ibid, P.23
[১৬৬]. মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০।
[১৬৭]. Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p.21.

Dhaka University Institutional Repository

সাধনা ইত্যাদি দর্শনের উপর তার যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল।[১৬৮] ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আবুল হাশিমের দৃষ্টিশক্তি দ্রুত কমতে থাকে।[১৬৯] এই সময়ও জ্ঞান আহরণ করা হতে তিনি বিরত থাকেন নি। বই ছিল তাঁর প্রিয় বস্তু। কেউ বই পড়ে শুনালে, তিনি মনোযোগ সহকারে শুনতেন।[১৭০] দ্যা ক্যাপিট্যাল, এ্যান্টিডুরিং ইত্যাদি বই ছিল তাঁর লেখা। তিনি নিজে এসব বই কিনতেন। কখনো ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রকাশনা সংস্থা National Book Agency' র (বোম্বাই) কেন্দ্র থেকে তাঁর কাছে মার্কস, এঙ্গেলস লেনিন, ষ্ট্যালিনের নানা বই ডাকযোগে আসত সৌজন্য কপি হিসেবে।[১৭১] নানা ধরনের বই থেকে যেমন তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন, তেমনি চারপাশের জগত থেকেও জ্ঞান আহরণ করেছেন। পুরো সত্তা দিয়ে জীবন আর জগতের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। আবুল হাশিমের পড়াশোনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী তাঁর এক নিবন্ধে বলেনঃ

"আবুল হাশিম ছিলেন জ্ঞানী পণ্ডিত। মার্কসবাদ থেকে শুরু করে ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁক সম্পর্কে যেমন তিনি জানতেন, তেমনি দর্শন ও ধর্ম-অর্থনীতি এসব বিষয়েও প্রভূত জ্ঞান রাখতেন।[১৭২]

কর্মজীবন

আইন চর্চা

আল্লামা আবুল হাশিমের পিতা কাশেম ছাড়া পূর্বপুরুষদের সকলেই ছিলেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। আবুল হাশিমও যে কোন সরকারি উচ্চপদ গ্রহণ করে নিরাপদে সুখী জীবন যাপন করতে পারতেন। আইনের ছাত্র হওয়ার সুবাদে বর্ধমান জেলা বারে আইনজীবি হিসেবে আবুল হাশিম কর্ম জীবন শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সৈয়দ গোলাম মূর্তজা নামে একজন দক্ষ আইনজীবির কাছে

---

[১৬৮]. মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯।

[১৬৯]. কর্ণেল কিরম্যান (Colonel Kirman) নামক চক্ষুশল্য ডাক্তার কাছ থেকে জানতে পারলেন, তাঁর চক্ষু Retinitis Pigmentosa নামক এর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। এ জন্য ডাক্তার তাঁকে লেখাপড়ার কাজে অন্যের সাহায্য নিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। (Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p.49. মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯।)

[১৭০]. বদরুদ্দীন ওমর তাঁর বাবাকে তারাশঙ্করের 'হাসুলী বাঁকের উপকথা' পড়ে শুনিয়েছিলেন। ইংরেজি কবি Robert Graves এর বিখ্যাত রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের জীবন অবলম্বনে দুই খন্ডের উপন্যাস। Claudius and claudius the god. (সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত পৃ. ৩৬৯)

[১৭১]. মনসুর আহমদ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত পৃ. ৩৭১)

[১৭২]. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২/৬/২০০৬ পৃ.৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানবিশ হলেন এবং ১৯৩১ সালে বর্ধমানের আইনজীবি সমিতিতে নিজ নাম তালিকাভুক্ত করলেন ওকালতি পেশা শুরু করেই।

তিনি একটি খুনের মামলায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি মামলা তিনি সফলভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

সামাজিক কার্যাবলি:

আবুল হাশিম সমাজের নানা কর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি Young Mens Muslim Association প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই ধীরে ধীরে স্ফীত হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। বর্ধমান জেলা প্রায়ই দামোদর এবং অজয় নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রিফিল বিতরণ করতেন।[১৭৩] আবুল হাশিম মুসলিম লীগে যোগদানের পর তাঁর উদ্যোগে নিজ গ্রাম কাশিয়ারায় (কাসিম নগর) কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মিলনে কৃষকদের করের বোঝা লাঘব করার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময় দামোদর ক্যানেল তৈরির কাজ শেষ হয়েছিল। ফলে সকল কৃষক সেই ক্যানেলের সেচের পানির দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন।

আবুল হাশিমের সামাজিক কর্মের আরো একটি দিক ছিল গ্রামের মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। তাঁর পরিবার বরাবরই ছিল রক্ষণশীল প্রকৃতির। তখন পর্দাপ্রথা লঙ্ঘন হবে এই কারণে নারীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা হতো না। স্কুলে না পাঠিয়ে যতটুকু সম্ভব ঘরের মধ্যে রেখেই তাঁদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো।[১৭৪] কিন্তু আবুল হাশিম ছিলেন উদার প্রকৃতির লোক। তিনি অনুভব করেছিলেন মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া জীবন ব্যবস্থায় জাগরণ আনতে হলে আধুনিক শিক্ষায় মহিলোদেরকেও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। তাই বর্ধমানে প্রথম খ্রীষ্টান মিশনারী ইংরেজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি শহরের মুসলমান মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার উদ্যোগ নেন। কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করে তিনি তাঁর স্ত্রী মেহের বানুকেও সে সময় স্কুলে ভর্তি করেছিলেন।[১৭৫]

আবুল হাশিমের সমাজ সেবার আরো একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের সময়কার দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করা। সে সময় বাঙলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিরাজমান ছিল। দেশে তখন চলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও কৃত্রিম খাদ্য সংকট জনিত পঞ্চাশের মন্বন্তর। সে সময় প্রায়

---

173 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

174 সেকালে অনেক হিন্দু মেয়েদেরও স্কুলে পাঠান হতনা। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিরাও তাঁদের বাড়ির মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠান নি। (বদরুদ্দীন উমর, আমার জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪।

175 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p.33.

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে।[১৭৬] তখন শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা দুর্ভিক্ষের আশংকার বিপরীতে কোনরূপ সাবধানতা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু ১৯৪৩ সালে বাঙলায় ফসলহানি ঘটে। ফলে গ্রাম বাংলায় শতকরা ৭৫ জন কৃষকের ঘরে চাল ছিল না। তখন কমিউনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজ সেবীদের নিয়ে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। এ সময় আবুল হাশিম দুর্গত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।[১৭৭] এমনকি আবুল হাশিম তখন লঙ্গরখানা খুলে খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আবুল হাশিমের সমাজসেবা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য করে বলেন, সাভার থানাধীন ফুলবাড়িয়ায় নদীর পাড়ে আবুল হাশিম একটি এক তলা বাড়ি তৈরি করেছিলেন এবং সেখানে তিনি কিছু কাল বসবাস করেছিলেন। ফুলবাড়িয়া বাজারে তখন বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না আবুল হাশিম বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বরাবর দরখাস্ত লিখে তাতে ঐ এলাকার লোকজনের কাছ থেকে এর সত্যতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এমনিভাবে তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানকার মানুষদের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত আবুল হাশিম সাহেব একজন সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন।[১৭৮]

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

রাজনৈতিক অঙ্গনে আবুল হাশিমের অবদান অপরিসীম। তিনি পূর্বপুরুষদের আধা-সমাজসেবা আধা-রাজনীতির চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে পুরোপুরিভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ছাত্র থাকাবস্থায় রাজনীতির প্রতি আবুল হাশিমের কোন ঝোঁক ছিল না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট নেতা অশোক মিত্র বলেন: "ছাত্রাবস্থায় তিনি মাহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে কিছু সময় ভেসে গিয়েছিলেন, তারপর নিজের মতো করে পড়াশুনা করেছেন।"[১৭৯] তবে আন্দোলন চলাকালে অন্যান্যদের মতো তিনি লেখা-পড়া থেকে বিরত থাকেন নি। তখন আবুল হাশিমের প্রিয় বিষয় ছিল লেখা-পড়া এবং আলোকচিত্রের চর্চা। ছাত্রজীবনের সময়টুকুতে আবুল হাশিমকে মনে হবে এক গৃহকাতর যুবক। তবে একথা ঠিক যে, এই সময়েও তিনি রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন

---

176 Khaliquzzaman, Chowdhury, Op,cit, Pp-296-97.

177 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪।

178 ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, তাং. ১২/৪/২০০৬।

179 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। কোন মানুষই পারিপার্শ্বিকতার উর্ধ্বে নয়: কম হোক, আর বেশিই হোক, প্রত্যেকটি মানুষ আপন পরিবেশে প্রভাবিত হয়। রাজনীতি আলোড়িত করেনা, এমন সচেতন মানুষের সংখ্যা খুব কম। বিশেষ করে ইতিহাসের মোড় ঘোরার বিষয় হলে তো কথাই নেই। অনেককেই তা নাড়া দেয় প্রবলভাবে। শুধু মানুষের মনোজগতের বিমূর্ত সত্তা নয়, বরং গোটা মানস সরোবরকেই নাড়া দেয় বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ।

আবুল হাশিমের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাপ-চাচাদের কাছ থেকে ত্রিশের দশকের সময়কার রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক জ্ঞান বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন। তখন ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মুখোমুখী অবস্থানে। তাঁর কৈশোর ও যৌবন কেটেছে বাঙলার টালমাটাল ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে। রাজনীতিক পিতা আবুর কাসিমের মৃত্যুর পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুত্র আবুল হাশিম রাজনীতিতে পদার্পণ করে শূন্যস্থান পূরণ করেন। সমাজসেবায় তৎপর হয়েও এবং পিতৃ পরিচয়ের বিপুল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিক পিতা আবুল কাসিমের মৃত্যুর পর রাজনীতিতে যোগদানে আবুল হাশিমের একটু বিলম্ব ঘটেছিল। ১৯৩৫ সালের দিকে তাঁর পিতা উচ্চ রক্তচাপ রোগে ভুগছিলেন। ঘন ঘন রক্ত ক্ষরণের ফলে ১৯৩৬ সালে তিনি মারা যান। পিতার লাশ তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৮০] উক্ত জানাযায় কয়েক হাজার লোক শরীক হন। দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দাবি উঠে যে, বর্ধমানের মুসলমানদের নেতৃত্ব দানের জন্য তারা আবুল হাশিমকে পিতার শূন্য আসনে নির্বাচিত দেখতে চান। জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে ৩১ বৎসর বয়সের যুবক আবুল হাশিম ওকালতি পেশা ছেড়ে ১৯৩৬ সালে পুরোপুরিভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন।[১৮১] এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

"I realized that if I took active interest both in politics and in law I would not be able to do justice to either of them. So I had to choose between the two. I chose politics." [182]

---

[180] Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p.28.

[181] Ibid, p.29. আইন পেশা তাঁর ভালই চলছিল। জীবনের স্বার্থকতা তিনি এর মধ্যেই খুঁজে পেতেন। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় তিনি আইন পেশা থেকে বিদায় নেন এবং রাজনীতিকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। তিনি মনে করলেন, রাজনীতি এবং ওকালতির দু'টি কাজই গুরুত্বপূর্ণ। এই দু'টি দায়িত্ব একসাথে পালন করতে গেলে কোনটিই ভালভাবে পালন করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি রাজনীতিকেই সার্বক্ষণিক পেশারূপে বেছে নিয়েছিলেন।

[182] Ibid, p.29

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে উপমহাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া মুসলিম এলাকা থেকে তখন আবুল হাশিম নির্দলীয় মুসলিম প্রার্থীরূপে কংগ্রেসের প্রভাবশালী প্রার্থী প্রবীণ আইনজীবী মুহাম্মদ ইয়াসীনকে পরাজিত করে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[১৮৩] উল্লেখ্য, আবুল হাশিমের পিতা ১৯২১ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুহাম্মদ ইয়াসিনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন।[১৮৪] কিন্তু পুত্র আবুল হাশিম তাঁকে পরাজিত করে বড় একটি চমক দেখান।

মুসলিম লীগে যোগদান

আবুল হাশিমের পরিবারে ছিল বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক মতোদর্শের সহঅবস্থান। তাঁর বাবা আবুল কাসেম ও চাচা আবুল হায়াত কংগ্রেসের রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দুই মামা সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ও সৈয়দ মনসুর হাবীবুল্লাহ ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টিতে। আবুল হাশিম তখন প্রগতিশীল রূপান্তরকামী সাংগঠনিক মনোভাব নিয়ে বাঙলার মুসলিম লীগে হাজির হয়েছিলেন। সে সময় এই পরিবারে লীগের রাজনীতির প্রভাব ছিল খুবই সীমিতো। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ও সৈয়দ মনসুর হাবীবুল্লাহর প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। সে সময় নতুন প্রজন্মের মুসলমানরা উপলব্ধি করেছিল কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের যে প্রভাব চলছে, সে অবস্থায় নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে বাঁচতে হলে মুসলিম লীগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। সম্ভবত আবুল হাশিমের মধ্যেও এ বোধ সৃষ্টি হয়েছিল। সে কারণেই ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর আবুল হাশিম কলকাতায় এম.এ ইস্পাহানীর বাসভবনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর (১৮৭৬-১৯৪৮) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মি. জিন্নাহ তাঁকে লীগে যোগদানের আহবান জানিয়ে বলেন, Youngman, come under my banner. আবুল হাশিম ঐ বৎসরই লীগে যোগদান করলেন এবং মি. জিন্নাহকে লক্ষ্য করে বললেন:

"Why me alone, Sir, every man and woman will come under your banner if you can provide sufficient cause for that. Youths want thrill, sensation and romance. Congress, by its anti-imperialist movement,

---

[183] Ibid., p. 28; Harun-or Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, Op, cit, P. 162.

[184] Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p.32.

Dhaka University Institutional Repository

proves sufficient thrill and romance; there is much romance behind prison-bars Mr Jinnah said, Come, let us organise ourselves in such a way that we can give 24 hours notice to the job-hunters of Bengal and the Pun‡jvab."[185]

লীগে যোগ দিয়ে আবুল হাশিম প্রথম কয়েক বছর নিজের এলাকায় জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বর্ধমান মোহামেডান এসোসিয়েশ'কে[১৮৬] 'বর্ধমান মুসলিম লীগ'-এ রূপান্তরিত করেন এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন।[১৮৭] তখন থেকে বর্ধমানে মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ সময় তিনি 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' এবং 'বঙ্গীয় লীগের' কাউন্সিলরও ছিলেন।[১৮৮] ১৯৩৮ সালে তিনি সর্বপ্রথম এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেন।[১৮৯] সেখানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ একটি প্রস্তাব উথাপন করলে মাওলানা হসরত মোহানী তাঁর প্রস্তাব ইসলামের পরিপন্থী বলে মতো দেন। কিন্তু আবুল হাশিম পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করে হসরত মোহানীর বক্তব্যই ইসলামের পরিপন্থী বলে জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্য সমর্থন করেন। সভা আবুল হাশিমের বক্তব্য সমর্থন করে। ঐ দিনের বক্তব্যে জিন্নাহ খুশি হয়ে আবুল হাশিমকে মৌলভী'[১৯০] উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৯১]

---

185 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p.28. অর্থঃ "স্যার, আমি কেন! প্রত্যেক নারী ও পুরুষই আপনার পতাকাতলে আসবে, যদি আপনি তাদের জন্যে উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দেশ করতে সক্ষম হন। যুবকরা চায় উন্মাদনা, আবেগ ও চাঞ্চল্য। কংগ্রেস তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে আলোড়ন ও প্রেরণা দিতে সক্ষম হয়েছে। কারার লৌহ কপাটের পিছনে তারা পেয়েছে অনেক প্রত্যাশা। জিন্নাহ বললেন, এসো আমরা নিজেদের এমনভাবে সংগঠিত করি, যেন বাঙলা ও পাঞ্জাবের কর্মকর্তা তথা চাকরির সুযোগ সন্ধানীদের উপর ২৪ ঘণ্টায় নোটিস জারি করতে পারি।"

১৮৬ ১৯০৬ সালে বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার আবদুর রসূল ও সেক্রেটারী ছিলেন মৌলভী আবুল কাসেম। পরে তিনিই বর্ধমান মহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। (মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পাঃ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪)

187 Harun-or-Rashid, The *Foreshadowing of Bangladesh*, Op.cit, P.162

188 Ibid, P. 162.

189 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p.33.

190 অত্র উপমহাদেশে মাদ্রাসা-শিক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম বিষয়ে বা 'আলিমদের বেশভূষায় সজ্জিত থাকতেন বলে বৃটিশ বাংলায় অনেকেই 'মৌলভী' বলে আখ্যায়িত ছিলেন, যেমনটা আজও হয়ে থাকে। এই পথা অনুসারেই হয়ত ফরিদপুরের তমীযুদ্দীন খান, বরিশালের এ, কে ফজলুল হক প্রমুখ 'মৌলভী' বলে পারচিত ছিলেন। আবুল হাশিমের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মাদ্রাসাপড়ুয়া ছিলেন না। কিন্তু ছোটকাল থেকেই তিনি ঘরোয়াভাবে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মুসলিম লীগে যোগদানের পর তিনি ইসলামের তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর বই রচনা ও বক্তব্য রেখে সকলের মন জয় করেন। তিনি প্রায়শ পায়জামা-পাঞ্জাবী ও টুপি পরতেন। এ পথ ধরে তিনি জনসাধারণের মধ্যে 'মৌলভী' বলে পরিচিতি লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে মাওলানাগণ সাধারণত দাড়ি রেখে থাকেন কিন্তু আবুল হাশিমের দাড়ি-গোঁফ কিছুই ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি আরবী ভাষা ও ইসলামি দর্শনে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের বার্ষিক

Dhaka University Institutional Repository

লাহোর অধিবেশনে অংশগ্রহণ

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে আবুল হাশিম যোগদান করেন।[১৯২] এই অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলে উল্লেখ করেন।[১৯৩] এখানে জিন্নাহর সভাপতিত্বে শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক "লাহোর প্রস্তাব" পেশ করেন।[১৯৪] প্রস্তাবে বলা হয়েছিল 'ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে' মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।[১৯৫] এই প্রস্তাব আবুল হাশিমকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। প্রস্তাবের মূল ভাষ্য ছিলঃ

"Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no constitutional Plan would be workable in this country or acceptable to the muslims unless it is designed on the following basic principles; viz, that geographically contiguous Units are demarcated into Regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitute "Independent Sates" in which Constitutent Units shall be autonomous and sovereign."[196]

অধিবেশনে তিনি মিঃ জিন্নাহ কর্তৃক 'মৌলভী' খেতাবে ভূষিত হন। মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে একমাত্র আবুল হাশিমই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে ভাবতেন। ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতেন, চিন্তা করতেন এবং লিখতেন। এজন্যও হয়তবা তাঁকে 'মৌলভী' বলে ডাকা হত। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আবুল হাশিমকে প্রদত্ত স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারের সার্টিফিকেটে 'মৌলভী' শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

191 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p.33.

192 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p.27.

193 আবুল হাশিমের মতে, ভারতে হিন্দু-মুসলমান যেহেতু পৃথক ধর্মীয় দর্শন ও সামাজিক রীতি-নীতির অধিকারী তাই তাদের সমস্যার সমাধান এক রাষ্ট্রের মধ্যে হতে পারে না। পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে তিনি মন্তব্য করেন। (নিতাই দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১)

194 চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং আরো কয়েকজন ইহা সমর্থন করেন। (এম, এ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ২৬৪।

195 বশীর আল হেলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২; অবশ্য তারও আগে ১৯৩০ সনে জনাব রহমত উল্লাহ, ড. 'আল্লামা ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে 'পাকিস্তান নামে' একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের দাবীর বীজ বপন করেছিলেন। যার ভিত্তিতে ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান সৃষ্টির চিন্তাধারা প্রসারিত হয়। (আজিজ আহমেদ, ইসলামিক মর্ডানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান, (১৮৫৭-১৯৬৪), লণ্ডন, ১৯৬৭, পৃ. ১৬১)

196 Abdur Rahim, Muhammad, *MuslimSociety and Politcs In Bengal* A.D 1757-1947, Dhaka, 1978, P. 227; Abul Hashim, *In Retrospect*. Op,cit, p. 35; অর্থ: সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল এটা মুসলিম লীগের বিবেচিত অভিমত যে নিম্নের মূলনীতি ব্যতিরেকে কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থা এদেশে কার্যকর করা সম্ভব নয়:

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪১ সালের মাদ্রাজ সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মূল লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৪২ সালে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় লীগের সম্মেলনে আবুল হাশিম যোগদান করেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির (ওয়ার্কিং কমিটির) সদস্য নির্বাচিত হন।[১৯৭] ফলে বাঙ্গীয় লীগের তৎপরতার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রমশ জমে উঠবার প্রাক্কালে আবুল হাশিম গোটা উপমহাদেশীয় রাজনীতির অংগনে প্রবেশ করেন। উল্লেখ্য সিরাজগঞ্জের এই সম্মেলনে মাওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেক্রেটারি ও হাসান ইস্পাহানী পুনরায় ট্রেজারার নির্বাচিত হন।[১৯৮]

মুসলিম লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত এবং লীগের ব্যাপক উন্নতি সাধন

১৯৪২ সালে আবুল হাশিমের সাথে ভারতের বিখ্যাত মাওলানা 'আল্লামা আযাদ সোবহানীর[১৯৯] পরিচয় হয়। পরবর্তীতে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আবুল হামিম তখন আযাদ সোবহানীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং তাঁকে পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করেন। এ সময় আবুল হাশিমের মধ্যে মনের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক সৃষ্টি হয়।[২০০] ১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসে আযাদ সোবহানী পুনরায়

অথবা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। যথা: ভৌগোলিকভাবে পার্শ্ববর্তী ইউনিটগুলিকে এক একটি অঞ্চল হিসেবে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যাতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা যেমন ভারতের উত্তম পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলগুলোকে সংঘবদ্ধ করে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত করা, যার শাসনতন্ত্র হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম। এই সমস্ত ইউনিট ও অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত কার্যকর এবং আইনানুগ নিরাপত্তার ব্যবস্থা সংবিধানে রাখতে হবে যাতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকারও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানেও তাদের পরামর্শ সাপেক্ষে তাদের জন্য সংবিধানে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

197 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p. 33; Harun-or-Rashid, Dr, *The Foreshadowing of Bangladesh*, Op.cit, P. 162.

198 স্টার অব ইন্ডিয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২, পৃ. ৮; দৈনিক আজাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২, পৃ. ৫।

199 ভারতের গোরখপুর জেলার অধিবাসী 'আল্লামা আযাদ সুবহানী (১৮৯৬/ ৯৭-১৯৬৩/৬৪) একজন বিখ্যাত 'আলিম, প্রথিতযশা দার্শনিক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, খিলাফত আন্দোলনস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। তাঁর পূর্ণ নাম আব্দুল কাদির আযাদ সুবহানী। তাঁর নিজ গ্রন্থে নাম লেখা হয়েছে এভাবে: ফকির গুনাহগার অপরাধী সুবহানী রব্বানী ওরফে আযাদ সুবহানী। (আযাদ সুবহানী, বিপ্লবী নবী, (অনুঃ) মওলানা নুজিবুর রহমান, ৩য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ১৩; মাওলানা আযাদ সুবহানী বিহারে কৃষক আন্দোলন করেছিলেন এবং বিশের দশকে কিছুদিন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে তাঁর সম্পর্ক ছিল। ১৯২৫ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি খুব পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। এসব দিক দিয়ে তাঁর একটা মিল ছিল রাহুল সাংকৃত্যায়নের সাথে। রাহুলের মত তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নেও গিয়েছিলেন। তবে রাহুল যেমন প্রথম দিকে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার মধ্যে থাকলেও পরের দিকে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে বিষয়ে অনেক লেখালেখি করেছিলেন। কিন্তু আযাদ সুবহানীর ক্ষেত্রে হয়েছিল তার উল্টো। পরের দিকে তিনি পুরোপুরিভাবে ইসলাম চর্চার এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। (সৈয়দ মনসুর আহমদ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০)

200 এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন, "আসলে ধর্মীয় চিন্তার একটা প্রবণতা থাকলেও ইহজাগতিক চিন্তাই তাঁর মধ্যে প্রাধান্যে ছিল। মওলানা আযাদ সুবহানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার ফলে এই প্রাধান্যের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

বর্ধমান এসে আবুল হাশিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি মুসলিম লীগকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলার এবং লীগের সেক্রেটারি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান জানান।[২০১] তাঁর এ প্রস্তাব শুনে আবুল হাশিম প্রথমে কিছুটা বিব্রত হন এবং ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার কথা তাঁকে জানান। ইসলামের মর্মকথা ব্যাখ্যার ব্যাপারেও তিনি তখন নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করেন নি।[২০২] আবুল হাশিমের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আযাদ সোবহানী বললেন, আমি বলছি আপনাকে মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হতে হবে। তিনি আরো বললেন, ইসলাম সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান আছে এবং এটুকু বলতে পারি যে, আমি একজন অপদার্থ ব্যক্তিকে সমর্থন করছিনা।[২০৩] আযাদ সোবহানীর চাপাচাপির এক পর্যায়ে লীগের সেক্রেটারি পদ লাভের এক মোক্ষম সুযোগও সৃষ্টি হলো। ১৯৪৩ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, যাঁরা মন্ত্রী বা পার্লামেন্টারী সদস্য থাকবে, তাঁরা সংগঠনের কোন পদে থাকতে পারবেন না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী[২০৪] তখন বঙ্গীয়

চিন্তা ও সেই সাথে ইসলামী সমাজ গঠনের চিন্তার প্রতি বেশী করে ঝুঁকে পড়েন। (সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭)

201 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p. 43

202 Ibid, p.43.

203 Ibid, p.43.

204 হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে। রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। পিতা স্যার জাহেদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। মাতার নাম খোজেস্তা বানু। কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে অনার্সসহ বিজ্ঞানে স্নাতক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ (১৯১৩), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ বি.এসসি., বি.সি.এল., রাষ্ট্রবিজ্ঞান অর্থনীতি ও ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৮ সালে গ্রেস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে প্রত্যাবর্তন। অতপর কলকাতা হাইকোর্টে ইঁইন ব্যবসায় যোগদান করেন। স্যার আবদুর রহিমের কন্যা নিয়াজ ফাতেমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯২০ সালে। বিবাহের তিন বছর পর স্ত্রীর মৃত্যু হলে ১৯৪০ সালে এক রুশ মহিলাকে বিয়ে করেন। ১৯৪৬ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। খিলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ১৯২০ সালে। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে খাজা নাজিমুদ্দীনকে সভাপতি করে 'কলকাতায় ইনডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টি গঠিত হলে তিনি এর জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা দক্ষিণ ও চব্বিশ পরগণা-এই দু'টি আসন থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছর এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ কৃষক প্রজা পার্টির বঙ্গীয় কোয়লিশন সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত লীগ মন্ত্রীসভার খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন (১৯৪৩-১৯৪৬)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপড়তা পরিচালনা। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৬ অবিভক্ত বাংলার লীগ মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। তিনি ছিলেন যুক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭)। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তা দমনের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ -এর প্রথম দিকে কংগ্রেসের নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে স্বাধীন বঙ্গের দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির (১৯৪৭) পর সেখানে না এসে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনে শরিক হন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নাজিমুদ্দিন সরকার কর্তৃক সোহরাওয়ার্দীর পূর্ববঙ্গে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার জন্যএ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান এবং আবুল হাশিমের সহযোগে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯৫৪ সালে মোহাম্মদ আলীর (বগুড়া) নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে তিনি গ্রেফতার হন। একই মুক্তি লাভ করেন। অতিরিক্ত খাটুনির জন্য হৃদরোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বৈরুত গমন (১৯৬৩)। অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য প্রথমে লন্ডন, পরে আবার বৈরুতে আগমন করেন। সেখানকার হোটেল ইন্টারন্যাশানালে প্রাণত্যাগ করেন। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বিধায়

Dhaka University Institutional Repository

লীগের সেক্রেটারী ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী মি. সোহরাওয়ার্দী সেক্রেটারির পদটি ছেড়ে দিয়ে মন্ত্রী হিসেবেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।[২০৫] এই সুযোগ আবুল হাশিম ১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাৎ করে সেক্রেটারি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। প্রথমে সোহরাওয়ার্দী আপত্তি করে বললেন ঃ

"How can it be? You have a Very much defective vision. I said, Do you think that politics is duck shooting and for that a powerful vision is necessary?"[206]

অবশেষে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের প্রার্থীতা সমর্থন করলেন।[২০৭] মুসলিম লীগের সেক্রেটারি নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ৬-৭ নভেম্বর।[২০৮] নির্বাচনের পূর্বে অনেকেই তাঁর প্রার্থিতা সমর্থন করেন।[২০৯] কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন, মাওলানা আকরম খাঁ, হামিদুল হক চৌধুরী-এরা সকলেই ছিলেন আবুল হাশিম বিরোধী। আবুল হাশিম লীগের সেক্রেটারির জন্য প্রার্থী হচ্ছেন কলকাতায় একথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা এর বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁরা তাঁদের অনুগত প্রার্থী যাতে সেক্রেটারি হতে পারে, সে চেষ্টা করতে থাকেন।[২১০] খাজা নাজিমুদ্দিন বঙ্গীয় লীগের সভাপতি পদের জন্য আবুল হাশিমের মামা টালিগঞ্জের খান বাহাদুর আবদুল মোমিনের নাম প্রস্তাব করেন। এতে তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলিম লীগ কাউন্সিল 'মামা-ভাগিনাকে' একসাথে সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত করতে রাজি হবে না। এটা ছিল খাজা শাহাবুদ্দিনের গোপনীয় রাজনৈতিক দাবার একটি কূট চাল। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের সে চালাকি ধরা পড়ে গেল। আবদুল মোমিন যখন জানতে পারলেন যে, তারই ভাগিনা আবুল হাশিম সেক্রেটারি পদে

দেশের সুধী সমাজ কর্তৃক 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে আখ্যায়িত করেন। (সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম) (সম্পাঃ) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৪-৪৪৬)

205 Harun-or-Rashid, Dr., Muslim Struggle For Freedom in Bengal. Op.cit, P.161.

206 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p. 45) অর্থঃ "তা কিভাবে সম্ভব? আপনার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ।" আবুল হাশিম বুদ্ধিমত্তার সাথে জওয়াব দিলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, রাজনীতি পাঁতিহাঁস শিকার করার মত, যার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন হবে?

207 Harun-or-Rashid, Dr., *Muslim Struggle For Freedom in Bengal*. Op.cit, P. 161.

208 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p. 46; Harun-or-Rashid, Dr., *Muslim Struggle For Freedom in Bengal*, Op.cit, P. 161.

209 তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাজী ফজলুল করিম, ডা. এ. এম. মল্লিক, নূরুল আমিন, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, হাবিবুল্লাহ বাহার এবং এম.এম. আলী, ফজলুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও আবদুল্লাহ আল মাহমুদসহ অনেকেই আবুল হাশিমের প্রার্থতা। (Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p. 47)

210 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, p. 45; সে সময় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারি লিয়াকত আলী খান কলকাতা সফরে আসেন। খাজা নাজিমুদ্দীন সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য নির্বাচন না করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কাউকে মনোনীত করার জন্য লিয়াকত আলী খানকে রাজি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তখন তিনি নাজিমুদ্দিনের প্রস্তাবে সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সম্মত হলেন না। খাজা নাজিমুদ্দিন গত্যন্তর না দেখে প্রথমতো হামিদুল হক চৌধুরীকে আবুল হাশিমের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর তেমন জনপ্রিয়তা না থাকায় সাতক্ষীরার আবুল কাসেমকে আবুল হাশিমের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো হয়।[২১১] ৭ই নভেম্বর মুসলিম লীগ কাউন্সিল নির্বাচনী সভায় মাওলানা আকরম খাঁ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। আবুল হাশিম বিপুল ভোটে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সর্বশেষ সেক্রেটারি পদে জয়লাভ করেন।[২১২] এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

"The election of the General Secretary was contested by me and Mr. Abul Qasim, the nominee of the Khwajas. All praise is due to Allah. Mr. Abul Qasim got only eleven votes and I was elected by an overwhelming majority."[213]

নির্বাচিত হওয়ার পর সকলেই আবুল হাশিমকে একনজর দেখতে চাইলেন। তিনি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্সিল সদস্যদের ধন্যবাদ জানালেন। মওলানা আকরম খার মালিকানাধীন 'মোহাম্মদী পত্রিকায় লেখা হয়' "এবারের লীগের কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে বিশেষত্ব রহিয়াছে। শুধু এ কারণেই বাংলার লীগের গঠনতন্ত্রের ইতিহাসে এ নির্বাচন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"[২১৪] পত্রিকাটিতে লীগের কর্মকর্তা নির্বাচনকে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের প্রসার ও উন্নতির পথে অগ্রযাত্রা বলে অভিহিতো করা হয়।[২১৫] দৈনিক আজাদের ৯ই নভেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ায় আবুল হাশিমের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং তাঁর দ্বারা বাংলার লীগ নবজীবন লাভ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।[২১৬]

---

211 Harun-or-Rashid, Dr., Muslim Struggle For Freedom in Bengal. Op.cit, P.162.

212 *দৈনিক আজাদ, কলকাতা*, ৭ই নভেম্বর ১৯৪৩, পৃ. ২।

213 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, Pp. 47-48; অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলাম আমি ও খাজাদের মনোনীত আবুল কাশেম। সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আবুল কাশেম পেলেন মাত্র এগার ভোট এবং আমি বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে নির্বাচিত হলাম।"; আবুল হাশিমের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা দেখে মনে হয়, হয়তবা খাজা পরিবারও শেষ পর্যন্ত আবুল হাশিমের বিরোধিতা হতে বিরত ছিলেন। এ সম্পর্কে হামিদুল হক চৌধুরী লিখেছেন, উভয় গ্রুপের সম্মতিক্রমেই আবুল হাশিম সাধারণ সম্পাদকের পদ লাভ করেন। (মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭; হামিদুল হক চৌধুরী, মেমোরিজ, ঢাক, ১৯৯০, পৃ. ৬৬)

214 *মাসিক মোহাম্মদী*, কলকাতা, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯।

215 ঐ, পৃ. ৮৯।

216 *দৈনিক আজাদ, কলকাতা*, ৭ই নভেম্বর ১৯৪৩, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে আবুল হাশিমের যোগদানের পর অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়া ছিল তাঁর জন্য বিরাট সাফল্য। কঠিন নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক অংগনে প্রবেশের সুযোগ লাভ করলেন। আবুল হাশিমের মুসলিম লীগে যোগদানের সময় লীগ ছিল রক্ষণশীল ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি। আবুল হাশিমের লীগে যোগদান করায় দলে ব্যাপক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়।[২১৭] বস্তুত মুসলিম লীগ প্রকৃত গণতান্ত্রিক, উদার, সর্বোপরি আদর্শ ভিত্তিক একটি সংগঠনে পরিণত হবে-এই আশায় তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন। এবার লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়ে তিনি লীগকে একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, উন্নত ও সুস্থধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন।[২১৮] সেক্রেটারি নির্বাচিত পরের দিনই আবুল হাশিম এক ভাষণে বলেন, "মুসলিম লীগ তিন স্থানে বন্ধক হয়ে আছে। স্যার সলিমুল্লাহর সময় থেকে নেতৃত্ব বন্ধক আছে আহসান মঞ্জিলে, প্রচার বন্ধক রয়েছে দৈনিক আজাদের মালিকের কাছে, আর আর্থিক দিকে বন্ধক রয়েছে ইস্পাহানীর নিকট। তিনি আরো বলেন, ঐ বন্ধনসমূহ থেকে লীগকে মুক্ত করতে এবং বাংলার মুসলমানকে তাঁর যোগ্য স্থানে বসাতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।"[২১৯]

সেক্রেটারিরূপে (প্রথম বছর, ১৯৪৩-৪৪)

পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা ছিল আবুল হাশিমের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি বাঙলার আপামর জনসাধারণকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত করার জন্য লীগের সেক্রেটারিরূপে এর চারিত্রিক পরিবর্তনে হাত দেন। এজন্য তিনি জনগণের জন্য তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি পরিবার-পরিজন বর্ধমান রেখে কলকাতায় ৬৪নং লোয়ার সার্কুলার রোডের নীচ তলায় একটি রুম ভাড়া নিলেন। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল।[২২০] তথাপি তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে লীগের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯৪৩ সালের ১৮ লভেম্বর বর্ধমানের মুসলিম সম্প্রদায় সেখানকার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁকে সংবর্ধনা ও মানপত্র প্রদান করা হয়। এখানে বলে রাখা ভাল যে, আজাদ সুবহানী সাহেব আবুল হাশিমের মুসলিম লীগের কোন

---

217 Harun-or-Rashid, Dr., Muslim Struggle For Freedom in Bengal. Op.cit, P.162.

218 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit, Pp. 48

219 কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ* (২য় খন্ড), ঢাকা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩।

220 এ সময় তিনি কিছু কিছু দেখতে, লিখতে ও পড়তে পারতেন। মোটা কাচের চশমা ব্যবহার করতেন। রাতে একাকী নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারতেন না। এজন্য তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হত। বর্ধমান জেলার শেকরতোড় গ্রামের আই, এ পাশ করা আবদুস সামাদ নামক আবুল হাশিমের সমবয়সী এক বন্ধু ও আত্মীয় স্বেচ্ছায় তাঁকে চলাফেরা ও অন্যান্য কাজ-কর্মে সাহায্য করার জন্য তাঁর বাসায়ই থাকতেন এবং সর্বক্ষণ তাঁর অবৈতনিক একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক আদর্শ ছিল না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দী সাহেব এঁদের কারোর কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতোাদর্শ ছিল না। এঁরা সংগঠন করেছেন জনসমর্থন আর ধন-বলের উপর নির্ভর করে। আবুল হাশিম ইসলামের আলোকে লীগকে পরিচালনা করার জন্য নতুন করে উদ্যোগ নেন।[২২১] টাউন হলের সংবর্ধনা সভায় আবুল হাশিম বলেনঃ

"The Muslim League was an organisation of the Muslims but it stood for the safeguarding of the rights and privileges of all irrespective of caste, creed and political opinion".[222]

মুসলমানদের তাকিদ জানিয়ে আবুল হাশিম সেখানে বলেছিলেন, আপনারা শহর-নগর, গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ুন এবং আপনাদের ভাই-বোনদের ভালভাবে সংগঠিত করে তাদের অন্তরে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা দান করুন। মানবতার কল্যাণে ও সত্যের পথে নিজেদের নিয়োজিত করে সকল নারী-পুরুষের অন্তর জয় করুন এবং আপনাদের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করুন।[২২৩] এই ভাষণে বোঝা গেল, রাজনীতির গোড়াতেই তাঁর অন্তরে ইসলামের জড় গজিয়ে ছিল।

আবুল হাশিম অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে সেক্রেটারিরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন তা স্থায়ী হয়নি। কারণ আবুল হাশিমের সেক্রেটারি হওয়ার পর পরই এক বক্তব্যে ঢাকার নওয়াব গোষ্ঠী, ইস্পাহানী পরিবার এবং মাওলানা আকরম খাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[২২৪] ফলে আকরম খাঁ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। তাদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ সংহতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ সময় লীগ মূলত 'প্রতিক্রিয়াশীল'[২২৫] এবং 'প্রগতিশীল'[২২৬]

---

221 রফিক কায়সার, *তিন পুরুষের রাজনীতি*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭, পৃ. ১২১।

222 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.51; অর্থঃ মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ধর্ম বর্ণ ও রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে সকলের সুযোগ সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণে মুসলিম লীগ বদ্ধপরিকর।

223 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.51.

224 কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

225 এই ভাগে ছিল শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকার খাজা নাজিমুদ্দীন, মাওলানা আকরম খাঁসহ তাদের অনুসারীরা।

226 এই ভাগে নূরুদ্দীন, আনোয়ার হোসেন এরা সবাই ছিলেন আবুল হাশিম ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন গ্রুপটির সমর্থক। সোহরাওয়ার্দী পলিটিক্যাল লিডার ছিলেন। কিন্তু তরুণদের ইডিওলজিক্যাল গাইড ছিলেন আবুল হাশিম। এখানে বলে রাখা ভাল যে, আবুল হাশিম বৈবাহিক সূত্রে সোহরাওয়ার্দীর আত্মীয় হলেও রাজনীতিতে তা তেমন একটা কাজে আসেনি। আবুল হাশিমের মতে, সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সোদল্যমান ও সুবিধাবাদী রাজনীতিক। এজন্য সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আবুল হাশিম বেশি নিন্দামুখর ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীও আবুল হাশিমকে কোনদিন বিশ্বাস করেননি। নাজিমুদ্দিন ছিলেন আক্ষরিক অর্থে বয়প্রাপ্ত পুরুষ। ঢাকার নওয়াব পরিবারে তাঁর জন্ম। আলীগড় ও বিলাতে পড়াশুনা করেছেন। ইংরেজদের হাত ধরে রাজনীতিতে

Dhaka University Institutional Repository

এই দু'টি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেদিন লীগের 'প্রগতিশীল' গ্রুপটি তথা যুবক ও তরুণ নেতা-কর্মীদের সিংহভাগই আবুল হাশিমের পেছনে কাতারবন্দী হয়েছিল।

আবুল হাশিমের কর্মতৎপরতা লীগের খাজা গ্রুপের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও প্রথম দিকে তাঁরা খুব একটু গুরুত্ব দিত না। তখন অনেকেই মনে করতো যে, রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং নতুন বলেই হয়ত আবুল হাশিম এতেঠবেশী তৎপর। কিন্তু ক্রমান্বয়ে পার্টিতে যখন তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে তখনই খাজাদের টনক নড়ে। এ সময় দলের প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর কার্যকলাপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তারা আবুল হাশিমের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন। ফলে ঢাকার নওবাব বাড়ির রাজনীতির সাথে তাঁর যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তা সব সময়ই লেগেছিল।[২২৭] তথাপি প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে তিনি একটি উন্নত ও সুস্থ ধারায় প্রবর্তনের আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহতো রাখেন। এজন্য তিনি লীগের কর্মীদেরকে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি ভাবধারায় গড়ে তুলে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী নেতৃত্ব সৃষ্টি করার জন্য দুই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমতো: মুসলিম লীগকে ইস্পাহানী ও ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা। দ্বিতীয়ত: বাঙলার প্রতিটি জেলা, থানা ও গ্রাম পর্যায়ে লীগের অফিস স্থাপন করে সাংগঠনিক কাজকে শক্তিশালী করা।

সে সময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস ছিল ৩নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনে। আবুল হাশিম নতুনভাবে লীগ অফিসের পুনর্বিন্যাস ও সুসজ্জিত করার কাজে হাত দিলেন।[২২৮] তখন বাঙলার কোন জিলাতে লীগের অফিস ছিল না। সে সময় 'ঢাকা মুসলিম লীগের' সভাপতি ছিলেন খাজা শাহাবুদ্দিন[২২৯] এবং তাঁর মামাতো ভাই সৈয়দ আবদুস সেলিম ছিলেন সম্পাদক। ঢাকা জেলা মুসলিম

এসেছেন। বাঙলার রাজনীতিতে তিনি হচ্ছেন ভূমিভিত্তিক অভিজাতদের প্রতিনিধি। বস্তুত এই গ্রুপটির হাতেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল অনেক বেশি। তারা যেমন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তেমনি সাম্প্রদায়িক।

227 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.66; বস্তুত আবুল হাশিম খাঁটি গণতান্ত্রিক পথে এবং তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বাঙলাকে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন। এবং এটা করতে গিয়েই তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাত ঘটে। আবুল হাশিম ছিলেন আদর্শবাদী। আদর্শ বাস্তবায়ন ব্যতীত তাঁর কোন রাজনৈতিক উচ্চাবিলাস ছিল না। অন্যপক্ষের কাছে আদর্শের প্রশ্নটা ছিল অত্যন্ত গৌণ এবং একটা রাজনৈতিক শ্লোগান মাত্র। খাজা গ্রুপ ইসলামকে সামনে রাখলেও ইসলামের সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধের আদর্শকে তারা ভয়ের চোখে দেখত। মুসলিম লীগের সবচেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীও খাজাদের প্রতি দুর্বল ছিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন আবুল হাশিম। তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী, প্রতিবাদী নেতা। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য তিনি কারোর তোয়াজ করেন নি। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, প্রগতিবাদী ও মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী। তাঁর ধর্মীয় চিন্তায়ও কোন গোড়ামি ছিল না, ছিল না সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার।

228 Ibid, p.48; ইতোপূর্বে এই অফিস ঘরটি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বাসভবন ছিল। তখন বাড়িটি নামে মাত্র অফিস ছিল।

229 খাজা শাহাবুদ্দিন (১৮৯৯-১৯৭৭) ঢাকার আহসান মঞ্জিলে জন্ম লাভ করেন। তিনি হলেন খাজা নাজিমুদ্দিনের কনিষ্ঠভ্রাতা। স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করলেও পরে নিজের অধ্যবসায়ে ইতিহাস, দর্শন রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, বঙ্গীয় গভর্ণরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের চিফ হুইপ ও খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের চিফ হুইপ, ১৯৪৮ এ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ও ১৯৫১ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৫৪-১৯৬৪ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সউদি আরব ও নাইজেরিয়ায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository

লীগ প্রকৃত অর্থে ঢাকা নওয়াব পরিবারের প্রধান নিবাসস্থল আহসান মনজিলের চার দেয়ালের গণ্ডিতে ছিল আবদ্ধ এবং খাজাদের পকেটভুক্ত সংগঠন। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যদের মধ্যে ন'জন[২৩০] ব্যক্তিই ছিলেন ঢাকা নওয়াব পরিবারের সদস্য।[২৩১] আবুল হাশিম তা ভাংতে চেষ্টা করেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ব্যাপক হারে লীগের সদস্য সংগ্রহ করে লীগকে বাঙলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য পাঁচ লক্ষ রসিদ ছাপিয়ে বাঙলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিলেন।[২৩২] ইতঃপূর্বে মির্জা হাসান ইস্পাহানী ছিলেন লীগের কোষাধ্যক্ষ, কিন্তু কোষাগার টাকা-পয়সা তেমন কিছুই ছিল না। ঢাকার খাজারা ব্যক্তিগতভাবে চাঁদা দিতেন এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তা ব্যয় করতেন। লীগের সদস্যদের জন্য নিয়মিতো কোন চাঁদার ব্যবস্থা ছিল না। লীগকে স্বাবলম্বী করার জন্য আবুল হাশিম প্রতিটি মহকুমা, জেলা, থানা ইউনিয়নের সদস্য, সমর্থক ও সুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের উদ্যোগ নেন। লীগের নামে ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়।[২৩৩] প্রত্যেক মুসলিম পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্যের উপর পাঁচ টাকা করে চাঁদা ধার্য করা হয়। নিয়ম করা হয় যে, যারা নিয়মিতো চাঁদা পরিশোধ করবে, তাঁরাই পদাধিকার বলে লীগের সদস্য থাকবেন। এবং তা-ই কার্যকর করা হয়।[২৩৪]

বাংলায় ব্যাপক সফর

এ সময় লীগকে সংগঠিত করার জন্য আবুল হাশিম ঢাকাসহ বাঙলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। সে সময় তাঁর প্রেরণা পেয়ে ঢাকায় ১৫০ নং চক মোগলটুলিতে অফিস ও লাইব্রেরী স্থাপন

সালে আউয়ুব খাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার দফতরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানের পরিপন্থী আখ্যায়িত করে রেডিও ও টেলিভিশন থেকে এর প্রচার নিষিদ্ধ করে বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এই বিবৃতির বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলে তা বন্ধ করা আর সম্ভব হয়নি। গণ আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালে আইয়ুব সরকারের পতন হলে খাজা শাহাবুদ্দিনও মন্ত্রিত্ব হারান। (সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাঃ) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮)

230 এরা হলেন নওয়াব হাবিবুল্লাহও তদীয় ভ্রাতা নাসরুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী ফয়হান বানু, খাজা নুরুদ্দিন, সৈয়দ আক্তুল হাফিজ, সৈয়দ আবদুস সেলিম এবং সৈয়দ সাহেবে আলম। (আবুল হাশিম, আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯)

231 আবুল হাশিম, আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

232 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.53.

233 Annual Report of Bengal Provincial Muslim League, 1944, p.8.

234 এ নিয়ম মোতাবেক পার্লামেন্টারি পার্টির মেম্বারদের চাঁদা পরিশোধের রসিদ প্রদর্শন করে সভাকক্ষে ঢুকতে হত। চাঁদা আদায়ে কড়াকড়ি আরোপ করতে গিয়ে একবার এক মজার ঘটনা ঘটে। লীগের কাউন্সিল সভা শুরু হওয়ার পূর্বে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁর সম্পূর্ণ বকেয়া চাঁদা আবুল হাশিমের নিকট পরিশোধ করেন। সেই চাঁদার টাকা কালেক্টর শামসুল হকের কাছে জমা দিতে আবুল হাশিম ভুলে গিয়েছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিন সভায় উপস্থিত হলে তার নিকট প্রবেশ পত্র না থাকায় তাঁকে গেটে বাধা প্রদান করে আবুল হাশিম যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে গেটে আটকিয়ে রাখা হয়েছে, তখন তাড়াতাড়ি তিনি শামসুল হকের নিকট চাঁদার টাকা জমা দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনকে ছাড়িয়ে আনেন। (Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.62)

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। এটি ছিল সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম সমর্থক ছাত্র-তরুণদের মিলন স্থল। রাজনীতির ইতিহাসে এই শাখা অফিসের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।[২৩৫] এখানে শামসুল হক, শামসুদ্দিন আহমদ, তাজুদ্দিন আহম্মদ, মোঃ শওকত আলী, মোহম্মদ তোয়াহা, খন্দকার মোশতাক আহম্মদ, এ.কে.আর. আহমদ, নইমুদ্দিন আহম্মদ, ডাক্তার এম এ করিম, নজমুল করিম, মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ কর্মীদেরকে ভালভাবে সংগঠিত করেছিলেন। এখানে রাজনীতি ও ইসলামি পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করা বিশেষ করে হযরত মোহাম্মদ (স) এর জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয় বিদেশীদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা হতো।[২৩৬]

ঢাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম শেষ করে আবুল হাশিম চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর সফর করেন। ফরিদপুরে আবুল হাশিম মুসলিম তরুণদের মনে পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে আশার সঞ্চার করেন। সেখানে তিনি কয়েক দিনের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। আবুল হাশিম ইসলামের প্রায়োগিক মূল্যবোধের উপর সাতটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।[২৩৭] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল গফুর[২৩৮] বলেন:

---

235 হারুন-অর-রশিদ, ড., বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, পৃ. ১৭২।

236 মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২; কামরুদ্দিন আহমদ, বাংলার মধ্য বিত্তের আত্মপ্রকাশ ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫; আবুল হাশিমের নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার আলোচনার উপর ভিত্তি করে কামরুদ্দীন আহমদের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় 'Islam the only Solution' তারপর শামসুল হকের লেখা 'পাকিস্তান কি, কেন ও কোন পথে' বইটি প্রকাশিত হয়। (কামরুদ্দীন আহমদ, বাংলার মধ্য বিত্তের আত্মপ্রকাশ ২য় খন্ড, পৃ. ৭৫; Harun-or-Rashid, Dr., *The Foreshadowing of Bangladesh*,Op,cit, p. 72.

237 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.72.

238 আবদুল গফুরের (১৯২৯-) জন্ম বৃহত্তর ফরিদপুর (বর্তমান রাজবাড়ী) জেলার খানগঞ্জ ইউনিয়নের দাদপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। তাঁর পিতার নাম-মরহুম হাজী হাকিল উদ্দিন মুন্সী এবং মাতার নাম মরহুমা ওকরুন্নেছা খাতুন। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রামের মক্তবে। ফরিদপুর ময়েজ উদ্দিন হাই মাদ্রাসা থেকে ১৯৪৫ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানের সরকারি নজরুল কলেজ) থেকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ছাত্র জীবনের তিনি পাকিস্তান ও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ফাইনাল অনার্স পরীক্ষার মাত্র দু মাস আগে 'ভাষা আন্দোলন' ও 'তমদ্দুন মজলিসের' কাজে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করায় ছাত্র জীবনের দীর্ঘ বিরতি পরে। ফলে ১১ বছর পর ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। আবদুল গফুর একজন সাবেক কলেজ শিক্ষক। বর্তমানে তিনি সাংবাদিকতা, প্রবন্ধ রচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। ১৯৪৮-১৯৫৬ পর্যন্ত 'সাপ্তাহিক সৈনিক' এর সহ সম্পাদক ও সম্পাদক এবং এরপর 'দৈনিক মিলাত (১৯৫৭) ও দৈনিক নাজাত (১৯৫৮) এর সহকারী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আবুল হাশিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক একাডেমীর সুপারিন্টেডেন্ট (১৯৫৯-৬০) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এম. এ পাশের পর ১৯৬৩ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে চট্টগ্রাম জেলা যুব কল্যাণ অফিসার হিসাবে এক বছর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ (১৯৬৩-৭০) এবং ঢাকা আবুজর গিফারী কলেজে (১৯৭২-৭৯) সমাজকল্যান বিষয়ের অধাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত 'দৈনিক আজাদ' এর বার্তা সম্পাদক, ১৯৭২-৭৫ 'দি ডেইলী পিপল' এর সহকারী সম্পাদক, ১৯৭৯-৮০ 'দৈনিক দেশ' এর সহকারী সম্পাদক এবং ১৯৮০-১৯৮৯ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রকাশনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক ইনকিলাব এর সূচনা (১৯৮৬) থেকে এখন পর্যন্ত এর ফিচার সম্পাদক পদে কর্মরত রয়েছেন। আবদুল গফুর হলেন আবুল হাশিমের বিশেষ ভক্ত। তিনি আবুল হাশিমের আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এর প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন বইতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর লেখা পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ইসলাম, বিপ্লবী ওমর, পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন, কর্মবীর সোলায়মান, Social welfare, Social services, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, কোরআনী সমাজের রূপরেখা, খোদার রাজ্য (শিশুতোষ গ্রন্থ), ইসলাম কি এ যুগে অচল (অনুবাদ), ইসলামের জীবন দৃষ্টি, রমজানের সাধনা, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য, আসমান জমিনের মালিক (শিশুতোষ গ্রন্থ), শাশ্বত নবী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমার

Dhaka University Institutional Repository

"দিনশেষে মাগরেবের পর বসত কোরআন ক্লাস। ক্লাস নিতেন বিখ্যাত মনীষী-রাজনীতিবিদ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম। জনাব আবুল হাশিমের একজন সহকারী তাঁর নির্দেশ মোতাবেক প্রথমে কোরআন শরীফের কোন আয়াত তেলাওয়াত করতেন। তারপর জনাব হাশিম ঐ আয়াতের তরজমা ও ব্যাখ্যা করতেন। এই কোরআন ক্লাসে ইসলামের মানবিক দিকগুলো ইসলামের প্রথম যুগের খোলাফায়ে রাশেদার দৃষ্টান্তের আলোকে ব্যাখ্যা করে আধুনিক যুগে ইসলামের অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। জনাব হাশিম বুঝিয়ে দিতেন কেন ইসলামের এই বৈপ্লবিক আদর্শ বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমির প্রয়োজন।"[২৩৯]

আবদুল গফুর আরো বলেন: 'আমি তখন নয়েজউদ্দিন মাদ্‌রাসার ক্লাস টেনের ছাত্র। আমরা তখন পাকিস্তান আন্দোলনের ছাত্রকর্মী। মুসলিম লীগের উদ্যোগে ন্যাশনাল গার্ডের একটি ট্রেনিং ক্যাম্প হচ্ছিল। আমি ছিলাম অন্যতম ট্রেইনী। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তরুণরা এসেছিলেন। এই ক্যাম্পে আমাদেরকে দৈহিক ও মানসিকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের সাচ্ছা সৈনিকরূপে গড়ে তোলার জন্য নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শেষ রাতের অন্ধকার থাকতেই ঘুম থেকে উঠতে হতো। ফজরের নামায শেষ করে সারা ফরিদপুর শহরের রাস্তায় চলত পিটি। তারপর চা-নাস্তা ও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরই অনেকক্ষণ ধরে চলত প্যারেড। দিনের বেলা রাজনৈতিক ক্লাস। বিকেলে গানের আসর। ঠিক মাগরিবের পর কুরআন ক্লাস নিতেন 'আল্লামা আবুল হাশিম।"[২৪০]

এরপর আবুল হাশিম বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং নোয়াখালী অঞ্চল সফর করেন। ১৯৪০ সালের ২৩শে জুলাই ইসলামিয়া কলেজে লীগের সম্মেলনে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বক্তব্য রাখেন।[২৪১] আবুল হাশিমের ব্যাপক সফরের ফলে ঢাকার মুসলিম লীগ ভালভাবে সংগঠিত হয়েছিল বটে কিন্তু ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্মেলনকে সামনে রেখে নওয়াব

কালের কথা, উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ কল্যাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইংরেজি ও বাংলায় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইসলাম ও সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর আরও প্রায় এক ডজন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময় সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেন। (আবদুল গফুর, আমার কালের কথা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২০০০, পৃ.দ্র. কভার পৃষ্ঠ।

239 আবদুল গফুর, আমার কালের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩-৪।

240 আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার ১৪/৬/২০০৬।

241 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.77; এখানে আবুল হাশিম বলেন, ছাত্র হিসাবে আপনারা ছাত্রদের সুযোগ সুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আর মুসলিম যুবক হিসেবে আপনারা মুসলিম লীগের শুধু বন্ধুই নন, আপনারা এর অংশ বিশেষও বটে। এখানে তিনি মার্কসবাদী দর্শনে প্রভাবিত তরুণদের সামনে ইসলামের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। (Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.72.)

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের চক্রান্ত আবার জমে উঠে। সে নির্বাচনেও নওয়াবদের আধিপত্য বজায় রাখার কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। আবুল হাশিমের গ্রুপ অত্যন্ত সতর্কতা ও সুকৌশলে ঢাকা জেলা নির্বাচনে তাঁদের বিজয় ছিনিয়ে আনেন। এই নির্বাচনে মাণিকগঞ্জের আওলাদ হোসেনকে সভাপতি এবং মুন্সীগঞ্জের শামসুদ্দীন আহমদকে সেক্রেটারি করে একটি নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।[২৪২] এভাবে শহর-বন্দর, গ্রাম-বাংলার সকল শ্রেণী-পেশার শিক্ষিত অশিক্ষিত মুসলিম জনতা লীগের পতাকাতলে সমবেত করতে সমর্থ হন। ফলে বঙ্গীয় লীগে আবুল হাশিমের জনপ্রিয়তা এবং ক্ষমতো বৃদ্ধি পায়।

সেক্রেটারিরূপে (দ্বিতীয় বছর ১৯৪৫)

অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কেটে যায় আবুল হাশিমের সেক্রেটারিরূপে দায়িত্ব পালনের একটি বছর (১৯৪৩-৪৪) বছর ঘুরে আবার নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এবার খাজা গ্রুপ আরো বেশি তৎপর হয়, যাতে আবুল হাশিম দ্বিতীয়বার সেক্রেটারি না হতে পারেন।[২৪৩] আবুল হাশিমের ক্ষমতো হ্রাস করার লক্ষ্যে এবার তাঁরা সোহরাওয়ার্দীকে নিজেদের পক্ষে নিতে সক্ষম হলেন। নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী সাহেব আবুল হাশিমকে বললেন, পার্টির সংহতির জন্য আমরা এবার সেক্রেটারিরূপে ডা. মালেককে নিব বলে স্থির করেছি।[২৪৪] আবুল হাশিমও দ্বিতীয় মেয়াদে সেক্রেটারি না হতে সম্মত হলেন। কিন্তু দলের তরুণ নেতা-কর্মীরা তা মেনে নিলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে উভয় গ্রুপের নেতার মীমাংসায় উপনীত হতে বাধ্য হয়। ১৯৪৪ সালের ১৭ নভেম্বর শুক্রবার মুহাম্মদ আলী পার্কে সুসজ্জিত একটি প্যান্ডেলে লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য, লীগ কাউন্সিলের প্রায় সাড়ে তিনশত সদস্য এবং প্রায় পাঁচশত দর্শক উপস্থিত হন।[২৪৫] আবুল হাশিম ১৯৪৩ সালের প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ছাপা কার্যবিবরণী পাঠ করেন। এখানে তিনি লীগের

---

242 বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩; এ সম্পর্কে কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেনঃ "আহসান মঞ্জিলের ঘর থেকে রাজনীতির বিদায় সমাপ্ত হ'ল ১৯৪৪ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর। রাতে নতুন সভাপতি খান বাহাদুর আওলাদ হুসেনের বাসা থেকে আবুল হাশিম সাহেবকে খবরটা দেয়া মাত্র তিনি বললেন, খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ, আমাদের তিনজনকে কলকাতা যাবার জন্য বললেন যত সত্বর সম্ভব। .....কলকাতা গিয়ে দেখলাম অমৃতবাজারে বিরাট হেড লাইন 'খাজা নাজিমুদ্দীনের পরাজয়'- অন্যান্য কাগজে দেখলাম আহসান মঞ্জিলের নেতৃত্বের অবসান। 'শিয়ালদহ স্টেশনে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ভীড় করে আছে-আমাদের আসার কথা শুনে। তাঁদের বললাম যে, আবুল হাশিম সাহেব প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের যা বলার তা' বলবেন, আমরা এসেছি তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বলতে।" (মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪; কামরুদ্দীন আহমদ, বাংলার মধ্য বিত্তের আত্মপ্রকাশ ২য় খন্ড, পৃ. ৫০)

243 দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৪৪।

244 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.88.

245 মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।[২৪৬] বস্তুত তাঁর চেষ্টায় ১৯৪৪ সালের মধ্যে বাঙলার মুসলিম লীগ এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়, যা ইতঃপূর্বে সম্ভব হয়নি।[২৪৭]

১৯৪৩-৪৪ এই এক বৎসরের মধ্যে আবুল হাশিমের কর্মতৎপরতায় বঙ্গীয় লীগের ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হওয়ায় কাউন্সিল সদস্যগণের নিকট তিনি বিপুলভাবে প্রশংসিত হন। সকলে আবুল হাশিমকে ধন্যবাদ জানালেন। আবুল হাশিম ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতি পদের জন্য মাওলানা আকরম খাঁর নাম প্রস্তাব করেন।[২৪৮] আবুল হাশিমের প্রস্তাব বিপুল হর্ষধ্বনীর মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে

---

246 পরিসংখ্যানটি ছিল এই: ১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যক দাঁড়িয়েছিল পাঁচ লক্ষ্যেরও বেশি। বরিশাল থেকে ১,৬০,০০০, ঢাকা থেকে ১,০৫,০০০, ফরিদপুর থেকে ৬০,০০০, নোয়াখালী থেকে ৫০,০০০, ময়মনসিংহ থেকে ৪১,০০০, চট্টগ্রাম থেকে ৪০,০০০, দিনাজপুর থেকে ২৪,৫০০, রংপুর থেকে ১৩,৪৭০, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মুহকুমা থেকে ২,০০০। (Abul Hasim, *In Retrospect,* Op,cit, p.90)

247 আরেক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯২৭ সালে যেখানে লীগের সদস্য সংখ্যা ছিল দুই হাজারেরও কম, ১৯৩৮ সালে তা এসে দাঁড়ায় এক লক্ষে এবং ১৯৪৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ্যে। ১৯৪৫ সালে গোটা ভারতের মুসলিম লীগের সদস্য হয়েছিল বিশ লাখ। তন্মধ্যে শুধু বাঙলায় লীগের সদস্য সংখ্যা হয় দশ লক্ষ। (সৈয়দ মনসুর আহমদ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩৩); ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময় লীগের অবস্থা কেমন ছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লীগের এক সর্বভারতীয় নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান বলেন, "এ সময় (১৯৩৪ খ্রী) লীগ একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। সরকারি খেতাবধারী ভদ্রলোক, নওয়াব, জমিদার এবং জী হুজুরেরা লীগে প্রভুত্ব করতেন। তাঁরা সাধারণত সদিচ্ছাপরায়ন লোক হলেও মুসলমানদের স্বার্থে তাঁরা এতটুকুই অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিলেন, যাতে সমাজে বা সরকারি মহলে তাঁদের গায়ে আঁচ না লাগে। ১৯০৬ খ্রী. লীগের জন্মলগ্ন থেকে সবসময় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি বাৎসরিক অধিবেশনগুলোও অনুষ্ঠিত হত সুসজ্জিত সামিয়ানার নিচে বা কোন বড় হল-ঘরে, যেখানে বিশেষ আমন্ত্রণে অতিথিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত। মুসলিম লীগে প্রকাশ্য জনসভার রেওয়াজ গড়ে উঠেনি। ১৯০৬ খ্রী. ঢাকায় যখন লীগের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন থেকে ১৯১০ খ্রী. পর্যন্ত এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল আলীগড়ে এবং লীগ ছিল সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুচ্ছ স্বরূপ। সে সময়কার লীগকে স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আখ্যা দেয়া যেত না। কারণ আলীগড় ছিল তখন রাজনৈতিকসহ মুসলমানদের যাবতীয় কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান কার্যালয় লখনৌতে স্থানান্তরিত করার পর লীগ রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামানো শুরু করল। তবে বেশ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। সদস্য ফী এবং বার্ষিক চাঁদা থেকে এর আয় অতটাই হত যাতে এর দপ্তরটুকু ঠিক মত চালানো যায়-জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার মত টাকাতো দূরের কথা। মাহমুদাবাদের রাজা বার্ষিক ৩০০০ টাকা যে অনুদান দিতেন, তাতে কোন মতে লীগের খরচ চলতো। এটাই ছিল লীগের স্থায়ী আয়ের উৎস।

"খিলাপত আন্দোলনের সময় লীগের অস্তিত্ব ছিল কেবল কাগজে কলমে। যেখানে যেখানে খিলাফত সম্মেলন বা কংগ্রেসের অধিবেশন হত মুসলিম লীগও সেখানে হাজির হত। খিলাফত শেষ হয়ে যাবার পর একদল নতুন নওয়াব এই সু প্রতীক শিশুটির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। কারণ এর মাধ্যমে সম্মান ও খেতাব লাভের বিপুল সুযোগ ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দুর্গের এই সব সুবিধাভোগীদের আত্মত্যাগের নিদর্শন ছিল লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দেওয়া এবং এত কষ্ট করে রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সফর করে শহরে পদার্পণ করে তাঁদের অতিথি হয়ে সুসজ্জিত সর্বসুবিধাযুক্ত গৃহে থেকে ও অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যসম্ভারে ক্ষুন্নিবৃত্তির পর তাম্বুল চর্বণ করা এবং সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার জন্য যে শহরে অধিবেশন হচ্ছে সেখানকার ঐ জাতীয় সম্মানভাজন আয়োজকদের মুখে নিজেদের ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণ করা। অধিবেশনের পর তার বিবরণী যথারীতি সংবাদপত্রে পাঠানো হত। কিন্তু তার বহু পূর্বেই বৃটিশ কর্মচারীরা তাঁদের গোপন সূত্র থেকে সভায় কে কি বলেছেন, তার পূর্নাঙ্গ বিবরণ পেয়ে যেতেন। অধিবেশন সমাপ্তির পরই সে বছরের মত প্রতিষ্ঠানের সব কাজ সমাপ্ত হয়ে যেত এবং ভারত সরকারের মহাফেজখানার বিবরণে লিপিবদ্ধ হওয়া ছাড়া অধিবেশনে কে কি বলেছেন, সে সম্বন্ধে কেউ খেয়াল ও করতেন না।" (সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩,১২৩; মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬-২৭)

248 প্রস্তাবটিতে আবুল হাশিম বলেছিলেন, "একজন সত্যিকারের মুসলমান যে মনোভাব লইয়া জামা'আতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে, আমিও আজ সেই মনোভাব লইয়াই এই সভামন্ডপে প্রবেশ করিয়াছি। মুসলমানদের কর্তব্য হইল আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা। প্রার্থনা করি রহমানুর রহিম আমাদিগকে ছেরাতুল মুস্তাকিমের দিকে পরিচালিত করিবেন। এই সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়াই আজ আমি সভাপতি পদের জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের নাম প্রস্তাব করিতেছি। আশা করি, যে মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি তাঁহার নাম প্রস্তাব করিতেছি আপনারাও সেই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাকে সমর্থন করিবেন।" (মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

গৃহীত হয় এবং মাওলানা আকরম খাঁ দ্বিতীয়বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সভায় আবুল হাশিমও দ্বিতীয় মেয়াদে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা আকরাম খাঁ দীর্ঘ হর্ষধ্বনির মাঝে নাটকীয় ভঙ্গিতে সভায় উপস্থিত তাঁর পুত্র খায়রুল আনাম খান ও আবুল হাশিমের কাঁধে হাত রেখে বললেন :

"Khairul Anam Khan and Abul Hashim are my two sons"[249]

সাময়িক সমঝোতার ভিত্তিতে আবুল হাশিম দ্বিতীয়বারের মতো লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেও পরবর্তী সময়ে আকরম খাঁর গ্রুপের সাথে আবুল হাশিমের গ্রুপের বিরোধিতা অভ্যাহতো থাকে। এতেঠদসত্ত্বেও আবুল হাশিম নতুন উদ্যমে লীগের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এবার তিনি কাজের সুবিধার্থে ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্বের ৬৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের বাসার পরিবর্তে ৩নং ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনে দোতলায় ছোট্ট একটি কামরায় উঠে এলেন। মুসলিম লীগের কাজ-কর্ম করা, থাকা, খাওয়া, বৈঠক সব এখানেই হতো। দুই বৎসর তিনি এখানে ছিলেন। প্রতিদিন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শত শত লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তথায় উপস্থিত হতেন। আবুল হাশিম এখানে রাত আড়াইটা পর্যন্ত মুসলিম লীগের যুব নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক তত্ত্বসমূহ, রাজনীতি, পার্টি সংগঠন দর্শন এবং সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাস গ্রহণ করতেন। এ ক্লাসে বাংলাদেশের এককালের জনপ্রিয় নেতা ও প্রেসিডেন্ট শেখ মজিবুর রহমান[২৫০]

---

249 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.90.

250 শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) এর জন্ম, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়ার গোপালগঞ্জে। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন জোতদার ও গোপালগঞ্জ আদালতের নাজির। মাতা সায়ারা খাতুন। দশ বছর বয়সে তিন বছর বয়স্কা জ্ঞাতি ভগ্নী ফজিলতন্নেসাকে বিয়ে করেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে এ আই এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে বি এ পাস করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল ক্লাসে ভর্তি হন। মুসলিম লীগ সরকার দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ না করার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে হরতাল পালনের সময়ে তিনি গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত ও গ্রেফতার লাভ করেন। ১৯৫২ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ র নির্বাচনে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দলকে অসাম্প্রদায়িক করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতিদমন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে শেখ মুজিব মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে ৬ দফা কর্মসূচি পেশ। একই বছর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৬ দফার পক্ষে প্রচার করতে গিয়ে ১৯৬৬ সালে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। বাঙালির জাতিসত্তাকে শাণিত করার লক্ষ্যে 'জয় বাংলা' শ্লোগান উদ্ভাবন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক বিজয় অর্জিত হয়। ৭ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান। এখানে তিনি ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' উদ্ভূত রাজনৈতিক সঙ্কটের পটভূমিকায় মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো ত্রিপক্ষীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত (১৯৭১)। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল তাঁর অবর্তমানে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে মুজিব নগরে (মেহেরপুর) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এ সরকারের নেতৃত্বে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলার পর স্বাধীনতা অর্জিত (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) হয়। ১৯৭২ এর

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত থাকতেন।[২৫১] পরবর্তীতে দেখা গেছে শেখ মুজিবুর রহমানও আবুল হাশিমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এ প্রসঙ্গে লন্ডন প্রবাসী প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী বলেন : "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে আবুল হাশিমকে কতোটা শ্রদ্ধা করতেন, তার প্রমাণ পেয়েছি ১৯৭৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে। বঙ্গবন্ধু তখন আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ৭৩ জাতি জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন থেকে ঢাকায় ফিরে এসেছেন। আমার স্ত্রী তখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে রাখা হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক কেবিনে। ওই কেবিনের দুই কেবিন পরেই চিকিৎসাধীন ছিলেন অসুস্থ আবুল হাশিম। বঙ্গবন্ধু এক বিকেলে আকস্মিকভাবে হাসপাতালে এসে হাজির। প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালে আসায় ডাক্তার-নার্স মহলে হৈচৈ পড়ে যায়। আবুল হাশিমের ছেলে বদরুদ্দীন উমর তখন আমার বন্ধু। দুজনে হাশিম সাহেবের ঘরে বসে গল্প করছিলাম। বঙ্গবন্ধু এসে পড়ায় কেবিনের বাইরে এসে আমাদের বসতে হলো। কেবিনের দরজা বন্ধ করে আবুল হাশিমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ১ ঘণ্টা আলাপ করেছিলেন।"[২৫২]

আবুল হাশিমের সাথে শেখ মুজিবের নিভিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক আবদুল গফুর আমার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন: "শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব বলেছিলেন, আবুল হাশিম সাহেবের হাতের দাগ এখনও আমার কাধে রয়েছে।"[২৫৩]

আবুল হাশিমের সংগঠন কৌশল, রব্বানিয়াত তত্ত্ব, ১৯৪৫ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে Let us go to war নামে একটি প্রচার-পত্র তথা লীগ ইস্তাহার প্রকাশ, সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচির প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা এবং সর্বোপরি কম্যুনিস্টদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তাকে যেমন মূল লীগের স্রোত থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, তেমনি আবার যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে প্রবল জনমতো ও সমর্থনের সাহায্যে বিরুদ্ধবাদীদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে প্রগতিশীল বলতে যা বুঝায় আবুল হাশিমের গ্রুপ তা-ই ছিল। তিনি তাঁর কর্মীদেরকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পরমতো সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেন। ১৯৪৫ সালে মিসেস সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে তাঁর সাথে

---

১০ জানুয়ারি শেখ মজিব ঢাকায় প্রবত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় সসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহিত হয়। এই সংশোধনীর বলে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে একদলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী দেশের প্রচলিত সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে 'বাকশাল' গঠন করেন। তাঁর শাসনামলে শিল্প-কারখানা, ব্যাংক, বীমা, রক্ষী বাহিনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ঢাকার ধানমন্ডিস্থ স্বীয় বাসভনে এক সামরিক আভ্যুত্থানে তিনি সপরিবারে নিহত হন। (সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাঃ) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮-৮১)

251 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.92-93.

252 রাষ্ট্রগুরু আবুল হাশিম থেকে রাষ্ট্রপিতা শেখ মুজিব, প্রথম আলো, ২০মার্চ ২০০২।

253 অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার, ৭/৬/২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা হলে তিনি বললেন, মধ্য প্রদেশের মুসলিম লীগে আপনার মতো যদি আমরা একজন সাধারণ সম্পাদক পেতাম, তবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমস্ত পার্থক্যের অবসান হতো।[২৫৪]

সে সময় বঙ্গ বিভাগ, সাম্যবাদ, লীগ মেনিফেস্টো প্রভৃতি ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের কারণেই আবুল হাশিমের সঙ্গে ডানপন্থীদের বিরোধ চরমে উঠে। বিশেষ করে লীগকে আদর্শগতভাবে সুসংহতো ও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের দলে পরিণত করার লক্ষ্যে জনসাধারণের নিকট যে ম্যানিফেস্টোটি প্রকাশ করা হয়েছিল সেটি মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এমনকি ঘোষণাপত্র ছাপার সাথে সাথে আবুল হাশিমের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়। হামিদুল হক চৌধুরীর মতে, 'ম্যানিফেস্টো' শব্দটি ছিল কমিউনিস্ট [২৫৫] শব্দ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবুল হাশিমের ঘোষণাপত্রে লীগের যুব নেতৃবৃন্দের চিন্তা ও কর্মকে উজ্জীবিত করার উপাদান বিদ্যমান ছিল, যদিও লীগের 'প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী' এবং 'বাগদাদী ইসলামের' গোঁড়া সমর্থকরা এতে কমিউনিজমের গন্ধ তালাশ করেছিল। বস্তুত লীগের শত্রুরা মুসলমানদের দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক স্বাধীনতাকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে মনে করতো। প্রকৃতপক্ষে ঘোষণাপত্রে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধও ছিল না। তাঁর প্রমাণ আবুল হাশিমের লেখা থেকেই পাওয়া যায়।[২৫৬]

---

254 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.93.

255 Ibid, p.95; আবুল হাশিম মনে করেন, ভারত উপমহাদেশে ইসলাম সরাসরি মদীনার খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে আসেনি, এসেছিল ইরানের মাধ্যমে আরব শাসনের রাজধানী বাগদাদ থেকে। আরবরা ইরান জয় করেছিল এবং ইরানীরা সাংস্কৃতির দিক দিয়ে আরবকে জয় করেছিল। ফলস্বরূপ ইরানে প্রাক ইসলামিক সংস্কৃতির সঙ্গে খাঁটি ইসলামের মিশ্রন ঘটে। ভারতের গোঁড়াপন্থী ইসলামি সম্প্রদায় ইরান থেকে প্রাপ্ত বাগদাদের বিকৃত ইসলামের প্রচার ও অনুশীলন করে আসছে এবং তাদের মতে মদীনার ইসলাম হচ্ছে কম্যুনিজম। এজন্যই খাজা নাজিমুদ্দীন মনে করতেন, 'ইসলামকে আশ্রয় করেই নাকি আমি কম্যুনিজম প্রচার করতাম।

256 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.95-97; ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে করা হয় যে, কারো ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না। মুসলমানের জীবন গঠনের অধিকার পুরোপুরি থাকবে। তাদের জন্য কোন বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত থাকবে না। অমুসলিমদের সমান অধিকার থাকবে। স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা তাঁদের প্রতি সদাশয় আচরণ করবেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান সভা গঠনের সুযোগ থাকবে। ঘোষণা পত্রে ভারত থেকে ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। খসড়া প্রস্তাব ছিল, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামে সকল মুসলমানদের উচিত-মুসলিম লীগের পতাকাতলে মিলিত হওয়া। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী আসাম এবং বাংলা নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। এতে সর্ব সাধারণের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি এবং সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রে তার বাস্তব রূপায়ণ, প্রস্তাবের অন্তভুক্ত ছিল। এতে সর্ব সাধারণের স্বাধীনতা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হবে। শ্রম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার এই তিনটি অধিকার হল-মানুষের প্রধান অধিকার। পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই রাষ্ট্র সমান সুযোগের নিশ্চয়তা দেবে। রাষ্ট্র শিক্ষার দায়িত্ব নেবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। জমিদারের জমির একচেটিয়া মালিকানা থাকবে না। ভূমি রাজস্বের বিলোপ সাধন করা হবে। প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও যানবাহনের জাতীয়করণ করা হবে। শ্রমিকদেরকে তাঁদের অধিকার দেয়া হবে। এসব দাবির প্রতি নিশ্চয়তার জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, বেকার বীমা, বয়স্কদের পেনশন এবং সর্বনিম্ন বেতন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। কৃষকদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা হবে। কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সমষ্টিগতভাবে জমির চাষাবাদ, সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে। অমুসলিমদের সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণের

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিমের মতে, ১৯৪৫ সালের ৫ এপ্রিলের মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ঘোষণা পত্রটির উপর যে মন্তব্য ছাপা হয়েছিল তা ছিল, "এই প্রোগ্রামকে যদি প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেয়া হয়, তাহলে এ সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, প্রগতিশীল প্রোগ্রাম যে কি তা আমরা জানি না।"[২৫৭]

ঘোষণাপত্র প্রায়নের পর আবুল হাশিম আবার পুরো বাঙলায় লীগের আদর্শ প্রচারের জন্য "পয়তাল্লিশ দিনের লংমার্চ" সফরে বের হলেন। মফিদুল হকের মতে, চীনের মাওসেতুং-এর নেতৃত্বাধীন গণমুক্তি ফৌজের লং মার্চের সঙ্গে আবুল হাশিমের লং মার্চ তুলনীয়। এতে রক্ষণশীল মুসলিম লীগারদের চোখে তাঁর বামপন্থী ভাবমূর্তি আরো প্রকট করে থাকবে হয়ত।[২৫৮] এ সময় দীর্ঘ সফরে আবুল হাশিম বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, নরসিংদীর চালাকচর এবং যশোর জিলার বন গাঁয়ে এসে ৪৫ দিনের সফর শেষ করেন। এতেঠ দীর্ঘ দিনের সফর স্বার্থকভাবে শেষ করে আবুল হাশিম যশোরের সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বাড়ীতে এসে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানিয়ে নামাজ আদায় করেন।[২৫৯]

আবুল হাশিমই প্রথম লীগ নেতা যিনি উদারতাবাদ, মার্কসবাদ এবং ইসলামি দর্শনকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে চাইতেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও পুজিঁবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। উপরন্তু কমিউনিস্ট পার্টিও পাকিস্তান দাবী সমর্থন করেছিল। ফলে আবুল হাশিম পশ্চিমা কমিউনিজম বিরোধী হলেও কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এটা মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীদের কাছে ভাল লাগেনি। এ জন্যই মাওলানা আকরম খাঁ দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয় কলামে আবুল হাশিমকে 'কমিউনিস্ট' ও 'কাদিয়ারী'[২৬০] বলে মন্তব্য করেছিলেন।[২৬১] খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্য ছিল, ইসলামের মোড়কে আবুল হাশিম কমিউনিজম প্রচার করে বাংলার

দায়িত্ব থাকবে মুসলিম লীগের উপর। তাঁদের সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ চলবেনা। হরিজন সম্প্রদায়কে সমঅধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে। ঘোষণাপত্রটি সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং পুরোপুরি জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের অনুকূল ছিল।

257 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

258 মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

259 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.99.

260 কাদিয়ানী : 'কাদিয়ান' তথা 'পাঞ্জাবে' জন্মগ্রহণকারী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৭-১৯০৮) এর অনুসারীদের 'কাদিয়ানী' বলা হয়। তিনি ১৮৯১ সালে 'ঈসা ও মাহদী হওয়ার দাবি করেন। ফলে সাধারণ মুসলমান, 'আলিম সমাজ, আর্য ও খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। আহলে হাদীসের প্রখ্যাত 'আলিম মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী তাঁর বিরুদ্ধে নাস্তিক্যবাদের ফতোয়া জারি করেন। ১৯৮২ সালে তিনি কাদিয়ান থেকে 'রিভিউ-অফ-রিলিজিয়াস' প্রকাশ করেন এর মাধ্যমে নিজ

চিন্তা ধারা প্রচার করতে থাকেন। (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২) তবে আবুল হাশিমকে কেন কাদিয়ানী বলতেন, তার কারণ জানা যায় না।

261 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p.56.

Dhaka University Institutional Repository

যুবকদেরকে ক্ষেপাণ।[২৬২] এভাবে আবুল হাশিমের প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম কথা বলে কোণঠাসা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তরুণদেরকে তিনি চুম্বকের মতো আটকে রাখতে পারতেন। সেদিন লীগের নবীন কর্মী ও যুবকরা আবুল হামিমের ইসলামি সাম্যবাদের কথা শুনে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং আরো অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পর্কিত তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা। এভাবেই তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই তৎকালীন বাঙলাদেশের মুসলমান সমাজের নতুন প্রজন্মের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে মুসলিম লীগের পতাকাতলে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৬৩]

আবুল হাশিম বিশ্বাস করতেন, লীগ শুধু মুসলমানদের সংগঠন নয়; বরং এটা হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার আদায়ের আশা-ভরসার কেন্দ্র। ইসলামি নীতির আলোকে আবুল হাশিম লীগকে কমিউনিস্ট পার্টির ন্যায় ক্যাডারভিত্তিক সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা করেন। বস্তুত আবুল হাশিম তখন নতুন প্রজন্মকে লীগের অন্তর্ভুক্ত করে যে কৃতিত্ব দেখান, তা তদানীন্তন বাঙলার অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি পার্টির মধ্যে সার্বক্ষণিক কর্মীবাহিনী তৈরী করেন। কর্মীদের মধ্যে নিয়মিতো পাঠচক্রের ব্যবস্থা করেন। পূর্বে মুসলিম লীগের এমন ঐতিহ্য কখনো ছিল না। বহির্বাঙলার মুসলিম লীগেও এমন সাংগঠনিক কাজ হয়নি; এমনকি কংগ্রেসেও ছিল না। আবুল হাশিম লীগের সংগঠনকে নিয়ে গেলেন জনসাধারণের দোরগোড়ায়।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তাঁর ভূমিকা

১৯৪৫ সনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর ভারতের বাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করলেন যে, ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **নির্বাচনের প্রাক্কালে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৬** এর নির্বাচনকে পাকিস্তান ইস্যুর উপর ভারতের মুসলমানদের গণভোট বলে ঘোষণা করেন।[২৬৪] এই নির্বাচনে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' কংগ্রেসকে সমর্থন করায় মুসলমান

---

262 চতুরঙ্গ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৭।

263 তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, নরুদ্দীন আহমেদ, সালেহ আহমেদ, 'আবদুর রহমান, মহাম্মদ ইকরামুল হক, শেখ 'আবদুল আযীয, আবদুল হাই, মোশারফ খান, আবুল হাসনাত, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, আতাউর রহমান, মহাম্মদ মাহবুবুল হক, আবদুর রশীদ খান, শেখ মুজিবর রহমান, বিএম ইলিয়াস, শাহ 'আবদুল বারি, আবুল হোসেন, মহাম্মদ আবুদর রফিক চৌধুরী, ফকির মুহাম্মদ, মুহাম্মদ সোলায়মান খান, মুহাম্মদ নবীরুল ইসলাম, মাহবুব আনোয়ার, শাহাবুদ্দীন, জহিরুদ্দীন, কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক, কাজী মুহাম্মদ বশীর, ইয়ার মুহাম্মদ, শামসুদ্দীন আহমেদ, মুহাম্মদ শওকত আলী, এ কে আর আহমেদ, মসিহুদ্দীন আহমেদ, ক্বালমাস 'আলীম, আউয়াল, তাজ উদ্দীন আহমেদ, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, অলী আহাদ, মুহাম্মল তোয়াহা এবং নাজমুল করীম। (Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, Pp.58-59.)

264 Jamil-uddin-Ahmed, *Speeches and Writings of Mr. jinnah*, Lahore, 1964, Vol.2, p. 202.

Dhaka University Institutional Repository

ভোটারদের মধ্যে কংগ্রেসের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের' হাজার হাজার ওলামা মুসলিম লীগকে সমর্থন দেন।[২৬৫] মুসলিম লীগ এই নির্বাচনকে বাঁচা-মরার সংগ্রামরূপে বিবেচনা করে।[২৬৬] নির্বাচনকে সামনে রেখে Let us go to war (শুরু হোক সংগ্রাম) নামে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে অত্যন্ত উদ্দীপক ভাষায় আবুল হাশিম ভবিষ্যত পাকিস্তানের রূপরেখা সম্পর্কে তার মতোমতো ব্যক্ত করেছিলেন। এটিতে তিনি বলেছিলেন যে, পাকিস্তান হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং ইসলামি সমাজতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। তাতে তিনি সকল মুসলমানকে মতোপার্থক্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জান ও মাল আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করার আহবান জানিয়ে বলেন, হযরত আবূ বকর যেমন মু'তার যুদ্ধের জন্য রাসূলের নিকট তাঁর সব সম্পদ দান করেছিলেন, তেমনি মুসলিম লীগের নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য তা সমর্পণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, যাদের লেখনী শক্তি রয়েছে, তারা লেখা দিয়ে, যাদের বাচনশক্তি আছে, তাঁরা বক্তব্য দিয়ে এবং যুবকেরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম কাজে লাগাবেন।[২৬৭]

ইতোমধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড নির্বাচনে প্রার্থিতা বাছাই চূড়ান্ত করে। পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য হিসেবে আবুল হাশিম এক বিবৃতিতে মনোনীত লীগ প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করার জন্য সকলকে নির্বাচনী যুদ্ধে ঝাপিয়ে পরার আহবান জানান।[২৬৮] সে সময় 'দৈনিক আজাদ' 'মর্নিং নিউজ' এবং 'স্টার' সব পত্রিকাই ছিল ডানপন্থীদের মালিকানাধীন। আবুল হাশিম নিজস্ব ধারায় লীগের প্রচারের জন্য ১৬ ডিসেম্বর (১৯৪৫) 'সাপ্তাহিক মিল্লাত' পত্রিকা প্রকাশ করেন।[২৬৯] পত্রিকাটির জন্য জিন্নাহর কাছে শুভেচ্ছাবাণী চাওয়া হলে তিনি শুধু বললেন, "বাণী আর কি দিব, আপনারা সবাই কাজ করুন-এই আমি চাই।"[২৭০]

---

265 *সাপ্তাহিক মিল্লাত*, কলকাতা, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৫, পৃ. ১১।

266 মাওলানা আকরম খাঁ ২২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেনঃ "মনে রাখিতে হইবে আজ এই নির্বাচনে লীগ প্রার্থীর সাফল্য, মুসলমান জাতিরই সাফল্য, পাকিস্তানের শক্তি বৃদ্ধি। পক্ষান্তরে, লীগ প্রার্থীর পরাজয় মুসলমান জাতিরই পরাজয় এবং পাকিস্তানেরই সংকট বৃদ্ধি। সুতরাং বাংলার মুসলমানের সকল আগ্রহ, সকল মনোযোগ আজ একই লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হইতেছে ....তাই আসন্ন নির্বাচন যুদ্ধে তাহার শক্তি পরীক্ষা, তাহার ত্যাগের পরীক্ষা এবং তাহার ঈমানের চরম পরীক্ষা হইয়া যাইবে।" (*দৈনিক আজাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)

267 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, Pp. 195-96.

268 Ibid, p.194.

269 আবুল হাশিম ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক থাকলেও কাজী মুহাম্মদ ইদরিসকে মিল্লাতের সম্পাদনার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সে সময় 'মিল্লাত' এর হাজার কপি বিক্রী হত। মুসলিম লীগের শতশত কর্মী সে পত্রিকা হাতে হতে বিক্রী করতেন, যেভাবে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা বিক্রী করতেন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা। (সৈয়দ মনসুর আহমদ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৭)

270 *সাপ্তাহিক মিল্লাত*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৪৫, পৃ.০১।

Dhaka University Institutional Repository

এই মিল্লাত পত্রিকাটি তখন তরুণ প্রজন্মকে পাকিস্তান আন্দোলনে উজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সম্পর্কে আমার সাথে এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক আবদুল গফুর বলেন:

"আবুল হাশিম সাহেবের সম্পাদিত সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকাটির এক একটি লেখা যেন ছিল এক একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ। এগুলো পড়ে শুধু আমরা নিজেরা উজ্জীবিত হতোম না, এ আগুন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সদরঘাটে হকারদের পাশে দাড়িয়ে মিল্লাত এবং পাকিস্তান আন্দোলনের উপর লিখিত ছোট ছোট পুস্তিকাও আমরা বিক্রি করতোম মহাউৎসবে।"[২৭১]

১৯৪৬ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবুল হাশিমের সাংগঠনিক প্রতিভা পূর্ণতা পায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি গোটা বাঙলা চষে বেড়ান এবং গ্রাম-গঞ্জে বিরামহীনভাবে লীগের প্রচারাভিযান চালান। ফলে বাঙলার মুসলিম কৃষক শ্রমিক বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রযুবক আবুল হাশিমের উত্তাল আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এবং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ সময় প্রাদেশিক লীগ এবং পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য প্রচার কার্য চালাতে সমর্থ হননি।[২৭২] তাই নির্বাচনের প্রচার কার্যের সিংহ ভাগই আবুল হাশিমকে পালন করতে হয়েছিল। কাজে মুসলিম লীগের পাল সভাপতির হাতে থাকলেও ঢাল ছিল আবুল হাশিমের মুঠিতে। নির্বাচন উপলক্ষে আবুল হাশিম যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তার উল্লেখ করে জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম[২৭৩] বলেন:

---

271 অধ্যাপক আবদুল গফুরের সাথে সাক্ষাৎকার, ১৪/৬/২০০৬।

272 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, Pp. 103.

273 অধ্যাপক গোলাম আযম (১৯২২-) আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। নানা কারণে দেশে-বিদেশে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। তাঁর জন্ম মিয়া সাহেবের ময়দান, লক্ষীবাজার, ঢাকা। পৈতৃক নিবাস বি.বাড়িয়া জেলার নবীনগরের বীরগাঁও গ্রামে। বর্তমানে তিনি ঢাকায় বসবাস করছেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা কাজী গোলাম কবির, মাতা- সাইয়েদা আশরাফুন্নিসা। তিনি ঢাকা নিউস্কিম মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা এবং একই মাদ্রাসার কলেজ থেকে আই এ পাস করেন। তার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম.এ পাস করেন। সুতরাং ইসলামী জীবন-দর্শনের আশাপাশি তিনি ইংরেজি শিক্ষায় সমান অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনেই তিনি ছাত্র রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ডাকসুর নির্বাচিত সেক্রেটারী ছিলেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনেক দাবি-দাওয়া উথাপন করেন। এক্ষেত্রে তার সমতুল্য লোকেরা সংখ্যা খুবই কম। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখার ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলিল। তাঁর প্রথম লেখা: ডাকসুর বার্ষিক ম্যাগাজিনে 'পরকালে ভারতীয় রাজনীতি' (১৯৪৬)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল: কুরআন বুঝা সহজ, আমপারা (তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ), ২৯ পারা (তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ), সীরাতুন্নবী সংকলন, নবী জীবনের আদর্শ, ইসলামে নবীর মর্যাদা, বিশ্ব নবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি, বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি, রাহমাতুললিল আলামীন, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন, ইকামাতে দ্বীন, ইসলামী আন্দোলন-সাফল্য ও বিভ্রান্তি, বাইয়াতের হাকীকাত, রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা, ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের ৭ দফা, জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য, জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী, আমার দেশ বাংলাদেশ, ইসলামী, অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী, আমার দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রাজনীতি, বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই, পলাশী থেকে বাংলাদেশ, ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদুদীর অবদান, আধুনিক পরিবেশে

Dhaka University Institutional Repository

"আবুল হাশিমের মতো বলিষ্ঠ সংগঠকের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ গণসংগঠনে পরিণত হয় এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। মুসলিম লীগ তখন মুসলিম জাতির একমাত্র জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বলতে গেলে গোটা যুব নেতৃত্বই ছিলো আবুল হাশিমের সংগঠিত বাহিনী।"[২৭৪]

বস্তুত ১৯৪২ সনের নভেম্বর থেকে ১৯৪৭ সন অবধি আবুল হাশিমের ভূমিকা ছিল কাণ্ডারীর, যদিও লীগের একাংশ তা স্বীকার করতে চায়নি। ১৯৪৬ সালের জানু-মার্চ মাসের মধ্যে (First Quarter) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ১২১টি মুসলিম অমুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩ মতোান্তরে ১১৪টি আসন লাভ করে[২৭৫] এবং একক মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে যেখানে মুসলিম লীগ পেয়েছিল মুসলিম ভোটের মাত্র ৪৫ শতাংশ, এবার তাঁরা পায় প্রায় ৭৫ শতাংশ ভোট।[২৭৬] ভোটারের হিসেবে দেখা যায় যে, নির্বাচনে ২৪,৩৪,১০০ টি মুসলিম ভোটারের মধ্যে লীগ প্রার্থীগণ ২০,৩৬,৭৭৫ টি ভোট পায়। অপরদিকে লীগ বিরোধী সকল প্রার্থী মিলে মাত্র ৩,৯৭,৩২৫ টি ভোট লাভ করেন।[২৭৭] আবুল হাশিম বর্ধমান জেলা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ২৬,৭০২ ভোটে জয়ী হন।[২৭৮]

বস্তুত এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয়ের সব থেকে বড় কারণ ছিল সেই তরুণ প্রজন্মের চেষ্টার ফল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি মেজরিটি আসন লাভ করে। সীমান্তে কংগ্রেসপন্থী লালকোর্তা দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এমনকি সিন্দু প্রদেশেও লীগ অল্পের জন্য মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হয়নি। সোহরাওয়ার্দী সেক্রেটারি থাকার সময়ে লীগের যে অবস্থা ছিল, তা যদি বহাল থাকত, তবে' ৪৬ সালে মুসলিম লীগের বিজয় সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। তখন হয়ত বাঙলায় মুসলিম লীগের অবস্থা হতো সিন্ধু প্রদেশ বা পাঞ্জাবের মতো। মুসলিম লীগের এই উত্থান পাকিস্তান

ইসলাম, কিশোর মনে ভাবনা জাগে, ধর্মনিরপেক্ষা মতবাদ, মুসলিম মা-বোনদের ভাবনার বিষয়, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ, মনটাকে কাজ দিন, মযবুত ঈমান, আসুন আল্লাহর সৈনিক হই, জীবন্ত নামায, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহীহ্ জযবা, সৎ লোকের এত অভাব কেন, আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন, নেতাদের এ দশা কেন?, কুরআন ঘোষিত শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী, জীবনে যা দেখলাম (১ম-৪র্থ খণ্ড), ইত্যাদি। লেখালেখির জন্য তিনি বিভিন্ন সময় সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হন। ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম কর্তৃক সম্মাননা (২০০৪), তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক মাতৃভাষা পদক (২০০২), ভাষা সৈনিক সম্বর্ধনা পরিষদ সিলেট কর্তৃক সংবর্ধনা (২০০২), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন কমিটি কর্তৃক সম্মাননা (২০০২)। সঙ্গে বর্তমানে তিনি ইসলাম ও রাজনীতির লেখালেখিতে ব্যস্ত রয়েছেন। (নাসির হেলাল (সম্পাঃ) পৃ. ১২২)

274 গোলাম আজম, অধ্যাপক, *জীবনে যা দেখলাম (১ম খণ্ড)*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৭০।

275 *Star of India*, 7 and 8 April, উদ্ধৃতঃ Shila Sen, Op,cit, p.198.

276 মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

277 Shila Sen, Op,cit, p.198.

278 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, Pp. 122; তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আবদুস সাত্তার এবং এম, এন রায়ের পার্টির নূর নেওয়াজ। আবদুস সাত্তার ভোট পেয়েছিলেন ৭৬৩ এবং নূর নেওয়াজ পেয়েছিলেন মাত্র ২৬৩ ভোট। (Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, Pp. 122)

Dhaka University Institutional Repository

গঠনে সত্যিকার অর্থে গণভোটের কাজ করেছিল। খাজাদের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের পক্ষে এরকম বিজয় অর্জন করা অসম্ভব ছিল। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হতে আরও দেরি হতো, অথবা দেশ বিভক্ত না হয়ে যদি অখণ্ড থাকত, তবে আবুল হাশিম যে সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একজন অগ্রগণ্য নেতা হিসেবে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[২৭৯]

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এপ্রিলের দুই তারিখে এক বিবৃতিতে বলেন: "নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে, বাংলার মুসলমান পাকিস্তান দাবির প্রতি কতটুকু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ"[২৮০] ৮ তারিখ তিনি পুনরায় বলেন, নেহেরু নির্ভর করেন ব্রিটিশ মিলিটারী হিন্দু পুলিশের উপর কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, দুনিয়ার কোন শক্তির জোরে তিনি ভারতের দশ কোটি মুসলমানকে ধ্বংস করতে পারবেন না, যাঁরা মুসলিম লীগের পতাকাতলে দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ।[২৮১] খাজা নাজিমুদ্দিনও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, দশ কোটি মুসলমানের দাবিকে অগ্রাহ্য করে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা যাবে না।[২৮২] মোটকথা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাঙলার মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

অতপর ১৯৪৬ সালের ২রা এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি সর্বসম্মতিক্রমে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নেতা নির্বাচন করেন।[২৮৩] এর অব্যবহিতো পরেই সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পক্ষে মতো দেন। প্রথমে কংগ্রেস এতে রাজি হয়নি। পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দী সরকার গঠনের জন্য বাঙলার তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর ফেডারিক বারোজের পেয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।[২৮৪] কিন্তু মাওলানা আকরম খাঁ এর বিরোধিতা করেন।[২৮৫] এতেঠদসত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী কয়েকজন অকংগ্রেসী হিন্দু ও স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্য নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করলে আকরম খাঁর সাথে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে।[২৮৬]

---

279 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পাঃ), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯।

280 *স্টার অব ইন্ডিয়া*, ২ রা এপ্রিল, ১৯৪৬।

281 *স্টার অব ইন্ডিয়া*, ৮ই এপ্রিল, ১৯৪৬; ইমরান হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯-৮০।

282 *স্টার অব ইন্ডিয়া*, ৮ই এপ্রিল, ১৯৪৬; ইমরান হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯-৮০।

283 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩; সাপ্তাহিক মিল্লাত, কলকাতা, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫, পৃ. ২,৬,১২।

284 *Morning News*, 2 April, 1946.

285 মাওলানা আকরম খাঁর সাথে সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আকরম খাঁ সোহরাওয়ার্দীর কোয়ালিশন গঠনের আগ্রহকে মুসলিম বাঙলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও মন্ত্রিত্বকে নিরাপদ করার 'মতলব' বলে অভিহিত করেন। (*সাপ্তাহিক মিল্লাত, কলকাতা*, ২৬ শে এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃ. ৩)

286 Md. Enamul Huq Khan, *A.K. Fazlul Huq and Muslim Leaghue: 1906-1947*, Ph.D.Thesis, The Faculty of Arts, Panjab University, Chandigarh, 1982, p.225

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাওয়ার্দী সাহেব মন্ত্রীসভা গঠন করার পর ১৯৪৬ সালের ১৫ মে আবুল হাশিম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু সভাপতির পূর্ব অনুমতি না নিয়ে সভা আহবান করায় আকরম খাঁ তা পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে বাতিল করেন।[২৮৭] ২১ শে জুন আবুল হাশিম পুনরায় লীগের অধিবেশন আহ্বান করলে তাও তিনি বাতিল করে দেন।[২৮৮] ফলে আবুল হাশিমের সঙ্গে আকরম খাঁর বিরোধ চরমে পৌছে। বস্তুত এ সময় আকরম খাঁ বাঙলার রাজনীতি থেকে আবুল হাশিমকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন।

লাহোর প্রস্তাবের পরিবর্তনে বাধা দান

১৯৪৬ সালের ৭ এপ্রিল মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে দিল্লীর অ্যাংলো এ্যারাবিক কলেজে মুসলিম লীগের পাঁচ শতাধিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদেরকে কনভেনশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মি. জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাব থেকে সরে এসে একটি মাত্র স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত ঐ প্রস্তাবের অংশটি ছিল নিম্নরূপঃ

"That the zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Pun‡jvab the NWFP, Send and Beluchiestan in the North-West of India, namely Pakistan zones, where the Muslims are a dominant majority, be constituted into one sovereign indipendent state."[289]

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোন উল্লেখ ছিল না। পরে এই প্রস্তাব 'পাকিস্তান' প্রস্তাব নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৬ সালে কনভেনশন সম্মিলনে লাহোর প্রস্তাব নিয়ে মি. জিন্নাহর সাথে আবুল হাশিমের বিরোধ ঘটে। আবুল হাশিমের মতে-লাহোর প্রস্তাবে পরিস্কারভাবে দুই পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। তাই প্রাক-সম্মেলন-পূর্ব সাব কমিটিতে জিন্নাহ এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করলে আবুল হাশিম পয়েন্ট অব অর্ডারে এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য বলে আখ্যায়িত করে বলেন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তার ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে, মুসলিম লীগের মূলমন্ত্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছিল।' ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে 'এক পাকিস্তানের' কথা প্রস্তাব করা হয়নি, চিন্তা করা হয়েছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য 'দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম' রাষ্ট্র গঠনের কথা। সুতরাং ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগের

---

২৮৭ *সাপ্তাহিক মিল্লাত*, কলকাতা, ১৭ মে, ১৯৪৬, পৃ.২।

২৮৮ *সাপ্তাহিক মিল্লাত*, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৭, পৃ.২।

২৮৯ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাঃ), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মূলমন্ত্ররূপে গৃহীত বিষয়ের পরিবর্তন করার অধিকার লীগের আইন সভার সদস্যদের থাকতে পারে না।[২৯০] আবুল হাশিমের আপত্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এম,এ, এইচ ইস্পাহানী বলেন:

"The resolution of the Convention substituted a sovereign independent State in place of independent States embodied in the Lahore Resolution. ...Abul Hashim opposed this resolution in the Subject Committee ...He argued that the two zones separated from one antohter by an alien territory of one thousand miles could never be integrated into one state."[291]

আবুল হাশিমের আপত্তির জওয়াবে জিন্নাহ বললেন বহুবচনের 'এস'টি ছাপার ভুল। শব্দের জন্য কিছু আসে যায় না। উদ্দেশ্যই হলো আসল।[২৯২] ভুল যাচাই করার জন্য জিন্নাহই নির্দেশে লিয়াকত আলী যখন মূল লাহোর প্রস্তাবের ফাইল হাজির করলেন তখন দেখা গেল যে, তাতে Independent States এই শব্দ দু'টি ঠিক জায়গাতেই আছে। নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সম্পাদিত Ghandi jinnah talks পুস্তিকাতেও 'I' এবং 'S' অক্ষর দুটি Capital letter এ মুদ্রিত ছিল এবং states শব্দটিও বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছিল। কাজেই অফিসিয়াল রেকর্ডও আবুল হাশিমের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তখন জিন্নাহ আবুল হাশিমকে বললেন, মাওলানা সাহেব, আমি এক পাকিস্তান রাষ্ট্র চাই না, আমি চাই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি বিধান সভা।[২৯৩] রাতে মি. জিন্নাহ আবুল হাশিমকে ডাকালেন আলাপ করার উদ্দেশ্য। তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা হয় তা ছিল এইঃ Mr. Jinnah: Maulana Abul Hashem! why do you

---

290 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, Pp. 125.

291 Muhammad Abdur Rahim, *Muslim Society and Politcs In Bengal* A.D 1757-1947, Op,cit, P. 301 ; অর্থঃ লাহোর প্রস্তাবের একাধিক স্বাধীন স্টেটের পরিবর্তে কনভেনশনের প্রস্তাবে একটি সার্বভৌম স্বাধীন স্টেট হল। কতেক সদস্য মনে করলেন, এটা হল মুসলিম লীগের কর্মসূচীতে মৌলিক একটি পরিবর্তন। আবুল হাশিম সাব-কমিটিতে এই বলে আপত্তি জানালেন যে, এটা হল লাহোর প্রস্তাবের পরিবর্তন, অথচ ঐ প্রস্তাবটি ১৯৪০ থেকে মুসলিম লীগের মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। মুসলিম লীগের মৌলিক প্রস্তাবে কনভেনশনের আইন রচয়িতাদের কোন মৌলিক অধিকার নেই। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেন মধ্যখানে ১০০০ মাইলের ব্যবধানে যেখানে একটি বিদেশী স্টেট আছে, সেখানে এক দেশের দুই টুকরো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না।

292 ফিরোজা বেগম, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১২; এ ব্যাপারে মোহাম্মদ আবদুর রহীম বলেনঃ Jinnah gave the ruling that the letter 'S' after the word 'State' was a typographical error. But it was found that all the published records of Muslim League carried the word in plural. According to M.A.H. Ispahani, Qaid-i-Azam replied, 'Whar mattered was the intention and not the word. In fact, he directed that records be rectified." (Muhammad Abdur Rahim, *Muslim Society and Politcs In Bengal* A.D 1757-1947, Op,cit, P.301)

293 Abul Hasim, *In Retrospect*, Op,cit, p. 126.

Dhaka University Institutional Repository

oppose the idea of one Pakistan জওয়াবে আবুল হাশিম বললেন, Before I answer your question May I put one question to you? জিন্নাহ বললেন: Yes of course! you can ask me any question আবুল হাশিম তখন প্রশ্ন করলেন Why do you want pakistan at all? প্রত্যুত্তরে জিন্নাত বললেন, We want to save the crores of Muslims from the exploitation of Hindu capitalists and landlords. আবুল হাশিম তখন বললেন Yes, I also take my stand exactly on the same logic. If you do not like to be exploited by Tatas and Biralas, Muslim Bengal also have the same right to refuse to be exploited by Ispahanis and Dosanies.[294]

আবুল হাশিম সেদিন জিন্নাহর সামনে দাঁড়িয়ে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করাকে অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে: 'আমি জানি আপনার ব্যক্তিত্বের সামনে আমি পরাজয় বরণ করব। তথাপি আমি যা সঠিক বলে জানি এবং বিশ্বাস করি তাই আমি রেকর্ড করে যাব। একদিন বাংলার মানুষ জানতে পারবে যে, আবুল হাশিম তাদের অধিকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।[২৯৫] জিন্নাহ আবুল হাশিমের আবেগকে বুঝতে পেরে নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানকে বলেছিলেন, এই প্রস্তাব (এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব) আগামীকাল 'কাউন্সিল মিটিং'-এ আনার প্রয়োজন নেই। লাহোর প্রস্তাবই ঠিক থাকবে। পরের দিন কাউন্সিলের সামনে আর কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় নি। ১৯৪৬ সালের ১৯ জুলাই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত লীগের কাউন্সিল অধিবেশন চলাকালীন সময়ে জিন্নাহ আবুল হাশিমকে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কাজ করতে বলেন। এই সময় তিনি বাঙলার মুসলিম নেতাদের বলেন যে, তিনি লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করেন নি এবং লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে লীগের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেবার পর তিনি তা পারেনও না। তিনি এই প্রস্তাবটি পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে পেশ করবেন বলে জানিয়েছিলেন।[২৯৬] কিন্তু দেখা গেল কার্যত এই ব্যাপারে পরে কোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। এভাবেই আবুল হাশিম পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা লগ্নেই ১৯৪৭ সালে স্বাধীন সার্বভৌম অভিভক্ত বাঙলা আন্দোলনের এক অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যান।

---

294 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

295 ঐ, পৃ. ২০২।

296 Kamruddin Ahmed, A social History of Bengal, Dacca, 1970, p. 70

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত আবুল হাশিমের বক্তব্য States শব্দটিই ঠিক ছিল। এর পক্ষে প্রমাণ দেবার পরও জিন্নাহ নিজ জেদে অটল থেকে লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের জন্য কৌশলগত কারণে বাঙলারই বিখ্যাত নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করান এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তাবটি পাশ করান; যাতে বাঙলা থেকে কোন আপত্তি না আসতে পারে। সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাঙলার পক্ষে থাকলেও তিনি তখন বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জিন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঝুঁকিপূর্ণ করতে চান নি। তাই জিন্নাহকে সমর্থন করা ছাড়া তাঁর কোন উপায়ও ছিল না।[২৯৭] আবুল হাশিম সেই সময়ে পেটের পীড়ার কথা বলে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দেননি। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর উপস্থিতিতে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাবটি পেশ করার জন্য মি. জিন্নাহ হয়তো তাঁকেই বলবেন।[২৯৮] আবুল হাশিম সেদিন বিবেকের দংশন থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে দ্বিতীয় প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি যোগ দেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণের যে বিবরণী 'মিল্লাত' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তা থেকে মনে হয় শেষ পর্যন্ত আবুল হাশিম নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক হলেও বিজয়ের উল্লাস মুখর সমাবেশে আবুল হাশিমও সেদিন একই জোয়ারে গা ভাসিয়ে ছিলেন বলে মনে হয়।[২৯৯]

মুসলিম লীগের সভাপতি–পদপ্রার্থী

মাওলানা আকরাম খাঁ ১৯৪৬ সালের ৮ নভেম্বর শারীরিক অসুস্থতা ও বার্ধক্যের কারণে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন।[৩০০] আবুল হাশিম তখন লীগের 'সভাপতি' পদে প্রার্থী হবার ঘোষণা দেন।[৩০১] ৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৭) আকরম খাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ

---

297 ইমরান হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭।

298 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯ এবং ৪৩৯।

299 মফিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬২; 'মিল্লাত' পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, "জোরালো এবং সুস্পষ্ট বাগ্মিতার সহিত মিঃ সোহরাওয়ার্দীর উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি নেতা নহি। আমি পাকিস্তানের একজন নগণ্য খাদেম এবং একনিষ্ঠ সৈনিক। কায়েদে আজমের উপর অটল বিশ্বাস ও তাঁহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীগণ ইসলামের শত্রুর সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। আমি সেই পূর্ব পাকিস্তানের সেবক ও সৈনিকদের পক্ষ হতে মুসলিম লীগের এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেক জাতির জন্য মহান আদর্শ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই আদর্শ ও নীতিই আমাদের পাকিস্তান দাবির ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করার অর্থ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করা।" (সাপ্তাহিক মিল্লাত, ১৯ এপ্রিল ১৯৪৬)

300 দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৯ ই নভেম্বর, ১৯৪৬, পৃ. ১; সাপ্তাহিক মিল্লাত, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭, পৃ. ২।

301 Abul Hashim, In Retrospect, Op, cit, p.146.

Dhaka University Institutional Repository

ও নতুন সভাপতি নির্বাচনের জন্য লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করা হয়।[৩০২] ইতোমধ্যে বয়োবৃদ্ধ নেতা এ কে ফজলুল হক ৩১ জানুয়ারি (১৯৪৭) এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, যদি আকরাম খাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়, তবে তিনিও লীগের সভাপতি হতে আগ্রহী।[৩০৩] এ সময় আবুল হাশিমকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার জন্য ফজলুল হক তাকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আবুল হাশিম তা করলেন না। পরবর্তীতে এটা তার জন্য বিরাট রকমের ভুল ছিল বলে তিনি স্বীকারও করেছেন। নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয় ১৯৪৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনের কয়েক দিন পূর্বে ফজলুল হক তাঁর ছেলের বয়সী আবুল হাশিমকে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে তাঁকে সমর্থন দেবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আবুল হাশিম সে অনুরোধে সাড়া দেননি।[৩০৪] এ অবস্থায় আবুল হাশিম মুসলিম লীগের সভাপতি হলে নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতাদের অবস্থান খর্ব হওয়ার আশংকা করে তাঁরা ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরীর সাথে মিলিত হয়ে আকরম খানকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর মাওলানা আবদুল্লাহেলো বাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় আকরম খাঁকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়।[৩০৫]

বস্তুত হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন খুবই লোভী মানুষ। রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতাবোধের স্থান নেই–এটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল আবুল হাশিমের সাথে বন্ধুত্বের। কিন্তু পরে প্রধানমন্ত্রীত্বের গদিতে সমাসীন হয়ে প্রথম থেকেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিভাবে আবুল হাশিমকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করা যায়। তারা উভয়ে কখনো এক হয়েছেন, আবার পরক্ষণেই পৃথক হয়ে গেছেন। আবুল হাশিম মনে করেন, লীগের সভাপতির পদ থেকে আকরাম খাঁর পদত্যাগের বিষয়টি ছিল লোক দেখানো ব্যাপার। তিনি নিজের জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য নাকি মাঝে মাঝেই পদত্যাগ করতেন; আবার তা প্রত্যাহারও করে নিতেন।[৩০৬] প্রথমে সোহরাওয়ার্দী –নাজিমুদ্দীনের যৌথভাবে আকরম খানকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার

---

302 Ibid. p. 147.

303 Ibid. p. 145.

304 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit 147; পরে তিনি এটা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের জন্য একটা বিরাট ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে স্বীকার করেন। (Abul Hashim, *In Retrospect*, Op,cit 147)

305 দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭, পৃ.২।

306 Abul Hashim, *In Retrospect*, Op, cit Pp. 147-48; দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রস্তাবের বিষয়টি আবুল হাশিম-ফজলুল হক প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে কাউন্সিল অধিবেশনের দিন নাজিমুদ্দীন কর্তৃক আকরাম খানকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র ফজলুল হক ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে নাজিমুদ্দীনকে বেঈমান বলে অভিহিতো করেন এবং পাল্টা প্রস্তাব করেন সংগঠন যাতে আকরাম খাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে নেয়। সে সময় মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে অনেক বেদনাদায়ক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল। এতে বয়োবৃদ্ধ ফজলুল হক যেমন মারাত্মকভাবে অপমানিত হন, তেমনি আবুল হাশিমও রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান। অতঃপর আকরম খার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হবে কি হবে না তা নিয়ে ভোটাভোটি হলে ফজলুল হক মাত্র ১১ ভোট লাভ করেন এবং আকরম খাঁর প্রতি সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থন থাকায় তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। লীগের সভাপতি নির্বাচিত না হওয়ার পেছনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ছিল বলে আবুল হাশিম মনে করতেন।[৩০৭]

ছুটি গ্রহণ ও রাজনৈতিক জীবনের অবসান

মুসলিম লীগের সভাপতির পদকে কেন্দ্র করে আবুল হাশিম প্রচন্ডভাবে আঘাত পান এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৭) মাওলানা আকরাম খাঁর কাছে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বর্ধমান চলে যান।[৩০৮] আবুল হাশিমের ছুটির দরখাস্তটি খাজা গ্রুপের কাছে ছিল আর্শীবাদস্বরূপ। দেরি না করে তাঁর ছুটি মঞ্জুর

---

307 এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ বলেছিলেন, "১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগের সভাপতিত্বে ইস্তফা দেন। হক সাহেব ও হাশিম সাহেবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। 'ইত্তেহাদে' আমি হক সাহেবকে সমর্থন করি। হাশিম সাহেব তখন শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক জুড়ী এবং দোর্দন্ড নেতা। তাঁকে ফেলিয়া হক সাহেবকে সমর্থন করায় হাশিম সাহেব মনে করিলেন, শহীদ সাহেবই আমাকে দিয়া হক সাহেবকে সমর্থন করাইতেছেন। আমি এই যে বুঝাইলাম, শহীদ সাহেব কোনও দিন আমার সম্পাদকীয় কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করেন না, ইশারা-ইঙ্গিতেও আমার মতামত প্রভাবিত করেন না; কোনও কথাই হাশিম সাহেব বিশ্বাস করলেন না। হাশিম সাহেবের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য শহীদ সাহেব নিজে চেষ্টা করিলেন। তাও তিনি বিশ্বাস করিলেন না।" (আবুল মনসুর আহমদ, (সম্পাঃ) পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-১৪) মফিদুল হকের মতে, "আবুল হাশিমের এই বর্ণনায় কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সভার যে বিবরণী সাপ্তাহিক মিল্লাতে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, কাউন্সিল সভাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিরসনের জন্য আগের দিন বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাসভবন থিয়েটার রোডে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারীতে পার্টির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আবুল হাশিমও উপস্থিত ছিলেন। সভায় মুসলিম লীগের ঐক্যরক্ষার স্বার্থে মাওলানা আকরাম খাঁনের পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রেক্ষিতে সভাপতি পদপ্রার্থী আবুল হাশিমও নির্বাচন হতে নাম প্রত্যাহারে সম্মত হন। ফজলুল হক সভায় উপস্থিত ছিলেন না।" (মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩)

308 মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় এবং লীগের যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাহারকে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারির দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩০৯] হাবিবুল্লাহ বাহার ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপের লোক। অভিমানী আবুল হাশিমের এই মুহূর্তের ছুটি নিছক ছুটি ছিল না, এটা ছিল এক ধরনের পদত্যাগ। আবুল হাশিমকে এর মাশুল দিতে হয়েছিল। এ সময় আবুল হাশিমের বড় ছেলে বদরুদ্দীন উমর তখন মারাত্মক টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হবার কারণে ১৪ ফেব্রুয়ারি হতে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭১ দিন সময় এভাবে পার হয়ে গেল। এই দীর্ঘ সময়ে বাঙলার রাজনীতিতে কি পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, আবুল হাশিম তার কোন খোঁজ –খবর রাখারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। রাজনীতিকদের জীবনে জোয়ার-ভাটা আসে। উত্থান–পতন রাজনীতিতে স্বাভাবিক বিষয়। আবুল হাশিমের আত্মাভিমানের কারণে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে ভাটা শুরু হয়েছিল, তাতে আর কোনদিন জোয়ার আসেনি।

465262

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

৩০৯ মফিদুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আবুল হাশিমের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আরবি চর্চা ও ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আবুল হাশিমের অবদান

ভূমিকা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুথেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরবি ভাষার চর্চা হয়ে আসছে। আবরী এদেশের মানুষের মাতৃভাষা নয়। তই তাদের দ্বারা আবরী ভাষাভাষীদের ন্যায় উন্নত মানের সাহিত্যে সৃষ্টির প্রত্যাশা করা যায় না। তথাপি ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনে এদেশের মানুষ আরবি ভাষার চর্চা করে থাকে। কারণ আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন না করলে ইসলামি সাহিত্যের মৌলিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে অসংখ্য মাদরাসা স্থাপিত হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফলে বাংলাদেশে এখন আরবি ভাষার চর্চা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। অধুনা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তাফসীর, হাদিস, ফিকহ্ আকাইদ প্রভৃতি বিষয়ে আরবি ভাষায় বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করছেন। এমনকি তাঁরা আরবি পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের আরবি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য এ অবদান সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

বাংলাদেশে আরবি চর্চার অতীত ও বর্তমান

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী[৩১০] কর্তৃক লাখনাবতী রাজ্য বিজয়ের পর মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হলে এদেশে আরবি ভাষা চর্চার সূচনা

---

310 ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী আফগানিস্তানের উত্তরে সিস্তান রাজ্যের গরমসির জেলায় এক খলজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খর্বাকৃতি ও কুৎসিত ছিলেন। দাঁড়ালে তার হাত দু'খানি হাঁটুর নিম্নভাগ স্পর্শ করত। তিনি প্রথমে মুহাম্মদ ঘুরী ও পরে সুলতান কুতুব উদ্দীনের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি বাদাউনের শাসনকর্তা মালিক হোসামুদ্দীনের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। হোসামুদ্দীন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার একাংশে একটি ক্ষুদ্র পরগনার জায়গীর দান করেন। এ সময় থেকেই তার উন্নতির সূত্রপাত হয়। শীঘ্রই স্বগোত্রীয় খলজী ও তুর্কীদের সহযোগিতায় তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসকবৃন্দকে পরাজিত করে তিনি ক্রমে ক্রমে জায়গীরের সীমা প্রসার করেন। কুতুবউদ্দীন আইবেক তার সাফল্যে আনন্দিত হয়ে তাকে নানা সম্মানে ভূষিত করেন। অতঃপর তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লাখনাবতী রাজ্য জয় করেন। ফলে বাংলাদেশ মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়।

দ্র. Dr. A. K. M. Ayyub Ali, History of Traditional Islamic Education In Bangladesh (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1993), p.5-7; ড. ইবনে গোলাম সামাদ, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৫১; ড. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ২৮; মুহাম্মদ রুহুল আমিন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭), অপ্রকাশিত পি, এইচ, ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬, পৃ. ৬৫; এ, কে, এম, নাজির আহমেদ, "বাংলাদেশে মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[৩১১] বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা থেকে মূলত আরবি ভাষার সূত্রপাত হয়। কারণ আল কুরআন, তাফসীর, হাদিস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আকাইদ, মানতিক ইত্যাদি বিষয়সহ ইসলামি সাহিত্যের সকল মৌলিক গ্রন্থাবলী আরবি ভাষায় রচিত। ফলে মুসলিম শাসকগণ আরবি শিক্ষার প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ্ স্থাপন করে আরবি শিক্ষার পথ সুগম করেন।[৩১২] প্রাথমিক অবস্থায় মসজিদে পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল।[৩১৩] মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী রাজধানী শহর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ্ নির্মাণ করে মুসলিম সমাজের ভিত রচনা করেন।[৩১৪] এসব প্রতিষ্ঠানে তখন আরবি শিক্ষা দেয়া হতো।[৩১৫] সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওয়ায খলজী তাঁর শাসনামলে (১২১৩–১২২৭ খ্রি.) লাখনাবতী ও অন্যান্য কৌশলগত স্থানে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষার চর্চা হতো বলে ধারণা করা হয়।[৩১৬]

খ্রিষ্ট্রীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-'আরাবী নামক একজন প্রখ্যাত 'আলিম বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মাহিসুনে (বর্তমানে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন চৌঘাট মৌজাস্থ মাহিসন্তোষ) একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে আরবি ও ইসলামি বিষয়াবলী পাঠদানের

শাসন" মাসিক পৃথিবী, ঢাকা: কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ডিসেম্বর, ১৯৯৮), পৃ. ৩৯; অধ্যাপক কে, আলী, বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা: আলী পাবলিকেশনস, ২১ তম সং, ১৯৯৩), পৃ. ১৬৪–১৬৬; মিনহাজ-ই সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২৬৪; বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৪ জানুয়ারী, রবিবার, ১৯৯৯; মুসলিম বাংলার জনক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী, "দৈনিক সংগ্রাম" ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৯৯; ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ" আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪), পৃ. ১৫৭–৫৯।

311 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ.১; ড. ইবনে গোলাম সামাদ, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ ৫১।

312 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১,২।

313 এ. কে. এম. নাজির আহমেদ, মাসিক পৃথিবী, জুলাই' ৯৯, পৃ. ৫১। সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মসজিদ শুধু নামায ও উপাসনার জন্যই নির্মাণ করা হত না। তাতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়াশুনাও চালু ছিল। প্রাঙ্গণের বাইরে এখনও বহু বড় বড় মসজিদে ছোট ছোট কক্ষ বিশিষ্ট হুজরা রয়েছে। এসব হুজরা' তে মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররা অবস্থান করত। অদ্যাবধি দেশের বিভিন্ন মসজিদে এ ধরনের শিক্ষা চালু আছে। প্রাচীন খানকাগুলিতেও অনুরূপভাবে লেখাপড়া ও ধর্মীয় শিক্ষা চলত। দ্রঃ মো. আব্দুস সাত্তার, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মোস্তফা হারুণ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ২৬।

314 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ পূর্বোক্ত, পৃ. ১, ২; বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ৮৩; মুহাম্মদ সিকান্দর আলী মোল্লা, জুহুদুল মুসলিমীনা ফী বাংলাদেশ ওয়া মাকানাতুহুম ফিত্ তুরাসিল ইসলামী (ঢাকা: বাংলাবাজার, ১৯৯৫), পৃ. ৫১; আলিয়া মাদ্রাসায় ইতিহাস, পৃ. ২৭; মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীতে দেওবন্দ (ঢাকা: সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯২), পৃ. ১৮৫।

315 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১,২।

316 পূর্বোক্ত, পৃ. ৩, ৪; এ. কে. এম. নাজির আহমদ, মাসিক পৃথিবী, ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা করেন।[৩১৭] ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসায় ইলম হাসিলের জন্য সমবেত হতো।[৩১৮] বিহারের বিখ্যাত সূফী মুহাদ্দিস মাখদুমুল মুলক শারফুদ্দীন আহমাদ মানিরীর শায়খ ইয়াহইয়া মানিরী এ মাদরাসার ছাত্র ছিলেন।[৩১৯]

১২৭০ কিংবা ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত পণ্ডিত শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা[৩২০] সুদূর দিল্লী থেকে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি ভাষা, হাদিস, তাফসীর, ফিকহসহ বিভিন্ন ইসলামি বিষয় চর্চার ক্ষেত্রে এক নব বিপ্লবের সূচনা হয়।[৩২১] সে সময় বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন মুগীস উদ্দীন তুঘরিল।[৩২২] শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রহ.) সোনারগাঁয়ে আগমন করার পর তিনি জনগণের মাঝে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা এ সকল নবদীক্ষিত মুসলিমদের শিক্ষাদানের জন্য সোনারগাঁয়ে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এ মাদরাসাটি উচ্চ স্তরের আরবি চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখানে হাদিস, তাফসীর এবং ফিকহ সহ ইসলামি জ্ঞানের নিয়মিতো চর্চা হতো।[৩২৩] তাঁর এ মাদরাসাটি জ্ঞান চর্চায় অনন্য ভূমিকা রাখার কারণে ঐতিহাসিকগণ এটিকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বলে

---

317 মোঃ আব্দুল করিম, মাহিসন্তোষঃ সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ২৭–৩৬; ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৮৮।

318 পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯; আব্দুল মন্নান তালিব, বাংলাদেশ ইসলাম (ঢাকাঃ ১৯৮০), পৃ. ৯৭।

319 মাহিসন্তোষঃ সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী, পৃ. ১১।

320 শায়খ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রহ.) এয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বুখারী নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময় বুখারী ও খোরাসান ছিল জ্ঞানানুশীলনের অন্যতম কেন্দ্র। শরফুদ্দীন খোরাসানেই তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেন। খোরাসানে থাকতেই তাঁর জ্ঞান গরিমা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তৎকালীন বিদ্বান সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। নানা কারণে তিনি স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে আনুমানিক ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে চলে আসেন। তাঁর জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি, সর্বোপরি ফিকহ, হাদীস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞানের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে দিল্লী ও তার আশে পাশের বহু জ্ঞানী ও গুণী তার ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তা দেখে তৎকালীন দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন (১২৬৬–১২৮৭) ভীত হয়ে উঠেন এবং তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার আশংকা করেন। আপদ দূর করার জন্য সুলতান কৌশলে শায়খ শারফুদ্দীনকে সোনারগাঁয়ে চলে যাবার পরামর্শ দেন। সুলতানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি তার সাথে বিরোধিতা করতে চাইলেন না। তিনি নির্বিবাদে সরে পড়াই যুক্তি সংগত মনে করলেন। তাই তিনি দিল্লী ত্যাগ করে সোনারগাঁয়ে চলে আসেন (১২৭০–১২৭৮ এর মধ্যে)। দ্র. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল–গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃ. ৪০৫–৪০৬; ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৯০; ড. দ্বীন মুহাম্মদ, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৯৪, ৯৫; Islam in Bangladesh Through Ages (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1995), P. 229.

321 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩,৪; মুহাম্মদ রুহুল আমীন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান, পৃ. ৮২।

322 আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৯৭।

323 পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭। আবু তাওয়ামার সোনারগাঁয়ে আগমন এবং তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী বলেন, "He (Abu Tawamah) came to Bengal in the year 668/1270 and sattled at sonargaon, near Dacca and established a great Madrasha there for the study of Quran, Hadith, Tafsir and other Islamic subjects. Cf. Dr. A. K. M. Ayyub Ali, Ibid, p. 16.

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যায়িত করেছেন।[৩২৪] কারণ এতেঠবড় শিক্ষানিকেতন ইতোপূর্বে বাংলাদেশের এমনকি উপমহাদেশের আর কোথাও স্থাপিত হয়নি। বাংলা ও ভারতের শিক্ষার্থী ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটত বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সোনারগাঁ এ দেশের ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।[৩২৫] বরং এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, সোনারগাঁয়ে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মান সম্মত ইসলামি শিক্ষায়তনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ দিক থেকে আবূ তাওয়ামাকে বাংলার ইসলামি শিক্ষা পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।[৩২৬] সোনারগাঁয়ে আরবি চর্চার ব্যাপকতার জন্য আরও একজন বিখ্যাত আরবিবিদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার একজন বিশিষ্ট শিষ্য ও তদীয় জামাতা শারফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল-মানিরী।[৩২৭] আবূ তাওয়ামা তাঁর শিষ্য আল-মানিরীকে বাইশ বছর ধরে তাফসীর, হাদিস এবং ফিকহসহ আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তা'লীম দান করে একজন সুযোগ্য পণ্ডিত হিসেবে গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে উসতাদ ও শিষ্যের যৌথ প্রচেষ্টায় সোনারগাঁয়ের ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে বাংলার মুসলমানদের ইসলামি জীবন ধারায় অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়।[৩২৮]

আরবি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাংলায় বিভিন্ন শাসক কর্তৃক অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান রুকন উদ্দিন কাইকাউসের (১২৯০-১৩০১ খ্রি.) ৬৯৮ হিজরীর (১২৯৮ খ্রি.) শিলালিপিতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ একই স্থানে প্রাপ্ত ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৩ খ্রি.) সুলতান শামস্ উদ্দীন ফিরোজ শাহ্ ও সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের শাসনামলের প্রাপ্ত শিলালিপিতেও একটি মাদরাসা স্থাপনের কথা উল্লেখিত আছে।[৩২৯] সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে (১৩৯২-১৪১০ খ্রি.) বাংলাদেশে আরবি শিক্ষার প্রসার ঘটে। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠভাবে শরী'আতের বিধি-বিধান পালন করতেন। তিনি ছিলেন

---

324 উপ সম্পাদকীয়, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ আগস্ট, শুক্রবার ১৯৯১।

325 আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৯৮; Dr. A. K. M. Ayyub Ali, Ibid, p. 16.

326 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

327 আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ১০০। শারফুদ্দীন ইয়াহইয়া আল-মানিরী ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭৮ সালে হযরত শায়খ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার ছাত্র হিসেবে তিনি সোনারগাঁয়ে আসেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। অল্প বয়সে তাঁর প্রতিভা দেখে তদানীন্তন স্থানীয় আলেম সমাজ চমৎকৃত হন। শেষ জীবনে তিনি জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। দ্র. আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম, পৃ. ৯৮, ৯৯।

328 পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯; মুহাম্মদ সিকান্দর আলী মোল্লা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮; ড. মো. আব্দুল করীম, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ১৪১।

329 আব্দুল করিম, মুসলি বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি জ্ঞান চর্চার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। বিশিষ্ট পণ্ডিত শায়খ আলাউল হক তাঁর শাসনকালে পাণ্ডুয়াতে বসবাস করেন। তিনি ও তদীয় পুত্র নূর কুতবুল আলম সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি জ্ঞান বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখেন।[৩৩০] শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহ্ এর আমলেও (১৪৭৪–১৪৮১ খ্রি.) বাংলাদেশে অনেক মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি হি. ৮৮৪/খ্রি. ১৪৭৯ সালে মাহ্দীপুর ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্তী উমরপুরে (গৌড়), 'দরসবারী' বলে কথিত একটি মাদরাসা ও তৎসংলগ্ন একটি মসিজদ স্থাপন করেন।[৩৩১]

বিখ্যাত শাসক আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্ (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রি.) আরবি ও ইসলামি শিক্ষার প্রসারে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলের এমন কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যা মসজিদ নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর জারীকৃত কোন কোন মুদ্রায় আরবিতে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলল্লাহ' কালেমা অংকিত ছিল। আবার কোনটিতে ছিল ইসলামের চার খলীফার নাম। তাঁর সময়ে গৌড়ে ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। আরবি ভাষা ও ইলমে দীনের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের নিকটবর্তী স্থানে একটি মাদরাসাও স্থাপন করেন।[৩৩২] তিনি দূর ও নিকটবর্তী এলাকা থেকে আরবি ও ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী লোকদেরকে তাঁর রাজ্যে আসার ও বসবাস করার আমন্ত্রণ জানান। ফলে বেশ কিছু আরবিবিদ অন্য দেশ থেকে এ দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।[৩৩৩] আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে ঢাকার নিকটস্থ সোনারগাঁয়েও ধর্মীয় শিক্ষার চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠে। এখানকার মসজিদ মাদরাসার প্রাচীন সৌধরাজির ভগ্নাবশেষ সে যুগের ধর্মীয় জ্ঞানানুশীলনের নীরব সাক্ষী। এছাড়া তদীয় পুত্র সুলতান নুসরত শাহের শাসনামলে (১৫১৯–১৫৩১ খ্রি.) বিখ্যাত হাদিস বিশারদ তকী উদ্দীন ইবন আইনুদ্দীন ১৫২২ সালে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে মসজিদে হাদিস, কুরআন, ফিকহ ইত্যাদি ইসলামি জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চা হতো।[৩৩৪]

সুবেদার শায়েস্তা খাঁন বাংলাদেশে আরবি ও ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বেশ অবদান রাখেন। তিনি ১৬৬৪ সাল থেকে ১৬৮০ সাল পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার ছিলেন। এ সময় তিনি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি মাদরাসা এবং মসজিদের গোড়াপত্তন করেন। এ মাদরাসা ভবনে হাসপাতাল

---

330 এ.কে.এম. নাজির আহমাদ, মাসিক পৃথিবী, জানুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ.৪৯।

331 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

332 মো. আব্দুস সাত্তার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯; এ.কে.এম.নাজির আহমদ, মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮।

333 মাওলানা মো. আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সং, ১৯৯২), পৃ.৬।

334 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

চালু করা হয়। বর্তমানে নদী তীরে একটি ভগ্ন ঘাট ও একটি মসজিদ তাঁর চিহ্ন বহন করছে। শায়েস্ত খানের অসমাপ্ত কেল্লার অনতিদূরে একখানি দ্বিতল মসজিদ আছে। এই মসজিদকে খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ বলা হয়। নীচে অনেক বড় বড় কামরা রয়েছে। এই কামরাগুলি ছাত্রদের হোটেল বা ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মসজিদের চারদিকে খোলা বারান্দা রয়েছে। এ মসজিদের নীচের অংশকে এখনও মাদরাসা হিসেবে অভিহিতো করা হয়। মসজিদের দেয়ালে কয়েক চরণ ফার্সি কবিতা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এ ধরনের আরও একটি মসজিদ ঢাকার আজিমপুরে রয়েছে। এ মসজিদ খানিও দ্বিতল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মোহাম্মদ আজম বা আজিমুশশানের নামানুসারে পরিচিত এই মসজিদের দ্বিতলের উত্তর প্রান্তে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। অদ্যাবধি মসজিদের এই অংশকে মাদরাসা বলা হয়।[৩৩৫]

ঢাকা শহরে বিভিন্ন মাদরাসা সংযুক্ত এমন অনেক মসজিদের সন্ধান মিলে যেগুলোতে এক কালে ইসলামি শিক্ষা তথা আরবি-ফার্সির চর্চা হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন। মুর্শিদাবাদের সমসাময়িক শাসক ও নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাদরাসায় ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞান তথা আরবি-ফার্সি র অনুশীলন সঞ্জীবনী লাভ করে। মুর্শিদকুলী খান একজন ধর্মপ্রাণ সুবেধার ছিলেন। আলীবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদী জ্ঞানীদের কদর করতেন। তিনি তাঁর শাসনকালে (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) আযীমাবাদ (পাটনা) থেকে 'আলিম-ফাজিলদের আমন্ত্রণ করে মুর্শিদাবাদে এনেছিলেন। বর্ধমান জেলাতেও আরবি চর্চা হতো ব্যাপকভাবে। এখানকার বুহার মাদরাসা ও গ্রন্থাগারটি ছিল মুনশী সদরুদ্দীন আহমাদ প্রতিষ্ঠিত আরবি-ফার্সি চর্চার বিশাল কেন্দ্র। কলিকাতা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার (১৭৮০) সতের বছর পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তায় ১৭৬৪-৬৫ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এ মাদরাসা ও এ গ্রন্থাগারটি বাংলায় ইসলামি শিক্ষা চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।[৩৩৬]

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল আরবি চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্বেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। তাঁরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে খানকা ও আস্তানা স্থাপন করে ইসলামের অমিয় বাণী প্রচার করেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে অনেক মাদরাসা স্থাপিত হয়।[৩৩৭] এসব মাদরাসা সমূহের মধ্যে মীর ইয়াহইয়ার মাদরাসাকে ধর্মীয় ও আরবি শিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে

---

335 মো. আব্দুস সাত্তার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০, ৩১; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬,৭।

336 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭-৯।

337 এ. কে.এম. মুহিউদ্দীন, চট্টগ্রামে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

গণ্য করা হতো। এছাড়া এ নগরীতে বিভিন্ন সময়ে দীনী শিক্ষার প্রসারকল্পে অনেক মাদরাসা স্থাপিত হয়।[৩৩৮]

চট্টগ্রামে আরবি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের অন্যতম কারণ হলো এই যে, এখানে অনেক আরব সূফী-সাধক ইসলাম প্রচার করার পর স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে তাঁদের ভক্ত ও অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। এতেঠদ্ব্যতীত তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ এ নগরীর বিভিন্ন স্থানে জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়েন।[৩৩৯] এভাবে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গৌড়, পাণ্ডুয়া, বিহার, মঙ্গলকোট, কলিকাতা, ঢাকা, সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম ও হাটহাজারীতে আরবি-ফার্সী ভিত্তিক অনেক ইসলামি কেন্দ্র গড়ে উঠে।[৩৪০] ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শুধু বাংলাদেশে আশি হাজার মক্তব কায়েম ছিল এবং প্রতি চারশ লোকের জন্য একখানা মাদরাসা স্থাপিত হয়েছিল। এসব মাদরাসা থেকে হাজার হাজার বিজ্ঞ আলিম-ফাযিল বের হন, যাঁরা পরবর্তীকালে আরবি, উর্দূ ও ফার্সি ভাষায় শত শত ইসলামি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।[৩৪১] এভাবে সুলতানি ও মুঘলো শাসনামলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মাদরাসা স্থাপিত হয়। সুলতানগণ মাদরাসা পরিচালনার জন্য লা-খারাজ সম্পত্তি বরাদ্দ করতেন। এছাড়া নগদ অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন।[৩৪২]

আরবি ও ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের পাঠ্য তালিকা

বর্তমান যুগের আরবি শিক্ষালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি আর বৃটিশ আগমনপূর্ব যুগের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আজকাল গোটা পাঠ্যসূচিকে যেমন বাৎসরিক বা দ্বিবাৎসরিক বা ত্রৈবাৎসরিক ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সময়সীমা নির্ধারিত করে শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হচ্ছে অতীতে তেমন কোন শ্রেণীবন্ধন বা বাঁধা-ধরা সময়সূচীর অনুশাসন ছিল না। সে সময় সাধারণত পাঠ্য বিষয়গুলোর জন্য বাছাই করা গ্রন্থসমূহকে মানের দিক থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হতো। এক গ্রুপভুক্ত গ্রন্থ কয়টির অধ্যয়ন শেষ করা হলে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গ্রুপ বা শ্রেণিতে উত্তীর্ণ বলে পরিগণিত করা হতো। এ পদ্ধতি অনেকটা উপমহাদেশের বর্তমান কওমী মাদরাসা সমূহে পরিলক্ষিত হয়।[৩৪৩]

---

338 তদেব, পৃ. ৯৩।
339 তদেব, পৃ. ৬৯, ৭০।
340 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।
341 এ. কে. এম. মুহিউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২।
342 মাওলানা মুশতাক আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫, ১৮৬
343 ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী আমলে বাংলাদেশের আরবি শিক্ষাব্যবস্থা বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার আলোকে প্রণীত হয়েছিল। নিম্নে সুলতানী আমলে বাংলাদেশের আরবি শিক্ষালয়ের পাঠ্যসূচি উল্লেখ করা হলো:

১.	তাফসীর	:	মাদারিক আত-তানযীল, আনওয়ার আত-তানযীল (বায়দাবী), আল-কাশশাফ।
২.	হাদিস	:	মাশারিকুল আনওয়ার, মাসাবীহুস সুন্নাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ (সম্পূর্ণ), শামায়িলুত তিরমিযী (সম্পূর্ণ), সহীহুল বুখারী (কিয়দংশ)
৩.	ফিকহ্	:	আল-হিদায়া, হুসামী, তাওযীহ্ ওয়া তালবীহ্ -এর কিয়দংশ
৪.	উসূলুল ফিকহ্	:	মানার ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ, উসূলুল বাযদাবী।
৫.	কালাম	:	শারহু আকাইদি নাসাফী, শারহু সাহায়িফ, তামহীদ।
৬.	মানতিক	:	শরহ্-ই শামসিয়াহ, শরহ-ই মাতালি।
৭.	দর্শন	:	শরহ্-ই হিদায়াতুল হিকমাহ।
৮.	সাহিত্যে	:	মাকামাতে হারীরী।
৯.	নাহু	:	মিসবাহ, কাফিয়া, লুবলুল আলবাব, ইরশাদ, শরহ-ই জামী।
১০.	বালাগাত	:	মুখতাসারুল মা'আনী, মুতায়াল।
১১.	জ্যোতির্বিদ্যা ও অংক	:	কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
১২.	চিকিৎসা শাস্ত্র	:	আল-কানূন (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)।[৩৪৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপরোক্ত পাঠ্যসূচিতে সামান্য রদবদল ঘটে। এ সময় লখনৌতে মোল্লা নিযামুদ্দীন ছাহালভী (১০৮৯-১১৬৯ খ্রি.) কর্তৃক নতুন ধরনের 'দরসে নিযামিয়া'র সিলেবাস প্রবর্তন হয়। লখনৌ'র দরসে নিযামিয়ার উক্ত পাঠ্যসূচি ছিল নিম্নরূপ:

১.	তাফসীর	:	জালালাইন, বায়দাবী।
২.	হাদিস	:	মিশকাতুল মাসাবীহ
৩.	ফিকহ	:	শারহুল বিকায়াহ (১ম দুই খণ্ড), আল-হিদায়াহ (শেষ দুই খণ্ড)।

[৩৪৪] তদেব, পৃ. ১২-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪.	উসূলুল ফিকহ	:	নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ ওয়া তালবীহ, মুসাল্লামুস সুবূত।
৫.	কালাম	:	শারহু আকাইদি নাসাফী, মীর যাহিদ, শারহুল মাওয়াকিফ।
৬.	মানতিক (যুক্তিবিদ্যা)	:	সুগরা, কুবরা, ঈসাগুজী, তাহযীব, শরহি তাহযীব, কুতবী, সুল্লামুল-উলূম।
৭.	হিকমতো (বিজ্ঞান)	:	মায়বুযী, সদরা, শামস বাযিগাহ।
৮.	আরবি ব্যাকরণ	:	ক) সরফ: মীযান মুনশাইব, সরফমীর, পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদাহ, ফুসূলে আকবরী ও শাফিয়াহ্। খ) নাহু: নাহুমীর, শরহে মিআতে 'আমিল, হিদায়াতুল নাহু, কাফিয়া ও শরহে জামী।
৯.	অংক	:	খুলাসাতুল হিসাব, তাহ্রীব-ই অকলীদাস্ (প্রথম মাকালাত), তাশরীহুল আফলাত, রিসালাহ্-ই কুশজিয়াহ্, শরহ-ই চগমনী (১ম অধ্যায়)।
১০.	বালাগাত	:	মুখতাসারুল মা'আনী, মুতাওউয়াল।

নিযামুদ্দীন ছাহালভী প্রণীত দরসে নিযামিয়া এর সিলেবাস গোটা উপমহাদেশের আরবি শিক্ষার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লখনৌর দরসে নিযামিয়ার প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করলে উপমহাদেশে বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়।[৩৪৫] তবে লখনৌর দরসে নিযামিয়ার উপরোক্ত সিলেবাস পরবর্তীকালে কিছুটা পরবর্তিত হয়। এই পরিবর্তিত সিলেবাস অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল; যা বর্তমান যুগেও চালু আছে। দরসে নিযামিয়া লখনৌর সিলেবাস এর যে অংশ পরিবর্তিত হয়েছে তা হলো হাদিস এর জন্য মিশকাতুল মাসাবীহ-এর স্থলে সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (রহঃ), জামি আত-তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসায়ী এবং সুনানে ইবন মাজাহ্। অনুরূপভাবে আরবি আদব (সাহিত্যের) এর জন্য নাফহাতুল ইয়ামান, সাব'আ মু'আল্লাকাহ্, দীওয়ান-ই মুতানাব্বী, মাকামাত-ই হারীরী ও হামাসাহ্ পাঠ্যভুক্ত করা হয়।[৩৪৬]

---

345 পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫, ১৬; মো. আব্দুস সাত্তার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩, ৫৪; Dr. A. K. M. Ayyub Ali, op. cit. p. 35-37.

346 মো. আব্দুস সাত্তার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬, ৫৭; ড. মুহাম্মদ আব্দুল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৭ সালে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে বৃটিশরা এদেশ দখল করে নিলে আরবি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের উপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে। তারা আরবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত লাখারাজ সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত করে এবং আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেয়। এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে এদেশের মুসলমানগণ আরবি শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এদিকে বৃটিশরা এদেশে আধিপত্য স্থাপন করলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দ্রুত কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। তাই চিরাচরিতভাবে রাজস্ব ও বিচার বিভাগে মুসলিম আইন বলবৎ ছিল। মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধান কল্পে ওয়ারেন হেস্টিং (১৭৭২-৮৫) ১৭৮০ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা স্থাপন করেন।

এই মাদরাসায় অধ্যয়ন করে আরবি-ফার্সি ভাষায় দক্ষ জনবল, মুসলিম আইনে অভিজ্ঞ বিচারক, মূল্য নির্ধারক, কর নির্ধারক ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে প্রশাসনিক প্রয়োজন পূর্ব করবে এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কলিকাতা আলিয়া মাদরাসাতেও ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দরসে নিযামিয়ার সিলেবাস বলবৎ ছিল। কিন্তু কিছু দিন পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সিলেবাস থেকে তাফসীর ও হাদিস বাদ দেয় এবং ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১১৮ বছর এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। আর্ল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সরকারী মাদরাসায় হাদিস ও তাফসীরের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ সময় কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় টাইটেল ক্লাস খোলা হয়।[৩৪৭]

১৯৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় মুসলিম জাতির প্রতি ইংরেজ সরকারের আচরণ প্রতিহিংসার রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে মুসলিম জনসাধারণ ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। তখন তারা ইসলামি তথা আরবি শিক্ষাকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে কওমী মাদরাসা গড়ে তোলে। এ সকল কওমী মাদরাসা সমূহের মধ্যে সাহারানপুর, দেওবন্দ (১৮৬৬ খ্রি.), দিল্লী, লখনৌ এবং রামপুরের মাদরাসার নাম উল্লেখযোগ্য। বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী আজও এসব প্রতিষ্ঠানে গমন করে তাফসীর ও হাদিস তথা আরবি চর্চা করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

মুসলমানদের উপর থেকে ইংরেজদের ক্ষোভ কমে গেলে ১৮৭৪ সালে লেফটেন্যান্ট ক্যাম্পবেল বাংলার বিভিন্ন স্থানে নতুন আরও কয়েকটি মাদরাসা স্থাপন করেন।

---

[347] মাওলানা মুশতাক আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬; ড. মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২২; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, "মাদরাসা শিক্ষা" ত্রৈমাসিক বিচয়ন, ঢাকা, বাংলাদেশ, জুলাই, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন বাংলাদেশে হুগলী মাদরাসা, ঢাকা মাদরাসা, চট্টগ্রাম মাদরাসা এবং রাজশাহী মাদরাসা। এসব মাদরাসায় ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি আরবির চর্চা হতো। তবে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সম্যক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি গ্রহণ না করে তাফসীর ও হাদিস শিক্ষার সহায়ক বিষয়রূপে আরবি সাহিত্যে পড়ানো হতো। আরবি সাহিত্যের এই অনুপযোগী পরিবেশেও উনিশ ও বিশ শতকে বেশ কিছু সংখ্যক আরবিবিদ ও আরবি কবি-সাহিত্যিক বাংলাদেশে জন্ম লাভ করে। তাঁদের মধ্যে আবূ মুহাম্মদ আব্দুল কাদের সিলেটী, আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী, আব্দুর রহমান কাশগরী, আব্দুর রশীদ পাবনাবী, মুফতী আমীমুল ইহ্সান ও আলাউদ্দিন আল-আযহারীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের পর ইংরেজ সরকার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও আরবি শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এতেঠদুদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগ খোলা হয়। আরবি চর্চার ক্ষেত্রে এ বিভাগটি আজও বিরাট ভূমিকা রাখছে।[৩৪৮]

আরবি শিক্ষার ধারা আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে মাওলানা আবূ নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩) প্রাচীন আরবি শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে ১৯১০ সালে একটি নিউস্কীম শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করেন। উক্ত পরিকল্পনা ১৯১৪ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯১৫ সালে তা বাস্তবায়িত হয়। এ স্কীমের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিক্ষাসূচীতে ইংরেজিতে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ফার্সি শিক্ষাকে বাদ দেয়া হয়। চারটি সরকারী মাদরাসা, পাঁচটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাদরাসা ও বেশ কয়েকটি প্রাইভেট মাদরাসা এ স্কীমের অন্ত র্ভুক্ত হয়। কলিকাতা মাদরাসাকে এ স্কীমের বাইরে রাখা হয়। এ স্কীমের জন্য যে পাঠ্যসূচীর সুপারিশ করা হয় তা ছিল-কুরআন, হাদিস, উর্দু, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি, আরবি, ড্রইং (অংকন), সূচিকর্ম (Hand Work) ও ড্রিল। সিনিয়র ক্লাসের পাঠ্যসূচীতে আরবি, ইংরেজি ও অংকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নিউ স্কীম মাদরাসা প্রবর্তনের ফলে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। এ স্কীমের অধীনে ড. এস. এম হুসাইন, ড. সিরাজুল হক, ড. সাজ্জাদ হোসেন, ড. মফিজ উল্লাহ, কবীর, ড. এম. এ. বারী, জনাব এ. এফ. এম. আব্দুল হক, ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, মাওলানা ইয়াকূব শরীফ, জনাব, এ.এস.মাহমুদ, অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন প্রমুখ খ্যাতনামা আরবিবিদ ও ইসলামি শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ পড়াওনা করেছিলেন।[৩৪৯]

---

৩৪৮ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪,২৯।

৩৪৯ তদেব, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

নিউস্কীম মাদরাসার পাঠ্যসূচীতে আরবি সাহিত্যের জন্য যেসব গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা ওল্ড স্কীম মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত আরবি সাহিত্যের গ্রন্থসমূহ থেকে মানের দিক দিয়ে কোন অংশে উন্নত ছিল না। তবুও এ স্কীমের সাধারণ শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি লাভের ফলে ওল্ড স্কীমের সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাইতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অধিকতর জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। এ স্কীমভুক্ত মাদরাসার শিক্ষকরা প্রয়োজনের তাগিদে আধুনিক পদ্ধতিতে বেশ কিছু আরবি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁদের এ পদক্ষেপ বাঙালি লেখকদেরকে আরবি পুস্তক রচনায় উৎসাহিতো করে। এটা ছিল জাতীয় আরবি সাহিত্যে সৃষ্টির বিশেষ একটি অভিযান। এ দিক থেকে মাওলানা মূসা (১৮৮২-১৯৬৪), মাওলানা আবূ নসর ওহীদ প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এভাবে আলিয়া মাদরাসা ও নিউস্কীম মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফলে এদেশের আরবি শিক্ষার ধারা অব্যাহতো থাকে। বৃটিশ শাসকরা তাদের পূর্বের সুলতানী আমলের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা সমূহের লাখারাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কারণে এবং অনুদান বন্ধ করার কারণে মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাবার ফলে আরবি চর্চা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল আলিয়া মাদরাসা ও নিউস্কীম মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফলে সে ক্ষতি অনেকটা পূরণ হয়।[৩৫০]

কিন্তু বৃটিশ সরকার কর্তৃক আরবি চর্চার এই ব্যবস্থাপনা মুসলিম জনসাধারণের চাহিদা পুরোপুরি মিটাতে সক্ষম হয়নি। তাই উত্তর ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিসাব ও শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণে ১৯০১ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সর্বপ্রথম কওমী মাদরাসা 'মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী' স্থাপিত হয়। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাত্র আট বৎসরের মধ্যেই ১৯০৮ সালে উচ্চ পর্যায়ে তাফসীর ও হাদিস শিক্ষার সূত্রপাত হয়। এ সময় এ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদিস খোলা হয়।[৩৫১] ফলে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নিয়মিতো সিহাহ্ সিত্তাহ্ এর দরস কায়েম হয়। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁরা সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন তারা হলেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ, মাওলানা আব্দুল হামীদ এবং সূফী আজিজুর রহমান। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর এদেশে আরবি চর্চার দিগন্ত প্রসারিত হয়।[৩৫২] এর পাঠ্যসূচী নিম্নরূপঃ

১. 'ইলমুত তাওহীদ, 'ইলমুর রিসালাত, 'ইলমুল আখিরাত এ তিনটি বিষয়কে সমষ্টিগতভাবে ও উসূলুত তাফসীর।

২. 'ইলমুত তাফসীর ও উসূলুত তাফসীর।

---

350 তদেব, পৃ. ৩২; তাহরীকে দেওবন্দ, পৃ. ১৮৬।

351 "দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী: ইতিবৃত্ত, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য" দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৮ এপ্রিল ১৯৯৫।

352 তদেব।

Dhaka University Institutional Repository

৩. 'ইলমুল হাদিস ও উসূলুল হাদিস।

৪. 'ইলমুল ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ।

৫. 'ইলমুল মা'রিফাত বা তাসাউফ তত্ত্ব।

৬. 'ইলমুল ফারাইয (উত্তরাধিকারী আইন)

৭. 'ইলমুল ফাতাওয়া।

৮. তাজবীদ।

৯. 'ইলমুল আদাবিল 'আরাবী (আরবি সাহিত্যে)

১০. উর্দূ সাহিত্যে

১১. ফার্সি সাহিত্যে

১২. 'ইলমুত তারীখ (ইতিহাস)

১৩. 'ইলমুল ইকতিসাদ (অর্থনীতি)

১৪. 'ইলমুল হাইয়াত (সৌরবিজ্ঞান)

১৫. 'ইলমুল মানতিক (যুক্তিবিদ্যা)

১৬. 'ইলমুল বালাগাত

১৭. 'ইলমুল ফালাসাফা (দর্শন)

১৮. 'ইলমুল আরূয (ছন্দ বিজ্ঞান)

১৯. 'ইলমুল নাহু।

২০. 'ইলমুল সরফ।

২১. বৈষয়িক বিদ্যা–বাংলা, অংক ইংরীজ, ভূগোল, ইতিহাস ও পৌর বিজ্ঞান প্রভৃতি।[৩৫৩]

হাটহাজারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও এ পদ্ধতিতে আরও অসংখ্য মাদরাসা স্থাপিত হয়। বর্তমানে ছোট বড় কওমী মাদরাসার সংখ্যা চার হাজারের অধিক। এ সকল মাদরাসার মধ্যে ঢাকার জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদরাসা, চট্টগ্রামের পটিয়া কাসেমূল উলুম মাদরাসা, সিলেটের হুসাইনিয়া আরাবিয়া মাদরাসা, ময়মনসিংহের আশরাফুল উলুম বালিয়া মাদরাসা, ফেনীর হোসাইনিয়া দারুল উলুম উলামা বাজার মাদরাসা, কুমিল্লা দারুল উলুম বরুড়া মাদরাসা,

---

৩৫৩ "দারুল উলুম হাটহাজারীর পাঠ্য তালিকা", দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৮ এপ্রিল, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

যশোরের এজাজিয়া দারুল উলুম রেলওয়ে স্টেশন মাদরাসা এবং বগুড়ার জামিল মাদরাসার নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৫৪]

অপর দিকে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসাকে (পরে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা) কেন্দ্র করে এ দেশে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার সমজাতীয় মাদরাসা। এসব মাদরাসায় বর্তমানে আরবি চর্চা হচ্ছে রীতিমতো। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণ করার ফলে শিক্ষার্থী আরবি ভাষা চর্চার সুযোগ ভাগের চাইতে কিছুটা বেশি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭৩৭৩ (সাত হাজার তিনশত তিয়াত্তর) মাদরাসা চালু আছে। তন্মধ্যে ৪৪৮৩৯ টি দাখিল, ৯৯৭ টি আলিম, ৯৫৩ টি ফাযিল ও ১২৬ টি কামিল মাদরাসা রয়েছে। সরকারী বিমাতাসূলত আচরণ ও অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আলিয়া মাদরাসার সংখ্যা ১৯৬০ থেকে ২০০২ পর্যন্ত মোট ৩৫ বছরে ৪৯১ থেকে ৭৩৭৩ এ উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র তিনটি কামিল পর্যায়ের মাদরাসা সরকার পরিচালিত। সরকারি মাদরাসা তিনটি হলো–

১. মাদরাসা–ই আলিয়া ঢাকা (১৯৪৭)

২. সিলেট আলিয়া মাদরাসা ও

৩. বগুড়া মুস্তাফিবিয়া আলিয়া মাদরাসা (১৯৯০)

বর্তমান পাঁচটি স্তরে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। স্তরগুলো নিম্নরূপ:

১. ইবতেদায়ী (প্রাইমারী) – পাঁচ বছর

২. দাখিল (মাধ্যমিক) – পাঁচ বছর

৩. আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) –২ (দুই) বছর

৪. ফাযিল (স্নাতক) – ৩ (তিন) বছর

৫. কামিল (স্নাতকোত্তর) – (দুই) বছর

১৯৮৫ সাল হতে দাখিলকে এস.এস.সির এবং আলিমকে ১৯৮৭ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এর সমমান সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ফাজিল ও কালিম ডিগ্রীকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতো সম্পন্ন কমিটি কাজ করে সুপারিশ পেশ করে।[৩৫৫] এ সুপারিশের ফলে বর্তমানে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে ফাযিলকে সম্মান ও কামিলকে মাস্টার্সের মান প্রদান করা হচ্ছে।

---

354 মাওলানা মুশতাক আহমাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬, ১৮৭।

355 ত্রৈমাসিক বিচয়ন, জুলাই, ৯৮, পৃ. ৩৪, ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল শ্রেনীতে আরবি সাহিত্যেব বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হচ্ছে। যেমন আরবি কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, আত্মজীবনী, আরবি ব্যাকরণ প্রভৃতি।

বর্তমান আলিয়া নিসাবের মাদরাসাগুলোর পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ:

১. আল-কুরআন-অনুবাদ এবং তাফসীর
২. আরবি সাহিত্যে (আধুনিক ও প্রাচীন গদ্য ও পদ্য)
৩. ইসলামের ইতিহাস
৪. বাংলা, ইংরেজি ও উর্দূ সাহিত্যে
৫. আকাইদ
৬. ফিকহ (ইসলামি আইন শাস্ত্র)
৭. উসূলুল ফিকহ (ইসলামি আইন শাস্ত্রের মূলনীতি)
৮. আরবি ব্যাকরণ (নাহু এবং সরফ)
৯. গণিত
১০. সামাজিক বিজ্ঞান
১১. আল-হাদিস
১২. উসূলুল হাদিস
১৩. ফারাইয
১৪. মানতিক (যুক্তিবিদ্যা)
১৫. আরবি রচনা ও অনুবাদ
১৬. পদার্থ বিদ্যা
১৭. রসায়ন
১৮. উদ্ভিদ বিদ্যা
১৯. উসূলুত তাফসীর
২০. তাসাউফ
২১. ইসলামি অর্থনীতি
২২. আরবি ভাষার ইতিহাস।[৩৫৬]

---

[356] Dr. A. K. M. Ayyub Ali, op. cit. p. 208-213.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি মূল্যবোধ/দর্শনে আবুল হাশিমের চিন্তাধারা

আবুল হাশিমের দৃষ্টিতে ইসলামের স্বরূপ

আজকের যুগটাকে অনেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার বস্তুগতভাবে মানবজাতিকে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের অনেক কিছুই দিয়েছে। দুনিয়া আজ সভ্যতা ও উন্নতির এক চরম শিখরে আরোহণ করেছে। পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। এতেঠদসত্ত্বেও সৃষ্টি জগতের অনেক রহস্যই মানুষের পক্ষে এখনও উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে মানবজাতি অনেক কিছু লাভ করলেও একটি অভাববোধ মানুষকে তাড়িয়ে ফিরছে। আর সেই অভাবটি হচ্ছে মানুষের সত্যিকার অধিকার এবং মর্যাদা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মানুষে মানুষে বৈষম্য, বঞ্চনা, মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য অব্যাহতো গতিতে চলছে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে হানাহানি সংঘাত সংঘর্ষ মানুষের আস্তি ও স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। যুদ্ধোন্মাদনা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, পারমাণবিক শক্তি মানব সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলেছে। মানব জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আজও দেশে দেশে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিতেঠ হচ্ছে। নিরীহ নির্দোষ নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধের রক্ত ঝরছে। ইসরাইল রাষ্ট্র আজ 'আরব জাহানে বিষফোড়স্বরূপ। মুসলিম অধ্যোষিত দেশ ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাক পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আজ আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক স্থানেই আজ অশান্তি বিরাজ করছে। এই অশান্তির উত্তাপে গোটা পৃথিবী কমবেশ আক্রান্ত। সর্বত্রই আজ যুদ্ধংদেহী মনোভাব চলছে। বড় রাষ্ট্রগুলো আধিপত্যবাদ বিস্তারের লক্ষ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে লক্ষ লক্ষ বনী আদমকে পিসে মারছে। বিশ্ব-বিবেক রক্তপাত রোধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

আবুল হাশিম বলেন, যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘের ভূমিকা দেখে এটাই মনে হচ্ছে যে, এ সংস্থাটি যেন যুদ্ধ বন্ধের পরিবর্তে যুদ্ধকে আরো উস্কে দিচ্ছে। জাতিসংঘ যুদ্ধ বন্ধের কথা বললেও মূলত তারাই যুদ্ধ জিইয়ে রাখছে। এ সংস্থাটি আজ বিশ্ব মোড়লদের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের লোক দেখানো শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আবুল হাশিম আধুনিক মহিলোার ঠোঁটের লিপস্টিকের সাথে তুলনা করেছেন।[৩৫৭]

---

[357] Abu Hashim, The Creed of *Islam*, *Opcit*. p. 3-4.

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিমের মতে, বিশ্বের মানুষ আজ হায়েনাদের হাতে বন্দি। এদের হাত থেকে মানুষ আজ মুক্তি চায়। মানব জাতি আজ শান্তির জন্য পাগল প্রায়। কোন সংস্থাই এ পর্যন্ত মানুষকে আশান্বিত করতে পারেনি। কেবলই প্রতারণার ফাঁদে মানুষ আটকে পড়ছে। এক কারাগার থেকে মুক্তি পায় তো, অন্য কারাগারে আটকে পড়ে। এভাবে চলে অবিরাম কারা পরিবর্তন। কিন্তু তাতেও সেই শান্তির ঠিকানা? আবুল হাশিম সেই শান্তির ঠিকানা খোঁজ করার চেষ্টা করেছেন।[৩৫৮]

প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম ধর্মের [৩৫৯] যে সব বিধিবিধান আমরা যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছি সেই ধর্ম কি পারে মানবতাকে এই বিপণ্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে?

বস্তুত যুগ যুগ ধরে এসম্পর্কে নানান মতো চলে আসছে। আঠার ও উনিশ শকতের বৈজ্ঞানিকরা বৈষয়িক সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে এই ধারণা করে বসল যে, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলেছেন, এখন বিজ্ঞানের যুগ আসায় ধর্ম অচল হয়ে গেছে। [৩৬০] কার্লমার্ক্স ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করেছেন। শূন্যতাবাদী বা নাস্তিকরা শুধু বস্তু বা জড়তাবাদকেই হাকীকত বলে মনে করে। তাদের কাছে ধর্ম হলো জোর-জুলুমের হাতিয়ার।

ধর্মের এই নানামুখী প্রেক্ষাপটে আবুল কাশিম বলেন,কালের বিবর্তনে ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ স্বাধীনতা চায়, এটা মানুষের স্বভাব। কিন্তু ধর্মে আছে অনেক বিধি-নিষেধ। তাই মানুষ ধর্ম পালন করতে গেলে সে অনেক সময় তার স্বাধীন ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে পারে না। ধর্মই এক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তাই ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি মনে করেন, Nihilism তথা শূন্যতাবাদ মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু ধর্ম তথা ইসলাম সে স্বাধীনতা খর্ব করে। ইগো যা করতে চায়, শূন্যতাবাদ তা সমর্থন করে কিন্তু ধর্ম সেই ইগোকে লালন করতে দেয় না। আবুল হাশিম বলেন, ধর্ম আছে বলেই সমাজ টিকে আছে। তিনি মনে করেন, আধুনিককালেও অনেকে ধর্ম বলতে কতগুলো নীতিতে অন্ধবিশ্বাস করাকে বোঝে থাকেন। তাদের কাছে ধর্ম হলো, আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা এবং আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক কি, সে সম্পর্কে জানা। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য

---

358 Ibid,p.7.

359 ধর্মের শব্দটি 'ধৃ' ধাতু হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হচ্ছে 'ধারণ করা'। অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধারণ করে যে সব নিয়ম- নীতি তাকেই ধর্ম বলা হয়। সে নিয়ম-নীতি, তরিকা-পদ্ধতিগুলো চাই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধীয় হোক, চাই পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সম্পর্কীয় হোক। যারা একাজগুলো করছে তারাই হলো – ধার্মিক। (মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, তাফসীরে সূরা ফাতিহা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫-৩৬) এর অর্থ ঘতর্থ ঘচ্ছে '

360 সূরা আল-বাকারা

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের আওতার বাইরে। তাদের মতে, ধর্মের বিষয়টি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যা মানুষের ব্যক্তিগত 'ইবাদত-বন্দেগীর সাথে সম্পৃক্ত, পার্থিব জগতের কর্মকাণ্ড সুখ-দুঃখের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ মতে, পারলৌকিক চিন্তাই ধর্মের শেষ ও চরম লক্ষ্য। ধর্মে বিশ্বাসী এ সকল মানুষের ধারণা হলো, ইহকাল রাষ্ট্রের উপর এবং পরকাল ধর্মের উপর ন্যস্ত। ব্যক্তি জীবন স্রষ্টার এবং সমাজ জীবন রাষ্ট্রের। আবুল হাশিম তাদের এ ধারণা সম্পর্কে লিখেছেন :

"Life is divided into two water- tight compartments namely, private life and public life. Private life is entrusted to God and public life to the king"[361]

আবুল হাশিম বলেন, এই যদি ধর্মের অর্থ হয় যে, তবে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই যে এর প্রতি অনাকৃষ্ট থাকবেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি মনে করেন, ধর্ম সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের জন্য ইউরোপের ধর্মযাজক সম্প্রদায় এবং প্রাচ্যের এক শ্রেণির মোল্লাদেরকেই দায়ী করেছেন। একদিকে চার্চরা ধর্মকে তাদের গীর্জার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছেন, অন্যদিকে এক শ্রেণির মোল্লা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। আমরা প্রতিদিন মোনাজাতে বলে থাকি :

অর্থ ঃ হে প্রতিপালক, আমাদের দুনিয়াতে মঙ্গল দান করুন এবং পরকালেও।[৩৬২]

কুর'আনের উপরিউক্ত বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দীন ও দুনিয়া পরস্পর সম্পৃক্ত। আবুল হাশিম মনে করেন, ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা। তাঁর মতে, আরবি 'দীন' ও সংস্কৃত ধর্মকে 'রিলিজিয়ন' [৩৬৩] বলে তরজমা করে ভুল করা হয়েছে।

---

361 কুতুব মুহাম্মদ, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন (সম্পাঃ) ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ, ৭।

362 Abul Hashem, The Creed of Islam, Opcit, p.15 অর্থ ঃ জীবনকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই সম্পূর্ণ দুটি পৃথক অংশে ভাগ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের ভার অর্পণ করা হয়েছে আল্লাহর উপর আর সামাজিক জীবনের ভার রাজার উপর। (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত , পৃ.১১. অনুবাদে ইষৎ পরিবর্তন।)

363 আল- কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২০১।

শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) লিখেছেন যে, যারা ইংরেজি ভাষায় হর্তাকর্তা তাদের কাছে শব্দের অর্থ অতি সংকীর্ণ। আমরা দীন শব্দের অনুবাদ করে আমাদের ধর্মের গণ্ডীকে সংকুচিত করতে রাজি নই। তারা কে শুধু গীর্জার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখতে চায়। গীর্জার বাইরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে তারা ধর্মের ব্যাপারে তারা ধর্মের ব্যবহার করতে নারাজ। অথচ ইসলাম আমাদেরকে বাধ্য করে, যেমন মসজিদে,হাটে-বাজারে,মাঠে-ময়দানে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ব্যাপারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে, সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করতো। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হল, মানুষকে সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। কখনও আল্লাহর আনুগত্য, আবার কখনও নফসের, কখনো শয়তানের, ব্যক্তিগত স্বার্থে,অর্থের,রাজা- বাদশার,পাদরী-পুরোহিতের আনুগত্য ইসলাম শিক্ষা দেয় না; বরং এক প্রকার শিরক বলেই ইসলাম ঘোষণা করে। কাজেই দীন শব্দের অনুবাদ করা আদৌ সঙ্গত হবে না। (শামসুল হক ফরিদপুরী , মাওলানা, সূরা ফাতিহার তফসীর, পূর্বোক্ত , পৃ.৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত রিলিজিয়ন, দীন ও ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা নয়, বরং অপব্যাখা। দীন ও ধর্ম বলতে বোঝায় প্রকৃতির নিয়ম সমষ্টি, যা দ্বারা বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্ব এক অখণ্ড সত্তা। সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু, একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল।[৩৬৪] আবুল হাশিম মনে করেন, ইসলাম নিছক একটি রিলিজিয়ন নয়। আজকাল বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতপক্ষে ইসলাম তা-ই। প্রাচ্যের মোল্লা ও পাশ্চাত্যের পাদ্রীদের অপব্যাখ্যার কারণেই ধর্ম হয়েছে সর্বজন নিন্দিত। আসল অর্থে ধর্ম অলৌকিক কিছু নয়, কিংবা যুক্তির প্রতি বা স্বাধীনভাবে জ্ঞান আহরণের প্রতি শত্রুভাবাপন্নও নয়। ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতি অনুযায়ী বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে।[৩৬৫] আবুল হাশিম বলেন, ইসলাম ধর্ম হলো বিশ্বাস আর কর্মের সমন্বিত রূপ। ইহকাল ও পরকালের সকল বিষয়ই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। নিজের সুবিধামতো কিছু গ্রহণ করা আর কিছু বর্জন করা ইসলাম অনুমোদন করে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

তোমরা কি কুরআনের কিছু কিছু নির্দেশের উপর ঈমান আনছ, আর কিছু কিছু নির্দেশকে অস্বীকার কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোর শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।[৩৬৬]

ইসলাম নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সাদকা, ফিতরাত সর্বস্ব নয়। এগুলো ইসলামের একটা অংশ মাত্র। ইসলাম মানুষের পুরো জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কোন মুসলমান তার জীবনকে খণ্ডিত করে একটি অংশে ইসলাম মানবে এবং অপর অংশে ইসলামকে মানবে না এটি করার অধিকার কোন মুসলমানকে দেওয়া হয়নি। আবুল হাশিম বলেন :

"Islam is not a system of dogmatic faith and worship, but a comprehensive code of life embracing and governing all aspects of human existence." [367]

আবুল হাশিমের মতে, ইসলামের রুহবানিয়াত[৩৬৮] এর কোন অস্তিত্ব নেই। আধ্যাত্মবাদকে ইসলাম অবশ্যই সমর্থন করে। তাই বলে দুনিয়ার সব কিছু ত্যাগ করে কেবল আল্লাহ তায়ালার

---

[364] Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, p.17.

[365] Ibid,P.15;18.

[366] আল-কুরআন, সূরা আল বাকরা, আয়াত: ৮৫

[367] Abul Hashim ,As I see It, Ipcit, P.31. অর্থঃ ইসলাম অন্ধ বিশ্বাস নয় বরং জীবনের সব দিক অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি জীবন ব্যবস্থা। এবং মানুষের অস্তিত্বের সব দিক শাসন করে এমন একটি জীবন পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

সান্নিধ্য লাভের জন্য বনে-জঙ্গলে বৈরাগ্য জীবন-যাপন করা ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না। ঈসায়ীগণ (খ্রীষ্টানগণ) বৈরাগ্যবাদকে 'দীন' এবং খোদা পুরস্কির হিসেবে গ্রহণ করলে তার প্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

অর্থঃ তারা বৈরাগ্যবাদের মনগড়া পথ অবলম্বন করেছে। তাদেরকে আমি এর হুকুম দেইনি।[৩৬৯]

রাসূল (স) বলেছেনঃ ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নেই।[৩৭০]

নবী করিম (স) আরো বলেন :

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে ইব্রাহিম (আঃ) এর সহজ এবং খাঁটি দীন দিয়েছেন।[৩৭১]

বস্তুত বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা খোদা প্রদত্ত কোন ধর্মেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই নবী করিম (স) বৈরাগ্যবাদের প্রত্যেকটি কর্মপদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন বিয়ে না করা, সর্বদা অবিরাম রোযা রাখা, বিশ্রাম না নিয়ে সারা রাত্রি ইবাদত করা, পরিবার-পরিজনের হক আদায় না করা ইত্যাদি। বস্তুত পাপ পংকিলতার অপসারণ, দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তির লক্ষ্যেই ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বিত রূপই হলো ধর্ম। আবুল হাশিম বলেন, 'তারা ধর্মকে বৈরাগ্যবাদের সাথে একাকার করে ফেলেছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"This Arabic word is the real equivalent of 'Religion' as it is understood to-day. Not 'Rabbaniyaut' but the Arabic word 'Rabbaniyat'

---

368 রুহবানিয়াত: বৈরাগ্যবাদের আরবী প্রতিশব্দ হল এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এবং এর অর্থ হল যে ভয় করে। হযরত ঈশা (আঃ) এর পরবর্তী ঈসরাইলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষত: রাজন্যবর্গ ও শাসন শ্রেণীর ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। বনী ঈসরাইলের মধ্যে কিছু সংখ্যক খাটি 'আলিম ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাড়ালে তাদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবিলার শক্তি তাদের নেই; কিন্তু এদের মিলেমিশে থাকলে তাদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তারা প্রতিজ্ঞা করে নিলেন যে, তারা এখান থেকে বৈধ আরাম আয়েশও ছেড়ে দিবেন। বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, গৃহ নিমার্ণে যত্নবান হবেন না। লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন। অথবা যাযাবরের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন। যাতে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে ধর্ম পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করে ছিলেন। তাই তারা অথবা তথা সন্ন্যাসী" নামে অভিহিত হল এবং তাদের উদ্ভাবিত মতবাদ তথা 'সন্ন্যাসবাদ" নামে খ্যাতি লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, এটা তারা পরিস্থিতির চাপে অপারগ হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাজতের জন্যে করেছিল। তাই এটা নিন্দনীয় ছিলনা। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, আর বৈরাগ্য, সেতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। (সূরাঃ হাদীদ, আয়াতঃ২৭) ইসলামী শরীয়তে 'সন্নাবাদ' তখনই হারাম বলে সাব্যস্ত হবে, যখন কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত: হারাম সাব্যস্ত করে নেয়। কারণ এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। (মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (অনু ওসম্পাঃ) পবিত্র কোরআনুল করীম, (সংক্ষিপ্ত) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪০-১৩১৪।

369 আল-কুর'আন, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত ঃ ২৭।

370 সদরুদ্দীন ইসলাহী, মাওলানা, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ, ১২১

371 ঐ,পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

expresses the true spirit of religion. The Holy Quran categorically refutes 'Rabbaaniyat' of Roman Catholic monks and nuns and emphatically assists that jesus Christ and all other true Prophets appeared not to preach 'Rahbaniyat' but to treach 'Rabbaniyat."[372]

মানুষ রূহের জগতে থাকাকালে আল্লাহ তা'য়ালা জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

অর্থঃ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আমরা তখন সমস্বরে বলেছিলাম অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু।[৩৭৩]

এই স্বীকৃতির কারণেই রাসূল করীম (স) বলেছেন:

অর্থঃ প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নি- উপাসকরূপে গড়ে তোলে। যেমন একটি চতুস্পদ জন্তু নিখুঁত কর্ণসহকারে জন্মগ্রহণ করল, তখন তোমরা কি এর মধ্যে কানকাটা জন্তুর কোন চিহ্ন পাও? অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেনঃ তাই আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে; আল্লাহর সৃজনবিধির মধ্যে রদবদলের কোন অবকাশ নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন বা জীবন বিধান।[৩৭৪]

হাদিসটির ভাব অতি পরিষ্কার। মানুষ জন্ম থেকেই কোন জন্তু কানকাটা হয় না, এ কাটা-ছেড়া মানব-হস্তের লীলাখেলা। বস্তুত মানুষ ফিতরাতের উপরই জন্মগ্রহণ করে। তার মাতা-পিতা তার ফিতরাত নষ্ট করে ফেলে। একটি শিশু সত্য বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু সত্য বললে তার ক্ষতি হবে এই ভয়ে যদি তার মধ্যে সৃষ্টি হয়, তবে শিশুটি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে। কিন্তু সাধুতাই ছিল তার আসল ফিতরাত। পরিবেশই তাকে বাধ্য করে মিথ্যা বলতে। সুস্থ ফিতরাত তখন বিকৃত ফিতরাতের অন্তরালে চাপা পরে যায়। কাজেই মৌখিকভাবে কেউ ধর্মকে অস্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষই ধর্মকে পরিহার করতে পারে না। ধর্ম মানুষকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। সুতরাং ধর্মকে অস্বীকার করার অর্থই হলো নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। বিশ্ব প্রকৃতির সকল কিছুই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এ গুলোকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ কারোর নেই।

---

372 Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P.16) অর্থঃ 'রুহবানিয়াত' এই আরবী শব্দটি 'ধর্মের হুবুহু সমার্থকবোধক। 'রুহবানিয়াত' নয়, 'রব্বানিয়্যাত' এই আরবী শব্দটিই ধর্মের প্রকৃত প্রকাশ করে। পবিত্র কুর'আন রোমান ক্যাথলিকদের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদরে 'রুহবানিয়াত্বকে চুড়ান্তভাবে খন্ডন করে, তা জোর দিয়ে ঘোষণা করেন যে, যীশুখৃষ্ট এবং অন্য সব পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন 'রব্বানিয়্যা' প্রচার করার জন্য, 'রুহবানিয়াত' প্রচার করার জন্য নয়।" (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ.১২ অনুবাদে ইষৎ পরিবর্তন)

373 আল-কুরআন, সূরা আল- আ'রাফ, আয়াতঃ ১৭২।

সহীহ বুখারী শরীফ(১ম খণ্ড), হাদীস নং, ১৩৫৮, পৃ. ৪১৩; সহীত মুসলিম , ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫।

374 আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার দু'টি গুণ রয়েছেঃ একটি 'বাহ্যিক' অপরটি অভ্যন্তরীণ। বাহ্যদিকের সূত্র ধরেই মানুষ তাঁর অভ্যন্তরীণ রূপের দিকে অগ্রসর হয়। এ বিশ্বজোড়া প্রকৃতি হলো আল্লাহ তা'আলার 'বাহ্যরূপ'।[৩৭৫] তাই প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার অর্থ হলো আল্লাহরই সাথে সংযোগ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরাই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।[৩৭৬]

হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ বলেন:

অর্থঃ আমি ছিলাম গুপ্ত ধন। আমি পরিচিত হতে চাইলাম। তাই বিশ্ব সৃষ্টি করলাম এবং বিশ্বের সামনে প্রকাশ পেলাম। তারা আমায় চিনাত পারল।[৩৭৭]

ড. 'আল্লাম ইকবাল আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমরা পরস্পর মুখাপেক্ষী। তোমাকে ছাড়া আমরা উন্মেচিত হতে পারি না। তেমনি আমাদের ছাড়াও তুমিও প্রকাশ লাভ করতে পার না।' [৩৭৮]

বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, যিনি 'আমার কোন ধর্মীয় অনুভূতি নেই'- এ কথা প্রচার করেছিলেন তিনিও পরিশেষে প্রেম ও ভালবাসার ওপর জোর দিয়েছেন আর বলেছেন-মানুষের মধ্যে যা সত্যিকার মহান, তাকে জাগ্রত করতে হবে।' মূল্যবোধের ও মৌলবস্তুর অনেকখানি সার্বজনীন ধর্মীয় আদর্শের মধ্যেই সম্পৃক্ত।[৩৭৯]

তাই ধর্ম থেকে জীবন ও সমাজ যাতে পৃথক না হয়ে পড়ে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম

'আল্লামা আবুল হাশিম ইসলামকে ফিতরাতের ধর্ম বলেই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ কোন বিধানই প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করতে চায় না। ইসলামকে ফিতরাতের ধর্ম বললে মনে অসংখ্য প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন যদি বলা হয় 'ইসলাম ধর্ম ফিতরাতের প্রতিকূল, তখন প্রশ্ন উঠবে- তবে কেন ফিতরাত বিরোধী ধর্মের প্রতি মানবজাতিকে আহবান করা হয়। আবার যদি বলা হয় 'ইসলাম ফিতরাতের অনুকূল, তখন প্রশ্ন উঠবে- তবে কেন মানুষ ফিতরাত বিরোধী কর্মকান্ড পরিহার

375আল-কুর'আন, সূরা- আল ইমরান, আয়াতঃ ৮৩।

376 মোল্লা আলী ক্বারী, হাদীসে কুদসী, আল- আসরারুল মারফু'আ, প্রকাশকঃ মুওয়াস-সাসাতুর-রিসালা, পৃ.২৭৩।

377 ইকবাল, যবূরে কারী, হাদীসে কুদসী, আল- আসরারুল মারুফু'আ, প্রকাশকঃ মুওয়াস-সাসাতুর-রিসালা, পৃস. ২৭৩।

378 হাসান জামান ড. সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ৭২।

379 ঐ, পৃ.৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

করে ইসলামি জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে নিচ্ছে না? এর উত্তর দেয়া যেতে পারে একটি হাদীসের মাধ্যমে। রাসূল (স) এর সময় দু'হাত ও দু'পা কাটা একটা চোর ধরা পড়ে। বারবার চুরি করার কারণে তার এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। রাসূল (স) এর উপদেশ এবং শাস্তি তাকে চুরি করা হতে বিরত রাখতে পারেনি। পঞ্চমবারে চুরি করার কারণে তার মৃত্যুদন্ড হয়। এই ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে, সে ব্যক্তি ছিল জন্মগত চোর এবং চুরির ফিতরাত নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করেছিল। ধরা যাক, তার বিশ্বাস মতে চুরি করা অপরাধ নয়, কিন্তু এই চোরের ঘরে যদি অন্য চোর ধরা পড়ে, তবে সে-কি ঐ চোরকে রেহাই দিবে? দিবে না। এমতোবস্থায় কেউ যদি তাকে প্রশ্ন করে, তুমি যে কাজটি করে আসছো, সেও তো তাই করেছে। তোমার চুরি করাটা যদি অপরাধ না হয়, তবে ঐ চোরের চুরিতে কি অপরাধ থাকতে পারে? তুমি তাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু এতে চোরটি তাকে আশীর্বাদ করে ছেড়ে দিতে চাইবে না। বস্তুত এটিই হলো মানুষের আসল ফিতরাত-স্বতস্ফূর্তভাবে আক্রমণ করে। বস্তুত মানুষ খারাপকে খারাপ বলেই জানে। আর এজন্যই বলা হয়েছে মানুষকে ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেনঃ

"আল্লাহর ফিতরাতের তথা দীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এই আল্লাহর ফিতরাত এবং এরই ভিত্তিতে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জতিকে। আল্লাহর সৃজন বিধানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কোন অবকাশ নেই, এ বিধান প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না।" [৩৮০]

মহানবী (স) বলেন:

"মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষকে সুস্থ ও সঠিক প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু পরে শয়তান তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রকৃতির সরল ও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট করে দিলো।"[৩৮১]

পানিতে রয়েছে দুটি উপাদানের সংমিশ্রণ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তনের অনুপাত ২ঃ১ এবং ওজনের অনুপাত ১ঃ৮। উক্তরূপ মিশ্রণের মাধ্যমে যখন ও দু'রকমের গ্যাস পরস্পর মিলিত হয়, তাকেই বলা হয় পানি-যা জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু উক্ত মিশ্রণের মধ্যে যদি বিন্দু পরিমাণ কম বেশিও হয়, তবে তা জীবন নাশক বিষে পরিণত হবে। এ নীতি অপরিবর্তনীয়। ইসলামেও রয়েছে সুমার্জিত যাবতীয় বিধি বিধান; যা মানব জাতির প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্য। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কুর'আন এ সত্যিটিকেই ব্যাখ্যা করেছে

---

380 আল-কুর'আন, সূরা আররুম, আয়াতঃ ৩০।

381 নুরুযযামান, মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর রীতি বলে। এমনিভাবে মিশ্রণ প্রণালীর অধীনে ফিতরাতের আবেদনগুলো বাস্তবরূপ লাভ করুক- আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে এটাই কামনা করেন।

ইসলামে অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই। আর এ প্রকৃতি অনুসারেই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ফিতরাতের উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে ফিতরাতকে গ্রহণ করতে হবে। যেমন আল্লাহর মধ্যে দয়া আছে, রাগ আছে, মানুষের মধ্যেও এই স্বভাবগুলো কম-বেশি আছে। আবুল হিশামের মতে, ইসলাম ধর্মের যাবতীয় আদেশ নিষেধসমূহ মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবসম্মত। মানুষের চাহিদা পরিপন্থি কোন কিছুর অস্তিত্ব এখানে নেই। তাই প্রকৃতি মোতাবেক কাজ করাও সাওয়াবের শামিল। আর প্রকৃতির বিরোধী কাজ হবে গুনাহের কাজ। সুতরাং ধর্মকে অস্বীকার করা মানে প্রকৃতিতে অস্বীকার করা। আর প্রকৃতিকে অস্বীকার করা মানে নিজেকে অস্বীকার করা। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম বলেন:

"This is the clearly defined fundamental of ethics of Al-Quran and a revolt aganist religion, as it is interpreted, is in fact a revolt against the nature of man."[382]

আবুল হাশিমের মতে, ইসলাম ধর্ম আল্লাহ তা' আলার প্রকৃতিকে হুবহু অনুসরণ করে। প্রকৃতির যাবতীয় উপাদান যেহেতো আল্লাহর প্রদত্ত, সেহেতো ধর্মকে মানুষ অস্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম থেকে কারো মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা বিশ্ব প্রকৃতিই আল্লাহর ধর্ম। সুতরাং পরিশেষে মানুষকে ধর্মের কাছেই আসতে হয়। অতএব দার্শনিক বিজ্ঞানী ও স্বাধীন চিন্তাবিদরা মুখে মুখে যতই অস্বীকার করুক না কেন, তাদের দর্শন, কর্ম ও মতোবাদসমূহ মূলত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। কাজেই দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের নতুন নতুন নীতিমালা উদ্ভাবন, আবিষ্কার নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রদান মূলত ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেনঃ

"Philosophers, Scientist and Free-thinkers while negating religion in words practically to nothing more than investigation and systematically formulating the fundamentals or Law of Nature."[383]

---

[382] Abul Hashim, As I see It, Ipcit, P. 35. অর্থাৎ ভাল-মন্দের মাপকাঠি হল প্রকৃতি। এতেই কুর 'আনের মৌলিক নীতি বোঝা গেল। আর বোঝা গেল যে, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মানেই হল মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

[383] Abul Hashim The Creed of Islam, Ipcit, P. 19; অর্থঃ দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও স্বাধীন চিন্তাবিদেরা মুখে ধর্মকে অস্বীকার করলেও তারা ধর্মের মূল নীতিমালা তথা প্রকৃতির নিয়ম-কানুন পর্যালোচনা ও এগুলোকে সাজানো গোছানো করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪, অনুবাদন ঈষৎ পরিবর্তন।)

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান ফিতরাত সম্মত। এজন্যই ইসলামকে ফিতরাত তথা প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন 'ইসলাম'কে 'প্রকৃতি'কে 'ইসলাম'রূপে আখ্যায়িত করেছেন। অপর শব্দে, 'ইসলাম'কে 'নেচার' এবং'নেচার'কে 'ইসলাম' বলে অভিহিতো করেছেন।[৩৮৪]

হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর তেইশ বছর সময়ের মধ্যে দীন ও দুনিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পৃথিবীবাসীকে তা দেখিয়ে গেছেন। তাই ধর্ম বলতে জীবনের একটা খণ্ডিত অংশকে বোঝায় না। আসলে দীন বা ধর্ম কেবল সেটাকেই বলা যাবে, যা গোটা জীবনের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই ধর্ম বলতে আবুল হাশিম 'ইসলাম ধর্মের মতো এক সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। এর প্রাণনির্যাস হলো তাওহীদ- আল্লাহ এক ও অভিন্ন। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর হাতে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মুক্তির গ্যারান্টি রয়েছে। সুতরাং ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম।[৩৮৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মমতের অনুসন্ধান করে, তা তার নিকট কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।"[৩৮৬]

ইসলাম বিশারদগণ যখন বলেন, ইসলাম হচ্ছে সুসমন্বিত একটি সর্বাঙ্গীন জীবন ব্যবস্থা, যার মধ্যে স্থান পেয়েছে একটি সুষম অর্থনৈতিক জীবনাদর্শ, সুবিন্যস্ত সামাজিক সংগঠন, দেওয়ানী, ফৌজদারী ও আন্তর্জাতিক আইন বিধি সম্বলিত একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তখন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা খুব বিব্রত বোধ করেন। অবশ্য এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে তার যথাযথ কারণও রয়েছে। এর কারণ উদঘাটন করার জন্য আবুল হাশিম আমাদেরকে পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে আহবান করেছেন। তিনি মনে করেন, গতানুগতিকভাবে যারা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন, ইসলাম সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান নেই। ইসলামের আধুনিক অভিভাবকগণ নিজেদের 'উলামা' তথা জ্ঞানী বলে দাবি করেন। বস্তুত তারা মধ্যযুগীয় 'আরবি বিদ্যালয়ের দর্শন, আইন ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভ করেন।

---

384 মাকালাতে স্যার সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

385 আল-কুর'আন, আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯।

386 আল-কুর'আন, আলে ইমরানম আয়াতঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম মনে করেন, খুলাফায়ে রাশিদীনের শেষ খলীফা হযরত 'আলীর (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর থেকে ইসলামি আদর্শ ও মতোবাদের ক্রমশঃ অধঃপতন ঘটতে থাকে। অধুনা মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীদের মতো গোত্র ও বর্ণগত অর্থে নিজেদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করার হীণ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। জাতি, বর্ণ, দেশ, নির্বিশেষে যে ইসলাম ছিল মানুষের পথ প্রদর্শক, বাগদাদের 'আব্বাসীয় খিলাফতের সময় তা পরিণত হলো মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের এক নিছক ধর্মতত্ত্বে।

আল-কুর'আনের শিক্ষায় ভিত হয়ে ভিক্টোরীয় যুগের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্লাডস্টোন হাউস অব কমন্সে যে উক্তি করেছিলেন এখানে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। তিনি হাউসের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "যতদিন পর্যন্ত মিসরবাসী এই গ্রন্থে (কুর'আন) আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন আমরা কিছুতেই শান্তির মুখ দেখব না।"[৩৮৭]

আর এ কারণেই বৃটিশের প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়াল ইসলামি আইন-কানূনকে বিকৃত করা এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে এর প্রতি শ্রদ্ধানুভূতি দূর করে দেওয়া। এর অংশ হিসেবে তৎকালীন সময়ে মিশরে যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা হয়, তার ফল স্বরূপ ছাত্ররা ইসলামের রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়। অবশ্য তাদেরকে এতেঠটুকু জানতে দেওয়া হয় যে, ইসলাম নামে একটি ধর্ম আছে যা নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তাসবীহ-তাহলৌীল, যিকির-আযকার, মারেফাত ইত্যাদি শিক্ষা দেয়; কুরআন নামক একটি গ্রন্থ আছে, যা তিলাওয়াত করলে সাওয়াব হাসিল করা যায়। ইসলামকে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে ছাত্রদেরকে কোন শিক্ষাই দেওয়া হলো না। ফলে মুসলমান ছাত্ররা ইসলামকে কেবল একটি ধর্ম হিসেবে চিনতে বাধ্য হয়। এভাবে ইসলামের মানবিক দিকগুলো স্বেচ্ছাক্রমে অবহেলিত হলো, আর শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেল। ইসলাম আবদ্ধ হয়ে পড়ল উপাসনা ও আচার অনুষ্ঠানের সংকীর্ণ গণ্ডিতে এসব রীতি-নীতি ও ক্রিয়াকর্মের ইসলামের খাটি রূপ প্রকাশিত হয় না, বরং প্রকাশিত হয় এক বাজে ও কুৎসিত রূপ। ফলে সচেতন মানুষের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবুল হাশিম মনে করেন, এ দৈন্যতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে ইসলামের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যাখ্যা মরুব্বি, সাধু, সন্ন্যাসী, পীর, ফকীর, মোল্লাদের হাত থেকে ইসলামকে মুক্ত করতে হবে।[৩৮৮]

---

[387] কুতুব, মুহাম্মদ, ইসলাম কি এ যুগে অচল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

[388] Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P.২৭.

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম বলেন, যুগে যুগে ধর্মের নামে অনেকে জুলুম করেছে। কেউ বা ধর্মের নামে অনিষ্ঠ কাজও করে থাকবে। তাই বলে কি ধর্মকে অস্বীকার করা যাবে? কখনো না। আবুল হাশিম যুক্তি দিয়ে বলেন, বিজ্ঞানের এমন কোন আবিস্কার নেই, যা স্বার্থসিদ্ধি বা শোষণের কাজে ব্যবহার হয়নি। বিজ্ঞানের আণবিক শক্তিকে আজ মানবতা বিরোধী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বস্তুত দুনিয়াতে বিজ্ঞানের কল্যাণ ও অকল্যাণ দু'টোই রয়েছে। তাই বলে কি বিজ্ঞানের কল্যাণকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ আছে? অবশ্যই নেই। আবুল হাশিম মনে করেন, ধর্মের নামেও কেউ অধর্মের কাজ করলে, কিংবা কারো দ্বারা ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার হলেই ধর্মকে ত্যাগ করা যাবে না।[৩৮৯] তাঁর মতে ধর্মের প্রকৃত রূপ মানুষের সামনে প্রকাশ পায়নি বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ধর্ম অপব্যাখ্যাকারীদেরকে সযত্নে পরিত্যাগ করতে হবে এবং ধর্মের আলস রূপ ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিভাবান লোকদের এগিয়ে আসতে হবে। তখন ধর্ম আবার বিশ্ব মানবতার দিশারীর ভূমিকারয় অবতীর্ণ হবে। আবুল হাশিম বলেনঃ

"The right and sensible attude would be to dismiss uncermoniously and with contempt the Mullahs,..... to humainty and a true guide to human thought and action."[390]

আবুল হাশিম স্পষ্টতই বলতেন, ইসলামের অপব্যাখ্যা হওয়ার কারণে এর প্রকৃত রূপ আজ মানুষ একরকম ভুলেই গিয়েছে। ইসলামের চেহারা আজ এতেঠই খারাপ হয়েছে যে, অনেক শিক্ষিত ও যুবক শ্রেণীর লোক ইসলামকে জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চায় না। এজন্য আবুল হাশিম উদার মন-মানসিকতাসম্পন্ন ও আধুনিক ব্যক্তিবর্গের অভাবকে দায়ী করেছেন।

২৭ মে ১৯৬২ সালে ইসলামিক একাডেমীর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলো মিলনায়তনে "ইসলামি বিষয়সমূহের প্রতি যুবকদিগকে আকৃষ্ট করার পন্থা" শীর্ষক এক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আবুল হাশিম 'ইসলামের প্রতি তরুণদের অনীহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'ইসলামের এই করুণ অবস্থা চলার সময় আমরা যদি কোন যুগান্তকারী মহামনীষীর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় নিশ্চেষ্ট বসে থাকি এবং এ মর্মে অলস- আলোচনা করি যে, যেহেতো

---

[৩৮৯] Ibid,p. 18

[390] Ibid,P.18; অর্থঃ এ বিষয়ে সঠিক ও সঙ্গত মনোভাব হবে কোন রকম শিষ্টাচার প্রশর্দন না করা এব ঘৃণার সাথে ধর্মের তথাকথিত অভিভাবক মোল্লা, পন্ডিত ও পাদরীদের বর্জন করার দায়িত্ব বিশ্বের প্রতিভাবান লোকদের উপর ন্যাস্ত করা। তা করা সম্ভব হলে ধর্ম আবার হবে মানব জাতির জন্য আর্শিবাদ এবং মানুষের চিন্তা ও কর্মের যথার্থ দিশারী। (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত,পৃ.১৩, অনুবাদে ঈষৎ পরিবর্তন)

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের মধ্যে মহামনীষী বর্তমান নেই, তাই আমাদের দ্বারা কিছুই করা সম্ভব নয়, তবে আমাদের জেনে রাখা উচিত, কোনদিনই ইসলামি জীবন ও সমাজ গঠন সম্ভব হবে না। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে সম্মুখে রেখে আমাদের সকলকে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে এবং সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব।[৩৯১]

ইসলামের মতো সর্বাঙ্গীণ ধর্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্য এবং গভীরভাবে গবেষণা করার জন্য রয়েছে জোরালো তাগিদ। অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগকে ভাবা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে মস্তবড় প্রতিবন্ধক হিসেবে। বস্তুত ইসলামের এমন কোন তথ্য পাওয়া যাবে না, যা ইসলাম ও তার মর্মবাণীর বিরুদ্ধে। আবুল হাশিম বিশ্বাস করতেন, ইসলামের বিধানাবলী অপরাপর বিজ্ঞানের মতো একটি বিজ্ঞান। যুগে যুগে অনেক বড় বড় চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বীদ, গণিতবিদ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। মুসলমানরা সে কথা আজ ভুলে গেছে।

বস্তুত নবীজীর যুগেও ধর্মকে জাগতিক বিষয়াবলি থেকে পৃথক করার চেষ্টা করা হয়েছিল, আজও হচ্ছে। বিধর্মীরাতো বটেই, মুসলিম নামধারী এক শ্রেণীর লোকও ধর্মকে কেবল মসজিদ-মাদ্রাসায়, নামায- রোযায় সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। কেউ কেউ বোমাবাজি করে মানুষ হত্যো করে ইসলাম কায়েম করতে চায়। এর জন্য এক শ্রেণীর মোল্লারা দায়ী। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে তারা অনেক দূরে। তারা ধর্মপ্রাণ মুসলামনদেরকে বিভ্রান্ত করছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরাই বাস গ্রামে-গঞ্জে। লেখাপড়ার দিক থেকে তারা যেমন পশ্চাৎপদ, তেমনি ধর্মভীরু। ধর্মের নামে কোন জলসা হচ্ছে- একথা শুনলেই তারা ছুটে আসে। কিন্তু তথাকথিত ধর্মের প্রচারকারীরা ধর্মের আড়ালে নানারূপ অনাচারের খেলায় লিপ্ত। অনেকে আজ পীর পূজা, কবর পূজায় ব্যস্ত। এরা ধর্মকে জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়। আবুল হাশিম এসব তথাকথিত বকধার্মিকদের হাত থেকে ইসলামকে মুক্ত করার আহবান জানিয়েছিলেন। তাই তিনি মুসলমানদেরক আলস্য ত্যাগ করে তাদেরকে আবার ঘুরে দাঁড়াবার পরামর্শ দেন। এতে করে ইসলাম তার হারানো গৌরব আবার ফিরে পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রকৃত মেধাবী লোকদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।[৩৯২]

---

৩৯১ , ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টে সংখ্যা, ১৯৬২, পৃ. ১৬২।

৩৯২ Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, Pp.27-27.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একটি চির আধুনিক ও গতিশীল ধর্ম

আধুনিক বলতে আমরা এক কথায় বর্তমান কাল বা সময়কে বুঝে থাকি। আধুনিক শব্দের ইংরেজি Modern এর অর্থ হলো of the present or recent time.[393] ইসলাম একটা চির আধুনিক ও গতিশীল ধর্ম। ইসলাম যুগ-প্রতিভূ ধর্ম। এ শাশ্বত যুগের কালের। নতুন যুগের সুচনায় এর নতুনত্ব বিনষ্ট হয় না। বরং নতুন যুগের সামনে এটা নতুন যুগের তাৎপর্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠে। এর কারণ মানব জীবনের সর্বকালের সমস্যার সমাধান এতে নিহিতো রয়েছে। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি সমস্যার সমাধান দিতে পারে ইসলাম। এর আগমন কোন যুগ ও কালের জন্য হয়নি। ইসলামের আদর্শ চিরন্তন ও সার্বজনীন। ইসলাম ও আধুনিকতার মধ্যে কোন দ্বন্দ নেই। বরং ইসলামই আধুনিকতার জন্ম দিয়েছে। যারা ইসলামকে পশ্চাৎপদ ধর্ম এবং গতিশীলতার অন্তরায় বলে মনে করে, তারা প্রগতি ও অগ্রগতি বলতে বুঝায় বল্গাহীনভাবে চলা কিংবা কিছুটা উশৃঙ্খলা ও নিলর্জ্জতা- তবে ধিক সে প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার প্রতি। সভ্যতা বলতে যদি বুঝানো হয় কাল্পনিক অজুহাত দাড় করিয়ে অপরের রাষ্ট্র দখল করা কিংবা শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তথা মানবতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা -তবে ধিক সে সব সভ্যতা নির্মাতাদের। ইসলামের আগমনই হয়েছে তথাকথিত এসব প্রগতিশীলতা, আধুনিকতা ও সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের উপর সোনালী সৌধ বিনির্মাণের জন্য। ইসলামের সাবজনীন শাশ্বত আবেদনে মুগ্ধ হয়ে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী মহিলো মরিয়ম জামিলা ১৯৬১ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ইহুদী ধর্মকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আখ্যায়িক করে বলেন:

"ধর্মের সঙ্গে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মিশ্রণ আধ্যাত্মিকভাবে ইহুদী ধর্মকে এমন দুর্বল করে দিয়েছে যা মোচন করা অসাধ্য বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। ইহুদী ধর্মের অননমনীয় একলা চলো নীতির কারণেই ইহুদীরা সারা জীবন লাঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। আমার দৃঢ় ধারণা ইহুদীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিজ ধর্মে আনার চেষ্টা করলে এমন করুণ পরিণতি কখনো আসতো না।" [394]

---

[393] AS Hornby, Oxford Advaced Learner's Dictinary of Current English, Oxford University presss, 1974. P. 544.

[394] মরিয়ম জামলিা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্দির (১৮৭২-১৯৪৪০) জন্ম হিন্দু পরিবারে। তিনি ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ১৬ বৎসর বয়সে ইসলামে দীক্ষা লাভ করেন এবং অন্যান্য হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকেও ইসলামের রীতি-নীতি মেনে নেয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন:

"আমি এ মর্মে নিশ্চিত যে, মানবতার জন্য ইসলামের চাইতে উৎকৃষ্ট আর কোন ধর্ম,আর কোন দর্শন, আর কোন তমদ্দুন, আর কোন আইন পৃথিবীতে নেই। ভারতীয়দের (হিন্দুদের) উচিত-ইসলামের এই উৎকৃষ্ট সভ্যতাকে সগৌরবে মেনে নেয়া।" [৩৯৫]

বস্তুত ইসলাম যে কালজয়ী আদর্শ বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছে এর কোন বিকল্প নেই। এ জন্য আমরা দেখি হযরত মুহাম্মদ (স) জাহিলিয়াতের যুগের সকল প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে তিনি কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে একটি শান্তির নীড় কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকের বিশ্ব শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাই এ যুগে ইসলাম আরো বেশি কার্যকর হওয়ার কথা। ইসলাম যুগ ও কালের চাহিদা এবং আধুনিকতাকে স্বার্থকভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম। বস্তুত আধুনিকতা হচ্ছে সময়ের সাথে মানুষের জ্ঞানের স্থান পরিবর্তনকে সামঞ্জস্যশীল করে অবস্থান তৈরি করা।

ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে গবেষণা করার জন্য এতেঠ কথা বলা হয়নি। তাই গবেষণা করে যা কিছু ভাল, তা গ্রহণ করা ইসলামেরই দাবি। সুতরাং ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন যে কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত 'উসমান বলেছেন,

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুর'আন দ্বারা যা করান না, তা রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিয়ে থাকেন। [৩৯৬]

বস্তুত ইসলাম সভ্যতার মহৎ অবদানগুলোকে গ্রহণ করেছে, আর ক্ষতিকর দিকগুলোকে করেছে বর্জন। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ কুতুব বলেন, "ইসলামি আদর্শ আবিষ্কারের বিরোধিতা করে না। এমনও কোন কথা নেই যে, বাড়িতে কারখানায় বা ফার্মে কোন কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে

---

395 আবুদল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্দীঃ জীবন ও কর্ম, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯২, পৃ. ১০২।

396 শহীদ আব্দুল কাদের আওদাহ, দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য, অনুঃ মাওঃ আব্দুর রহীম, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

হলে তার উপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখে নিতে হবে। সেই সব যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা যদি আল্লাহর নামে ব্যবহৃত হয় তবেই যথেষ্ট হবে।[৩৯৭]

ইসলামের আদর্শ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানবতার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। সকল যুগ এবং কালের সাথে ইসলামের বিধানকে সামঞ্জস্য ঘটাবার জন্যই নি'আমতোস্বরূপ উদ্ভব হয়েছে 'ইজতিহাদ'[৩৯৮] এবং 'কিয়াস'[৩৯৯] নামক বিষয়ের। ইসলামকে সকল কালের উপযোগিতারূপে প্রকাশ করার জন্যই আবুল হাশিম যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ইজতিহাদের উপর যে আলোচনার অবতারণা করেছেন তা এককথায় অনন্য, অসাধারণ।

আবুল হাশিম বলেন, একটি ইঞ্জিন সক্রিয় রাখার জন্য পানির আবশ্যক। অথচ এই পানি তার মৌলিক অবস্থায় ইঞ্জিনকে গতিশীল করতে পারে না। মানুষ বুদ্ধিবলে পানির সঙ্গে তাপের সংযোগ ঘটিয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে; এই বাষ্পশক্তি ইঞ্জিনকে সচল করতে সাহায্য করে। এখানে বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদ সব সময় তার মূল অবস্থায় থেকে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। মানুষ নিজ বুদ্ধিবলে তার রূপান্তর ঘটিয়ে নিজ প্রয়োজন মেটায়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'নেসিসিটি ইজ দ্যা মাদার অব ইনভেনশন'- প্রয়োজনই সব আবিস্কারের উৎস। এই প্রয়োজনই মানুষকে নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আবুল হাশিম বলেন, প্রকৃতি প্রদত্ত কয়লা, স্বর্ণ প্রভৃতিকে কাজে লাগাতে যেমন বুদ্ধির প্রয়োজন, তেমনি অর্জিত জ্ঞানকেও কাজে লাগাতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। ইসলামের পরিভাষায় তাকে ইজতিহাদ বলে। ইসলামি আন্দোলনের এবং প্রতিষ্ঠিত দীনী সমাজ ও রাষ্ট্রের গতিশীলতার মূল চাবিকাঠি হলো ইজতিহাদ। আবুল হাশিমের মতে, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধির ব্যবহার এ দুয়ের সংযোগ ব্যতীত জীবনে সত্যিকার জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হলে এই দুইয়ের মধ্যকার সংযোগ ও সম্পর্ককে অত্যন্ত ঘনিষ্ট করতে হবে। তাই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে যদি ইজতিহাদ না করা হয়, তবে তাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।[৪০০]

---

397 কুতুব মুহাম্মদ, ইসলাম কি এ যুগে অচল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

398 ইজতিহাস একটি আরবী শব্দ। এটি শব্দ থেকে নির্গত। শব্দের আভিধানিক অর্থ শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কিন্তু পরিভাষায়-জিহাদ ব্যাপক অর্থবোধক। জীবনের সবক্ষেত্রে সংগ্রাম করাকেই জিহাদ বলে হয়। 'ইজতিহাদ' জিহাদের অংশবিশেষ। এটা এক বিশেষ ধরনের জিহাদ। এখানে ইজতিহাদের মানে বুদ্ধির প্রয়োগ। এটি বাংলা ভাষায় 'গবেষণা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

399 ইসলামী শরীয়তের দলীল প্রমাণ হিসেবে ইজমার পরে কিয়াস এর স্থান। এটি ইসলামী কানূনের চতুর্থ উৎস। 'কিয়াস' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আন্দাজ করা' 'অনুমান করা' কিংবা তুলনা করা। এটি ইসলামী কানূনের সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত। কিয়াসের মূল কথা হল পূর্ব সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্ত বা নযীররূপে গ্রহণ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে পূর্বের নীতি বা আইনকে কার্যকর করাকে কিয়াস বলে।

400 আবুল হাশিম, রাব্বানী দৃষ্টিতে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদ এর গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (স) কে দুনিয়াতে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে:

"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" [৪০১]

অর্থঃ হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। [৪০২]

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

"তোমারাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে।"[৪০৩]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অপর আয়াতে বলেছেন:

"জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না; তিনি গতিশীল ইসলামের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।"

ইসলাম সাধারণত: ধর্ম হিসেবে পরিচিত। কিন্তু ধর্মের সাধারণত বা পাশ্চাত্য অর্থে ইসলাম ধর্মমাত্র নয়-তো একটি সামগ্রিক জীবন বিধান। পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে একটি জীবন-দর্শনও বলা হয়। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই উপমহাদেশের সাথে ইসলামের সর্বপ্রথম যোগাযোগ ঘটে সপ্তম শতাব্দীতে। আরব সওদাগরদের সঙ্গে সমুদ্রপথে আগত আদর্শ ফকীর দরবেশগণের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার শুরু হলে এখানকার গণজীবনে মদিনার ইসলামের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এতেঠদিনে মুসলিম প্রশাসনে ঢুকে পড়েছে ইসলাম বিরোধী উপাদান, যেমন রাজতন্ত্র। আবুল হাশিমের অবস্থান ছিল সালতানাত কিংবা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, যথার্থ দর্শন মাত্রই জীবন-দর্শন। অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এমন একটি সামগ্রিক পরিশীলিত

---

401 আল কুরআন, সূরা আছছাফ, আয়াতঃ ৯।

402 আল-কুর'আন, সূরা আছছাফ, আয়াতঃ ১০-১১।

403 আল-কুর'আন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা, যা সমানভাবে প্রভাবান্বিত করে চিন্তা ও কর্মে । তিনি মনে করেন, যে দর্শনের সাথে বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ নেই, তার কোন মূল্য নেই । তাই দার্শনিকের উচিত চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা এবং এই পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সাথে সাথে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা ।

আবুল হাশিমের চিন্তাধারায় স্বকীয়তা ও মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায় । ধর্মের সঙ্গে প্রগতিশীলতার মিশ্রণে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তার সমন্বয়ে তিনি মুসলমানদের সামনে সত্যিকার ইসলামিক আদর্শ- ভিত্তিক জীবনের দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন । ইসলামের আলোকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়তে চেয়েছিলেন । ইসলামের মধ্যেই তিনি সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন । তাঁর 'আইডিওলজি' ছিল অনেকটা নতুন ধরনের । তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল ইসলামিক দর্শন পরিশ্রুত এবং তা তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে কখনো ব্যাহতো করেনি । ইসলাম ও প্রগতি, ইতিহাস ও বর্তমানের বাস্তবায়িত সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁর জীবন-দর্শনে ।

'আল্লামা আবুল হাশিম প্রায়ই বলতেন যে, এটি ছোট্ট একটি বাণী, কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কালিমা হলো ইসলামের শিক্ষার আসল স্পর্শমণি । এই কয়েকটি মাত্র শব্দ ইসলামের গোটা শিক্ষার এবং ভাবী দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান ও বিপ্লবের গুঞ্জায়েশ করা হয়েছে । কালিমার প্রকৃতি, সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন পারলে ইসলামকে বোঝা সহজ হয়ে যায় । আর ইসলামকে বুঝতে পারলে আরব জাতির বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের হেতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে । আবুল হাশিম দুঃখ করে বলতেন, এই কালিমার সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য মানুষ আজ ভুলে গিয়েছে । এটা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে এবং নামমাত্র মুখে আওড়ান হয় । মানুষের চিন্তা ও কাজের ভেতর এর বাস্তব প্রয়োগ করা হয় না । তিনি মনে করেন, নবী-যুগে এটি মুসলমানদের অন্তরে যেমন আড়োলন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি কিয়ামতো অবধি তা মুসলমানদের কালিমার সকল ক্ষেত্রে এক অভিনব ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম । আবুল হাশিমের মতে, কালিমার দর্শন হলো একত্ব সমন্বয় ও সমতোর দর্শন । তাই কালিমার সংস্কৃতি জীবনের অন্যসব দিকের ক্ষতি করে এক বা একাদিক দিকের উন্নয়নের নিন্দা করে এবং জীবনের সব দিকের সুষম উন্নয়নের উপর অত্যধিক জোর দেয় । আবুল হাশিম কালিমাকে বিপ্লব নামে অভিহিতো করেছেন । এ বিপ্লব বলতে ভেঙ্গে ফেলা নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক ও আমূল পরিবর্তনের বার্তা বহন করে । এ বিশ্বাস বলীয়ান হয়েই তিনি কালিমার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন । এদিক থেকে আবুল হাশিম ছিলেন স্বমহিমায় মহিমান্বিত ।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম ও সমগোত্রীয় মনীষী

আবুল হাশিম তরুণ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য চলতে ফিরতে তাঁকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হতো। নিজে লেখা-পড়া পর্যন্ত করতে পারতেন না। এজন্যও তাঁকে অপরের সাহায্য নিতে হতো। তবুও তিনি বসে থাকেন নি। ঈমানের শক্তি, জ্ঞানের জোর, আর সৎসাহস থাকলে কোন বাধাই যে জীবন পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না-এ উপমহাদেশে আবুল হাশিম তার বড় প্রমাণ। তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও সাহসিকতার গুণে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিলেন। বলতে গেলে, অন্ধত্ব আবুল হাশিমের মনের আগল খুলে চিন্তারাজ্যে বিরচণ করার সুযোগ এনে দেয়। শেখ সা'দীর তাঁর পান্দেনামা গ্রন্থে বলেছেনঃ

কেউ একদিক থেকে অপারগ হলে, আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাঁর অন্য দিক খুলে যায়।

আবুল হাশিত অন্ধত্বের কারণে নিজ হাতে লিখতে অপারগ হলেও আল্লাহ তাঁর মনের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে লন্ডন প্রবাসী বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেন, শেখ মুজিবর রহমান কোন কিছু জানতে চাইলে যোগাযোগ করতেন বয়োবৃদ্ধ নেতা আবুল হাশিমের সাথে। তিনি বলতেন "তাঁর (আবুল হাশিমের) চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মনের দৃষ্টি এখানো উজ্জ্বল।"[৪০৪]

বস্তুত অন্ধত্বের কারণে অনেক জ্ঞানী-গুণী দুনিয়ার রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করা হতে বঞ্চিত হলেও, অন্তরালো দ্বারা জগৎবাসীকে আলোকিত করার ভুরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। গ্রীসের বিখ্যাত কবি হোমার (খ্রী,পূর্ব ৮৫০-১২০০) আলেপ্পোর আবুল 'আলা আলমা 'আররী (৯৭৩-১০৫৭) এবং মিশরের ড. তাহা হুসাইন (১৮৮৯ খ্রী.) এঁরা সবাই ছিলেন অন্ধ। কিন্তু অন্ধত্ব এদের জ্ঞানের অনুশীলনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। আবুল হাশিমের বেলায়ও তাই ঘটেছিল।

হোমার জন্মান্ধ হয়েও 'ইলিয়ড' ও 'অডিসি' নামক দু'টি বিখ্যাত মহাকাব্য দুনিয়াকে উপহার দিয়েছেন।[৪০৫] আবুল 'আলা আলমা' আরবি বিখ্যাত প্রগতিবাদী 'আরবি কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। চার বৎসর বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। তিনি তিহাত্তরটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৪০৬] ড. তাহা হুসাইন ছিলেন 'আরব বিশ্বের প্রখ্যাত 'আরবি সাহিত্যিক, সামালোচক ও প্রবন্ধকার। তাঁর গ্রন্থসমূহ মুসলিম বিশ্বে আগ্রহ সহকারে পাঠ করা হয়। জন্মের ছয়

---

404 রাষ্ট্রগুরু আবুল হাশিম থেকে রাষ্ট্রপিতা শেখ মুজিব, প্রথম আলো, ২০মার্চ ২০০২।

405 ভবেশ রায়, শত মনীষীর কথা, ১ম খন্ড, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ.২১৪।

406 ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বছরের মাতায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। অসাধারণ মেধাবী এই অন্ধ মানুষটি অল্প সময়ের মধ্যে কুর'আনে হাফিজ হন। ১৯০২ খ্রী. তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে আল আযহার বিশ্বাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 'আরবি ব্যাকরণ' উসূলে ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও সাহিত্যে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। [৪০৭] অন্ধত্বের কারণেই তিনি আবুল আলা 'আররীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ভোমরা রাখে মধুর খবর। প্রতিভাই প্রতিভার মূল্যায়ন করতে সক্ষম। তাই আবুল আলা মা'আররীর প্রতি ড. তাহা হুসাইনের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় তাঁকে নিয়েই গবেষণা করেন। তাঁর উপর বিশাল থিসিস লিখে ১৯১৪ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

হোমরা, মা'আররী এবং তাহা হুসাইনের মতো আবুল হাশিমেরও অন্তর্চক্ষু ছিল খুবই প্রখর ও শক্তিশালী। তিনি অন্ধ হলেও মনের চক্ষু দ্বারা সমাজের অন্ধকারকে ভালভাবেই দেখেছিলেন। তিনি ছিলেন এমন একজন মনীষী ব্যক্তিত্ব, যিনি ইসলামের অন্তর্নিহিত রূপ ও সৌন্দর্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে ইসলামের নামে যে অনৈসালিমক কাজকর্ম চলে আসছিল তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষিত ছিলেন না। তথাপি তিনি মৌলভী' বলেই পরিচিত ছিলেন। তিনি কুর'আন-হাদীসের উপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। অধঃপতিত জাতির দুর্গতি এবং পাপপঙ্কিল মানুষের মনের মাঝে পূণ্যের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা বিকিরণ করিয়ে জাতিকে সুসংহতো করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর মতে বিজ্ঞজনের জন্ম এদেখে খুবই কমই হয়েছে। এ সম্পর্কে আবু নাহিদ বলেন:

"এমন পণ্ডিত, এমন গুণীজন, এমন রাশভারী অথচ অমায়িক স্নেহশীল ব্যবহার ও তাঁর মিষ্টাভাষিতা আমাকে অবাক করেছিল।" [৪০৮]

আবুল হাশিম ইসলামের দার্শনিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর পাকিস্তান সরকারের ইসলামিক আইডিউলজি উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. 'আলাউদ্দিন সিদ্দিকী বলেনঃ "Mr. Abul Hahim is a philosopher whose utterances are full of practical wisdeom and noblest thoughts." [409]

---

407 . ইসলামি বিশ্বকোষ, (১২ খণ্ড পৃ.) ৪১৪।

408 মনসুর আহমদ (সম্পাদিত:) সৈয়দ, পূর্বোক্ত. পৃ.. ৩৪৮।

409 . ঐ. পৃ. ২২০; অর্থঃ মি. আবুল হাশিম এমন একজন দার্শনিক ছিলেন, যার প্রত্যেকটি কথায় ছিল বাস্তব জ্ঞান এবং সৎ ও চিন্তামুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা আবুল হাশিম কালিমা তথা ইসলামের ব্যাখ্যা যত সুন্দর, যুক্তিযুক্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন, অনেক আলেমগণের পক্ষেও তা সম্ভবপর হয়নি। সাহিত্যে, শিল্প, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি জীবনের নানাবিধ দিক সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাজাত আলোক পতিত হয়েছে আমাদের তমুদ্দুনের নানা ক্ষেত্রে। এরূপ তত্ত্ব এবং তথ্যের একত্র সমাবেশ অতি অল্প সংখ্যক লেখকের মধ্যে পাওয়া যায়। এ সব দিক থেকে বিচার করলে একথা নি॥সন্দেহে বলা যায় যে, আবুল হাশিম ছিলেন স্বতন্ত্র কৃতত্বির অধিকারী।

মানুষ কেন সৃষ্টির সেরা জীব, এ ব্যাপারে আবুল হাশিমের ব্যাখ্যা তাঁকে অন্যতম ইসলামি চিন্তাবিদের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আদর্শ রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক হিসেবে তিনি ইসলামি জীবন-দর্শনের যে অভিনব ও গুরুত্ববহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে জন্য বাংলাদেশ তো বটেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তিনি বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আব্দুল গফুর বলেন:

"আমাদের দেশে একই ব্যক্তির মধ্যে প্রথম সারির একজন রাজনীতিবিদ এবং একজন প্রথম সারির মনীষীর উপস্থিতি আমরা খুব কমই দেখে থাকি। আবুল হাশিম শুধু একজন প্রথম সারির রাজনীতিবিদ ছিলেন না, এমজন প্রথম সারির দার্শনিক মনীষী হিসেবেও তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। ফলে পৃথিবীর যে কোন মনীষী ও পন্ডিত ব্যক্তির সাথে তিনি আস্থার সাথে কথা বলতে পারতেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, বহু বিদেশী পন্ডিত অন্য কোন কাজে ঢাকা এলে তার সাথে কথা বলার জন্য সময় বের করে নিতেন তিনি যখন কথা বলতেন তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনতেন।"[৪১০]

প্যান ইসলামি আন্দোলনের [৪১১] প্রবক্তা জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-৯৭) ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ দেশে দেশে প্রচার করে গেছেন। তিনি ইরাকে লেখাপড়া করলেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল তুরস্ক। তুরস্কের সুলতান সমগ্র মুসলিম বিশ্বে 'খলিফাতুল মুসলিমীন' এর মর্যাদা পেতেন। জামালুদ্দীন আফগানীও সেই সূত্রে বিশ্ব মুসলিমবাদের আদর্শ প্রচার করেন। ১৮৮০-৮২ সালে তিনি কলিকাতা সফর করেন এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখেন। [৪১২] তাঁর বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে সর্বভারতীয় পরিমন্ডলের হাতে গোনা কয়েকজন লোক ইসলামের ব্যাখ্যাকার ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব অর্জন করেন। যেমন সৈয়দ আমীর 'আলী, ইংরেজি

---

410 আব্দুল গফুর, বিস্মৃতপ্রায় এক মনীষী রাজনীতিকের কথা, দৈনিক ইনকিলাব, তাং- ২৭/০১/২০০৫।

411 বিশ্ব মুসলিম জনতার মধ্যে ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগিতা সৃষ্টি এবং এবং পরিশেষে ইসলামিক রাজা অথবা ফেডারেশন গঠন করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এটা মুসলিম ভ্রাতৃত্বে উজ্জীবিত একটি সংগঠন। বিশ্ব মুসলিম আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এটা

412 ওয়াকিল আহমদ, ড. উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা (১ম খন্ড), পৃ.১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবায় ইসলামের নৈতিক আদর্শ তুলে ধরেন। উর্দু সাহিত্যে মাওলানা আলতাফ হোসাইনী হালী (১৮৭৩৭-১৯১৪), মাওলানা শিবলী নু'মানী, ড. 'আল্লামা ইকবাল, মাওলানা সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮০-১৯৫৮) ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক লেখালেখি করেন। বাংলা সাহিত্যে ইসলাম ধর্ম ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন মীর মোশারফ হোসেন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), কবি কায়কোবাদ (১৯৫৭-১৯৫১), মাওলানা আকরম খাঁ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৯), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। এদের চেষ্টার ফলে কলিকাতায় অনেক বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্যান ইসলামি ধারণা শক্তিশালী হয়। ফলে একদিকে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের চেতনা যেমন মুসলমানদের মধ্যে বিস্তৃত হয়, তেমনি স্বাতন্ত্র্যবোধও দৃঢ়তর হয়। এর প্রভাব পড়ে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে।

আবুল হাশিম হলেন ধর্মভিত্তিক দার্শনিক। জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের (১৯৫৫ খৃ.) মতো আবুল হাশিমও মনে করতেন ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আইনস্টাইন বলেছিলেন, ধর্ম পথ-নির্দেশ দিতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানের আশ্রয় ছাড়া তা লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না। আবুল হাশিম ও তদ্রূপ মনে করেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পৃক্ত। তাই তিনি কালিমার বিপ্লবকে স্বার্থক করার জন্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি ফিতরাত তথা প্রকৃতিক আইনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সেই জ্ঞান-লব্ধ ক্ষমতোকে ধর্মের লক্ষবস্তু, সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে লাগাবার শিক্ষা দিয়েছেন।

আবুল হাশিমের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্যান্য চিন্তাবিদদের সামঞ্জস্যতা ও বৈপরিত্য

আবুল হাশিমের জীবন দর্শন ছিল রুবূবিয়্যাত তথা পালনবাদের দর্শন। এই দর্শনের মূল কথা হলো 'স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবা করা। এই দর্শনের মূলনীতি তিনি লাভ করেছিলেন ' আল্লামা আযাদ সোবহানীর কাছ থেকে। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ তোয়াহা [৪১৩] বলেনঃ

---

413. মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭) জন্ম নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুরে। রাজনীতিবিদ। পিতার নাম হাজী মোহাম্মদ ইয়াসিন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং এমএ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৪৪) পাস করেন। বামপন্থি ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা শহর শাখার বিশিষ্ট নেতা। তিনি যুবলীগেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫১ সালে এ সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। ৭ মার্চ (১৯৫২) গ্রেফতার। প্রায় দুই বছর কারাভোগের পর ১৯৫৪ সালে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের টিকেটে নোয়াখালী জেলা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনের পাক মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মাওলানা ভাসানীর মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি বিরোধী নেতা মাওলানা ভাসানীর পক্ষ অবলম্বন করেন। একই বছর ঢাকায় মাওলানার

Dhaka University Institutional Repository

"কাশিয়াড়া হাউজে সর্বপ্রথম ভালভাবে পরিচিত হয়েছিলাম মাওলানা আজাদ সোবহানীর সাথে। 'রুবুবিয়াৎ-রব্বানিয়াৎ' তত্ত্বের প্রবক্তা মাওলানা আজাদ সোবহানীই ছিলেন হাশিম সাহেবের এই মতোবাদের দীক্ষা-গুরু দেখলাম, হাশিম সাহেবকে তখন এই তত্ত্ব ভালভাবেই পেয়ে বসেছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাশিম সাহেব বোধ হয় এর থেকে মুক্তি পাননি। চার বছর আগেকার আবুল হাশিম সাহেব অনেকটা পরিবর্তিত । বাংলা ভাষাভাষী জনগণের একটি রাষ্ট্র পরিকল্পনা তাঁর চিন্তা থেকে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। সমাজতন্ত্র তথা মার্কসবাদ, লেলিনবাদ সম্পর্কে যার পান্ডিত্য মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেই মানুষটিও যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তার স্থান দখল করে নিয়েছে আর এক দার্শনিক সত্ত্বা রুবূবিয়াত রব্বানিয়াতের দার্শনিক। আর তার সমাজতান্ত্রিক 'বৃহত্তর বাংলার' চিন্তার জগতে অধিষ্ঠিত হয়েছে 'খিলাফতে রব্বানীর' এক বিমূর্ত ইসলামি ইউটোপিয়া"।[৪১৪]

আযাদ সুবহানী ইসলামকে পালনবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। আর এই পালনবাদের মডেল হিসেবে তিনি রাসূল (স.) কে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি "তাযকিরায়ে মুহম্মদী" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বইটি মূলত রুবূবিয়্যাতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখা হয়েছে। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন:

"ইসলাম একটি তথা-কথিত ধর্ম নয়, বরং একটা সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত সামগ্রিক বিপ্লব, একটা নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক আন্দোলন। যার উদ্দেশ্য পৃথিবী হইতে শাসনবাদের উচ্ছেদ ও পালনবাদের প্রতিষ্ঠা, আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহর জীবনী অধ্যয়ন করিয়া 'আল্লামা এই সত্যে উপনীত হন এবং আজীবন তাঁহার বক্তৃতা, আলোচনা ও রচনার মাধ্যমে ইহার প্রচার করেন। ইসলামের এই কল্যাণময় ইনকিলাব দুনিয়া হইতে শোষণ, ভ্রাতৃত্ব ও প্রকৃত মানবসমাজ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম ও

নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে তিনি এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে তার ওপর হুলিয়া জারি করা হয়। ১৯৬৬ সালে হুলিয়া তুলে নিলে তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রব্যাবর্তন করেন। ১৯৬৭ সালে ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পিকিংপন্থী ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলনে তোয়াহা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার প্রশ্নে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তিনি ১৯৭০ সালে ন্যাপের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তাঁরই নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল গঠিত হয় এবং তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আত্মগোপন অবস্থান সশস্ত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বদান করেন। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে বাকশাল সরকারের পতন ঘটালে ১৯৭৬ সালে তোয়াহা আত্মগোপন করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে যোগদান করেন। একই বছর তাঁর নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল পুরুজ্জীবিত হয়। তখন লে: জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারে প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। ১৯৭৯ সালে নোয়াখালী -১৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। লেঃ জেনারেল হোসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন উচ্ছেদ করে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের লক্ষ্যে ১৫ দলীয় জোটে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৬ সালে সংসদ নির্বাচনে রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর অবদান অসামান্য। (বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পৃ, ৩১৮-১৯)

414 মনসুর আহমদ (সম্পাদিত), সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ.-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাহার এই বিশ্বাসের প্রচার তিনি তাহার স্বদেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ ও আমেরিকার সফর করিয়া তিনি তাহার সাধ্যমতো ইনকিলাবের আহবান ঐ সব দেশেও পৌছাইয়া দিয়েছিলেন।[৪১৫]

আবুল হাশিম রব্বানী দর্শনের মন্ত্রণা আযাদ সুবহানীর কাছ থেকে পেয়ে থাকলেও এর বিকাশ, প্রচার ও প্রসারের মূলে ছিলেন তিনি নিজেই। তার মতো আরো অনেকেই রব্বানী দর্শনে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)[৪১৬] ছিলেন অন্যতম।

---

416 মাওলানা আবদুল খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জন্ম সিরাজগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে ধানগড়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তার পিতা ছিলেন হাজী শরাফত আলী খান (মুঃ ১৮৮৬)। ধানগড়া প্রাইমারী স্কুলে কিছুদিন পড়ালেখা করার পর যাত্রাদলে যোগ দেন। চাচা হাজী ইব্রাহিম তাকে যাত্রাদল থেকে ছাড়িয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসায়। কিন্তু মাদ্রাসার বাধাধরা নিয়মের মধ্যে তিনি বেশীদিন থাকতে পারলেন না। মাদ্রাসা ছেড়ে তিনি কায়িক পরিশ্রম করে নিজের মধ্যে পরিশ্রম করার অভ্যাস গড়ে তোলেন। এ জন্যই তিনি জীবনভর শ্রমজীবী ও দুঃখী দরিদ্রদের ব্যথা-বেদনার সাথী হতে পেরেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। দুই বৎসর পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। মাওলানা ভাসানী কিছুকাল টাংগাইলের কাগমারী প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে তিনি বগুড়ার পাচবিবির জসিদারী শামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরীর বাড়ীতে যান। সেখানে তিনি জমিদার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পাচবিবি থাকাকালে তিনি প্রথমবার হজ্জব্রত পালন করেন। ৯৩ হজ্জ করে দেশে ফেরার পর মওলানা সুবহানীম মওলানা ভাসানী কংগ্রেসের সদস্য হন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা আযাদ সুবহানীম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, গোখলে, দেশবন্ধু সি আর দাশ মোহন চাদ করমচাদ গান্ধী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহকর্মীরূপে এরেদ ঘনিষ্ট সাহচর্য লাভ করেন। ঐ সময় (১৯১৯ খ্রীঃ) জীবনে সর্বপ্রথম তিনি ১০ মাস আসামের জোড়হাটে ৯৪ কারাদন্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর মাওলানা ভাস্যানী আসামের দুর্গত মুসলমানদের জন্য সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।তিনি গরীব মুরীদানের মহাজনী ঋণের অভিশাপ লক্ষ্য করে ব্যথিত হন। তাদের কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দান করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাদেরকে স্বাধীকার চেতনা দানের উদ্দেশ্যে তিনি প্রজা-আন্দোলনের পথ বেছে নেন। অল্পদিনের মধ্যেই জনগনের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক পরী ও জাতীয়তাবাদী নেতা রূপে আবির্ভত হন। যমুনা ধলেশ্বরী বিধৌত চর এলাকার মজলুম জনসাধারণও মাওলার জাতীয়তাবাদী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে তার মুরীদ হতে থাকে। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করে ভাসানী স্থানীয় জমিদারদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে আসামের ধুবড়ী চলে যান। ১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ী জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে মাওলানা আবদুল হামিদ খান বহিরাগত বাংগালীদের নিয়ে এক বিশাল সম্মিলন করেন। সেটাই ধীরে ধীরে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৫ সালে বগুড়া জেলার পাচবিবি থানার বীরনগরের আলেমা খাতুনকে বিবাহ করেন। ১৯২৬ সালে মাওলানা ভাসানী আসামে সর্বপ্রথম কৃষক প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ১৯২৯ সালে তিনি আসামের কাগমারীতে জংগল পরিস্কার করে কুড়েঘর তৈরী করেন এবং সেখানে স্থায়ী আবাসিক এলাকা গড়ে তোলেন। ১৯২৯ সালে তিনি আবার আসামের ভাসান চরে এক ঐতিহাসিক কৃষক সম্মিলন আহবান করেন, যা তখন পর্যন্ত আসামে ছিল বৃহত্তম কৃষক সভা। ১৯৩০ সালে মওলানা ভাসানী কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে তিনি টাংগাইলের চাড়াবাড়ি ঘাটে কৃষক খাতক সম্মিলন ডাকেন। তাতে প্রায় দেড় লক্ষ চাষী যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে পুনরায় তিনি নিজ জেলা পাবনায় আগমন করেন। ১৯৩৭ সালে ভাসানী আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সালেই আসামে 'লাইন প্রথা' চালু করা হয়। ১৯৪০ সালে তিনি এ.কে ফজলুল হকের সংগে ঐতিহাসিক লাহোর সম্মিলনে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এই সালেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা পিজি হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৩ নভেম্বর খোদাই খিদমতগার সম্মিলনে ভাষণ দান। পুনরায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৭ নভেম্বর বুধবার রাত ৮ টা ২০ মিনিটের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনিও 'হুকুমতো- এ রব্বানী' অর্থাৎ মহান আল্লাহর শাসন কায়েম করতে চেয়েছিলেন। তিনি হুকুমতো-এ রব্বানী'-র ব্যাখ্যায় বলেছিলেন:

"সারা বিশ্বের সবকিছুকে স্রষ্টা লালন-পালন করেন, তেমনি তিনি লালন-পালন করেন সৃষ্টির অভিজাত মানুষকেও। মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে সৃষ্টির প্রতিভূ হিসাবে। তাই মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবন যাপনেও হইব পালনাবাদের অনুসারী। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্রষ্টার প্রতিভূ হিসাবে মানুষ পালনবাদের নীতিকে প্রবর্তন করিবে, শাসনবাদকে করিবে পরিহার। একটি পরিবারে পিতা যেমন সন্তান-সন্ত তিদের অভাব–অনটন অনুযায়ী সবকিছুর ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণও রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন। সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে পিতা এবং সন্তানদের ভিতর প্রেম-প্রীতির যে মধুর সম্পর্ক বিরাজমান, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসা মানুষের জীবনকে ঘিরিয়া থাকিবে। শাসন করিয়া অন্যকে আদেশ প্রতিপালন করানো যাইতে পারে, কিন্তু তার ফল খুব শুরু হয় না। আন্তরিকভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন কিছুকে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাহ্যিক চাপ শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করে। শাসনবাদে যে কর্তৃত্বের অহমিকা রহিয়াছে, তাহা মানুষে মানুষে সর্ম্পকের ভিতর ফাটল সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাসিত শাসককে দেখে সন্দেহের চোখে, সুযোগ পাইলেই শাসকের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠে।"[৪১৭]

মাওলানা ভাষানী যে সমস্ত ইসলামি চিন্তাবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মাওলানা হযরত মোহানী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্দি ও মাওলানা আজাদ সুবহানী। এদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি রুবূবিয়ত অর্থাৎ বিধাতার পালনবাদের ভিত্তিমূল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর রুবূবিয়্যাতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক সৈয়দ মকসুদ আলী বলেনঃ

"আমার বিশ্বাস একমাত্র রুবূবিয়্যতের দর্শনই জাতি-ধর্ম-মতোবাদ নির্বিশেষে শান্তি দিতে পারে। সবারই লক্ষ যদি স্রষ্টা হয়, সকল সমস্যার সমাধান কল্পে যদি স্রষ্টার নিময় প্রবর্তিত হয়, তবে হানাহানির অবকাশ কোথায়? স্রষ্টার নিকট তো সবাই সমান। তিনি বিধানে সকলের নিকট দাতা, দয়াময়, প্রেরণাদানকারী এক কথায় সকল চেতনার উৎস।"[৪১৮]

---

417 আব্দুল্লাহ,মুহাম্মদ, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫-৪৭।

418 মকসুদ আলী, সৈয়দ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ভাসানী শুধু মুসলিম সম্প্রদায়কে মনে রেখে রুবুবিয়্যাতের আদর্শ প্রচার করেননি। সাম্প্রদায়িকতা তার মানসিকতাকে কখনো আচ্ছন্ন করেনি। সব ধর্মাবলম্বীকে তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। রুবুবিয়্যাতের দর্শন প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

"রুবুবিয়্যাত কোন ধর্মের কথা নয়। উহা বিশ্বভ্রমণ্ডের একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান। তাই হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল মানষের জন্য রব্বারিয়াত অর্থাৎ যে দেশে রবূবিয়াতের আদর্শ রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কায়েম হইয়াছে, তাহা কল্যাণকর বৈ কিছু নয়। মুসলমানদের জন্য যিনি রব বা পালনকর্তা, বিবর্তনকারী প্রভূ -হিন্দুদের জন্যও তিনি একই বিধানে আলো, হাওয়া, ফল, পানি, বস্ত্র, খাদ্য সবই যোগাচ্ছেন। একমাত্র রবুবিয়তের আদর্শই মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করিতে পারে।"[৪১৯]

আবুল হাশিম যেমন রব্বানী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি অন্যদেরকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবার ভোগবাদিতায় অভ্যস্থ অনেক ব্যক্তি রব্বানী দর্শনের কূল- কিনারা করতে না পেরে তাদের পূর্ববর্তী চিন্তাধারায় ফিরে যায়। এ সম্পর্কে 'মোহাম্মদ তোয়াহা' তাঁর প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে বলেনঃ

"বস্তুত আবুল হাশিমের চার পাশে যারা সমবেত হয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র ঢাকা গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে শামসুল হক, কামরুদ্দীন সাহেব এবং আমিই (মুহাম্মদ তোয়াহা) কিছুকাল আগে তাঁর এই মতোবাদে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলাম। আবুল হাশিম সাহেব আমাকে তাঁর 'রুবূবিয়াৎ-রব্বানীয়াৎ' তত্ত্বের সব চাইতে ভাল ব্যাখ্যাদাতা বলে সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। ছোট বেলায় আরবি ইসলামি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের পাশাপাশি মার্কসবাদ- লেনিনবাদকে মিলিয়ে আমি "ইসলামি সমাজতন্ত্র" আবিস্কারের চেষ্টা করেছিলাম। ক্রমাগত তিন বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঐ প্রচেষ্টার স্বার্থকতায় আস্থা হারিয়ে আবার পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যৌক্তিকতাকে গ্রহণ করেছিলাম। কেননা, ব্যাপক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পটভূমিতে এই দুইটি ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম।"[৪২০]

কিন্তু রুবূবিয়্যাত-দর্শনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আবুল হাশিমের যেভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

---

419 ঐ.পৃ. ১৯৫।

420. সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম ও স্যার সৈয়দ আমির আলী

মুসলিম ভারতে চিন্তাক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর 'আলী ছিলেন অনেকের চেয়ে অগ্রগামী। তিনি ছিলেন অভিজাত বংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আমলা ও আইনজীবী। আমীর আলী যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেটা কেবল উচ্চ রাজ কর্মচারীরূপে নয়, তাঁর খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর মননশীলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা। তিনি মুসলিম সমাজকে এক নতুন ধরনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের উপর তিনি The Spirite of Islam (১৮৮৯) এবং A short History of the Saracens (১৮৯১) এই দুটি বই লিখে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁর মতো ইসলামকে উনিশ শতকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে পূন:মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আমীর 'আলি তাঁর লেখা শরী'অতের বিধি-বিধান তুলে ধরেননি, বরং ইসলামের দর্শনকে যুক্তিযুক্তভাবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে তিনি সৈয়দ আহমদকেও ছাড়িয়ে গেছেন। স্যার সৈয়দ যেখানে বলেছেন, ইসলাম প্রগতির পরিপন্থী নয়, সেখানে আমির আলী দেছিয়েছেন যে, ইসলামই প্রগতির প্রতীক।[৪২১]

আবুল হাশিমও তাদের মতো চিন্তা করতেন। তিনি আমীর 'আলীর মতো আইন ব্যবসায় ভাল সাফল্য পেয়েছিলেন। তাছাড়া আমীর 'আলীর মতো আবুল হাশিমও The creed of Islam গ্রন্থটি রচনা করে আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আমীর 'আলী ভাবতেন, প্রাচীনপন্থী আলিমগণ তাদের সীমিতো জ্ঞানের আলোকে কুর'আনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেটাই যে অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে- এমন কোন কথা নেই। পবিত্র কুর'আন পাঠের ব্যাপারে তিনি বলেনঃ

"Without the interpretation put upont it by the ulama who represent the unauthorized teachings of their ancient predecessors"[422]

আমির আলী জোর দিয়ে বলতেন, হাজার বছর আগে অর্থাৎ নয় শতকে মোল্লারা কুর'আনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটা উনিশ শতকে মোটেই নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়।[৪২৩]

---

421 সালাহউদ্দিন আহমেদম, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনায় উন্মেষ ও বিকাশ , প্রকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১. পৃ.৫৯।

422 সিরাজুল ইসলা, বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১) পৃ. ২৮৮-২৮৯; সালাহউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ জাতীয় চেতনায় উন্মেষ ও বিকাশ, পৃ. ৫৯-৬০।

423 সালাহউদ্দিন আহমদ,পূর্বোক্ত, পৃ.৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিমও কুরআনের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তথাতথিত মোল্লা-মৌলভীর উপর চাপিয়ে শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

আমীর 'আলী মুসলমানদেরকে বিচার শক্তি বা ইজতিহাদকে প্রয়োগ করে সমকালীন অবস্থার আলোকে এবং যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামকে পুনর্মূল্যায়নের আহবান জানিয়েছেন। আবুল হাশিমও ইজতিহাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমীর আলী শিয়া মতোবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁকে নিয়ে মুসলিম বিশ্বে অনেক বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। তিনি ইংরেজদের মতো কোট-টাই পরতেন। তাই নওয়াব 'আব্দুল লতীফ ও আমীর 'আলীর মতো লোককে সমালোচনা করতেন এই বলে যে,: এঁরা বিলেতি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে ও বিলেতি কাঈদা-কানুন অনুসরণ করে এবং নিজেদের সংস্কারপন্থী বলে প্রচার করে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।[৪২৪]

আবুল হাশিমও আমীর আলীর মতো প্রথম জীবনে বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ বিশেষত ধূতি পরতেন। এ কারণে তিনি অনেক মাওলানা কর্তৃক সমালোচিত হয়েছেন। অবশ্য তিনি সমাজের এলিট ও পোষাক সর্বস্ব বক ধার্মিকদের বিভিন্নভাবে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি।

আবুল হাশিম 'আল্লামা ইকবাল, মাওলানা মওদূদী, মাওলানা 'আবদুর রহীম ও মরিয়ম জামিলা

আধুনিক রাজনৈতিক বিবর্তনের শক্তিমান এবং প্রতিভাশালী নায়কদের মধ্যে কবি ও দার্শনিক 'আল্লামা ইকবাল ছিলেন অগ্রগণ্য। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি মুসলিম জাতির হাতাশা, নিশ্চেষ্টতা ও পতনের জন্য তার ক্ষোভ ছিল নিদারুণ ও দুঃখ ছিল অপরিসীম। ঐ সময় তিনি বিষায়িত মন নিয়ে আল্লাহকে ঐ পতনের জন্য অভিযুক্ত করে 'শিকওয়াহ' ও 'জওয়াবে শিকওয়াহ'[৪২৫] জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন, তেমনি আরবি

---

424 সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭. সালাইউদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ,৫৯।

425 'শিকওয়াহ' ও 'জওয়াবে শিকওয়াহ': (অভিযোগ ও অভিযোগের উত্তর) হল দার্শনিক কবি 'আল্লামা ইকবাল রচিত দুটি বিখ্যাত উর্দু কবিতা। 'শিকওয়াহ' নামক কবিতাটি কবি সর্বপ্রথম 'আনজুমান-ই-হিমায়ত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় আবৃত্তি করেন (১৯০১ খ্রী.) । বলকান যুদ্ধের চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আহুত লাহোরের এক জনসভায় জাওয়াবে শিকওয়াহ কবিতাটি সর্বপ্রথম শোনান হয় ৯ ১৯১৩ খ্রীঃ)। কবিতাটি যদিও ভিন্ন দুটি প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে, তথাপি বর্তমানে একই সঙ্গে একই পুস্তিকারে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা দুটি বাংগো দারা নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। শিকওয়া কবিতায় বাহ্যত মুসলিম জাহানের অভিযোগ আল্লাহর নিকট পেশ করা হলেও তিনি এর দ্বারা ইসলামের ঐতিহ্য ও অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি উপমহাদেশের মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর জাওয়াবে শিকওয়াতে তিনি মুসলমানদের দূরবস্থার কারণ বর্ণনা পূর্বক তাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেছেন। কবিতা দুটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪শ খন্ড, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ৪০)।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসী ও উর্দু সাহিত্যেও ছিল তার নখদর্পণে। ইসলামের মধ্যযুগীয় জায়গায় কুরআনিক ইসলামের মারফত মানব-সমাজ পরিচালনার কথা তিনি তাঁর কবিতার পরতে-পরতে মিশিয়ে দিতেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাঁর চিন্তাধারা পরিপক্কতায় উপনীত হলে তিনি ১৯৩০ সালে এই উপমহাদেশে একটা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। বহু চড়াই- উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের কয়েকটি ধাপ গড়িয়ে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন মুসলিম ষ্টেটের জন্ম হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ইকবালের ইন্তেকাল হওয়ায় এই নবীন রাষ্টে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা কিভাবে প্রবর্তিত হবে এবং আধুনিক গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মোকাবিলায় তা কিভাবে টিকে থাতকে পারে, সে পথনির্দেশ তিনি সুস্পষ্টরূপে দিয়ে যেতে পারেননি। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, প্রশাসন প্রভৃতির রূপরেখা কি ধরণের হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ কোন ধারণাও সে সময়কার নেতৃবর্গের মাথায় আসেনি।

এ সময় তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবের বিশাল ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল 'আলা মওদূদী এবং পূর্ব পাকিস্তানে রব্বানী আন্দোলনের পুরোধা মনীষী 'আল্লামা আবুল হাশিম মানুষের চিন্তা- চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁরা উভয়েই পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন অত্যন্ত বাস্তব সম্মতভাবে। মাওলানা মওদূদী রাষ্ট্রনীতি, ইসলামের অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে দিকনির্দেশনা দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তানকে কল্যাণকামী ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি 'জামায়াতে ইসলামি' (১৯৪১) নামে একটি রাজনৈতিক দলও গঠন করেন। সর্বক্ষেত্রে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্য কর্মী বাহিনী তৈরীর ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেন। আল্লাহ তা'আলার যমীনে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দীন কায়েম করাই ছিল জামায়াতে ইসলামির উদ্দেশ্য।[৪২৬]

জামায়াত একটি ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন। তাঁরা এই ধ্যান-ধারণা লাভ করেছিল 'ইখওয়ানুল মুসলিমের[৪২৭] এর সাংগঠনিক কাঠামো থেকে। অপরদিকে আবুল হাশিম কমিউনিস্টদদের সাথে উঠাবসা ছিল। তিনি মুসলিম লীগের মধ্যে তরুণ নেতৃত্ব সৃষ্টি করার জন্য হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে ক্যাডার ভিত্তিকরূপে গড়ে তুলেছিলেন। আজকে জামা'আত যে সাফল্য পেয়েছে, আবুল হাশিমের মুসলিম লীগও তখন সে সাফল্য পেয়েছিল। ফলে ১৯৪৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ব্যাপকভাবে

---

426 আব্বাস আলী খান, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ.৩।

427 মিশরের হাসান আল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯) 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' এর প্রতিষ্ঠাতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা হতে বর্তমানকালে পর্যন্ত ইসলামের পূর্ণজাগরণ এবং রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রে 'আরব জগতে এই সংগঠনের অবদান উল্লেখযোগ্য। একে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে মুসলিম দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

জয়লাভ করে। তবে সে সময় তিনি যে ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ধারা পরবর্তীতে আর ধরে রাখতে পারেননি। আবুল হাশিম মুসলিম লীগে যে গতি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তা ধরে রাখতে পারলে আজকের দিনে মুসলিম লীগের এই করুণ পরিণতি হতো না। চিন্তা-চেতনার দিক থেকেও আবুল 'আলা মওদূদীর সাথে আবুল হাশিমের যেমন মিল রয়েছে তেমনি গড়মিল রয়েছে। মওদূদীর রয়েছে বিশাল ইসলামি সাহিত্যে ভাণ্ডার। আবুল হাশিমের দর্শন সাহিত্যে ব্যাপক না হলেও তার স্বল্প সংখ্যক রচনাই শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তিনি ইসলামকে বিপ্লব নামে অভিহিতো করেছেন। মাওলানা মওদূদী একজন আন্তজাতিক ইসলামি চিন্ত াবিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কিছু কিছু আকীদাগত বিষয় সম্পর্কে যেমন আলিম সমাজে বির্তক রয়েছে, আবুল হাশিমের ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। এ দিক থেকে তাঁদের উভয়ের মধ্যে মিল ও অমিল রয়েছে।

ইকবাল ও মওদূদী পাকিস্তানে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতোায় দেখতে চেয়েছিলেন। আবুল হাশিমও পাকিস্তান দেখেছিলেন আদর্শ বাস্তবায়নের প্রাথমিক ক্ষেত্ররূপে। তথায় ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্র ছিল অনেক। কিন্তু শুধু আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কোন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল না পাকিস্তান ছাড়া। প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক মতোবাদ ইসলামের আর কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা নেই বলে আধুনিক বিশ্বের কোন কোন মহলের ধারণা গড়ে উঠেছে, এর জওয়াব দিতে চেয়েছিলেন আবুল হাশিম। তিনি বিশ্বাস করতেন, যারা ইসলামের প্রগতিশীলতার আদর্শে বিশ্বাস করে না, তাদের উপযুক্ত জবাব দেয়ার দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতে হবে। আবুল হাশিম সে দায়িত্বের অনেকটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি নিজেকে গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন বলতে গেলে সেই তরুণ বয়স থেকেই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আবুল হাশিম তাঁর চিন্তা ও বিশ্বাসকে শুধু গ্রন্থাকারে সূত্রবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি পাকিস্ত ানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে তা বস্তবায়িত করার জন্য জোরালো ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হননি। কারণ ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের ত্যাগী কর্মীবাহিনী ও শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

ইকবালের জীবন দর্শনের সবচাইতে বড় কথা ছিল খুদী। খুদী মানে অহংকার। তাঁর মতে, খুদী তথা আত্মার উন্নতি সাধন করতে পারলে মানুষ তাঁর জীবন-রহস্য বুঝতে সক্ষম হবে। তাই মানুষকে প্রকৃতির বৈরী শক্তি ও সমাজের অপশক্তির সাথে লড়াই করে আত্মশক্তির (খুদীর) বিকাশ ঘটাতে হবে, জগত ও জীবনের রহস্য উন্মোচন করতে হবে। অত:পর সেই বিকশিত শক্তিকে দীন-

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম, সমাজ, দেশ এবং মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে। আল্লাহ সবচাইতে বড় খুদী। সেই বড় খুদীর যত কাছাকাছি যাওয়া যাবে, ততই মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে। এই খুদীর সকল রহস্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মধ্যে নিহিতো বলে ইকবাল মনে করেন। ইকবালের ভাষায়:

"খুদীর গোপন রহস্য নিহিতো রয়েছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লহ তাওহীদের এ কালিমায় খুদী হলো তলোয়ার, এর শান হলো, লা ইলাহা ইল্লাহল্লোহ।"[৪২৮]

আল্লামা ইকবাল খুদী বলতে আত্মশক্তি বা ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বুঝিয়ে থাকেন। তাই খুদীকে যত উন্নত করা যাবে, মানুষের ভাগ্য ততবেশী খুলে যাবে। এ সম্পর্কে ইকবাল বলেছেন:

"তুমি তোমার খুদীকে এতোটা উন্নত কর, যেন তকদীর লেখার পূর্বেই খোদা তাঁর বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার তকদীর কেমন হওয়া উচিত।"[৪২৯]

আবুল হাশিম ও তার খুদী আবর্তিত হতো কালিমা তাইয়্যিবা তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্-কে কেন্দ্র করে; যাকে ধর্মীয় পরিভাষায় ঈমান বা বিশ্বাস বলা হয়।[৪৩০] আবুল হাশিম ছিলেন আশাবাদী মানুষ তাঁর মতে, মদিনার ইসলাম ছিল নমূনামূলক: ইসলামের আসল বিপ্লব এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি। পূর্ণ গৌরবে ইসলামের পুনরাবির্ভাবের সময় এসেছে বলে তিনি মনে করেন।[৪৩১]

আবুল হাশিমের এই আশাবাদের সাথে ও ইকবালের মনোভাবের মিল লক্ষ্য করা যায়। ইকবাল মনে করতেন ত্যাগের মনোভাব ইার শহীদী জযক্ষা নিয়ে এগুতে পারলে দুনিয়াতে যে ইসলামের পূণরুজ্জীবন ঘটবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেন:

"সত্য ন্যয়ের সবক নে ফের, নে সবক তুই বিরত্বের, তোরে দিয়ে কাজ হবে সে আবার, সারা দুনিয়ার ইমামতের।"[৪৩২]

আবুল হাশিমের সমসাময়িক বাংলাদেশের বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মওলানা আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭) তাঁর কালিমার তায়িব্যা নামক গ্রন্থে কালিমার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদীও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা শীর্ষক গ্রন্থে কালিমার গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশ্লেষণ করেছেন। তবে আবুল হাশিম কালিমার যে অভিনব ও ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়েছেন-তার একটি স্বতন্ত্র দিক রয়েছে।

---

428 ইকবাল, যবরে কালীম, পৃ. ৭।

429 ইকবাল, বালে জিব্রীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১; ইকবাল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, পৃ. ৫১।

430 Abul Hashim, As I See It, Op.cit, p.41.

431 Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, pXV.

432 ইকবাল, বাংগে দারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭.

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুর রহীম ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন ইসলামি চিন্তাবিদ। কেবল মাদ্রসায় পাঠ গ্রহণকারী ব্যক্তিত্ব মওলানা আবদুর রহীম স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া না করলেও মানবিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় গভীরভাবে আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় থেকে শুরু করে বস্তুবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অপরাধবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। আবুল হাশিমেরও বিচরণ ছিল এ পথেই। আবদুর রহীম ইসলামি ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। অপরদিকে আবুল হাশিমের দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিমা দর্শনের ধ্বংসস্তুপের উপর। আরবি, উর্দু, ফার্সি ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় ও মাওলানা আবদুর রহীমের দখল ছিল। উপরন্তু তিনি ইসলামি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন। এজন্য তিনি প্রথমে জামায়াতে ইসলামি, পরে আইডএল এবং আরো পরে ইসলামি ঐক্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ দিক থেকে তুলনা করলে আবুল হাশিমের সাথে আবদুর রহীম সাহেবের অনেক দিকের সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায়।

আমেরিকায় জন্ম গ্রহণকারী মরিয়ম জামিলা একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম নারী। তাঁর পূর্ব নাম ছিল মার্গোরেট মারকিউস। ইসলামের সার্বজনীন ও শাশ্বত আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ১৯৬১ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪৩৩] তিনি জীবনের মিশন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করেন। এবং এ কারণেই তিনি নিজ জন্মভূমি আমেরিকা ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করে পাকিস্তানে পাড়ি জমান। এখানে তিনি একজন মুসলমানকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৪৩৪] দশ বছর বয়স থেকেই ইসলামের প্রতি মরিয়ম জামিলার অনুরাগ জন্মে। তিনি তখন ইহুদীদের রবিবাসরীয় স্কুলের ছাত্রী। বয়সন্ধিকাল পর্যন্ত তিনি মানবতাবাদী দর্শনে প্রভাবিত ছিলেন। বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়ার পর তিনি নাস্তিক্যবাদী আদর্শ ত্যাগ করে ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর মাঝে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তিনি সমকালীন বিশ্ব ইসলামি চিন্তাবিদ তথা আলজেরিয়ার মরহুম শায়খ ইব্রাহীম, ওয়াশিংটনের ড. মাহমুদ এফ হোবাল্লা, প্যারিসের ড. হামিদুল্লাহ্, জেনেভার ড. সৈয়দ রমজান এবং পাকিস্তানের সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন।[৪৩৫]

---

433 মরিয়ম জামিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. প্রসঙ্গ কথা।

434 ঐ, পৃ. প্রসঙ্গ কথা।

435 ঐ, পৃ. প্রসঙ্গ কথা।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে মাওলানা মওদূদীর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের উভয়ের চিন্তাধারা প্রায় একই রকম। মওদূদী যেমন ইসলামের বিজয় কামনা করতেন, জামিলাও তাই চেয়েছেন। এজন্য তাঁদের উভয়ের ভাবধারা বিনিময় হতো চিঠি-পত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে। ১৯৬১ সালে মাওলানা মওদূদী মরিয়ম জামিলাকে উদ্দেশ্য করে এক পত্রে বলেন:

"আমি যখন আপনার রচনা পড়ছিলাম, আমার মনে হয়ছে আমি আমার নিজের ভাবধারাই পড়ছি। আমার বিশ্বাস আপনি যখন উর্দু শিখে আমার বই পড়ার সুযোগ পাবেন তখন আপনারও একই ধারণা হবে। আপনার সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এই পারস্পরিক সহানুভূতি এবং চিন্তার ঐক্য নি:সন্দেহে এটাই প্রমাণ করছে যে, আমরা জুজনই ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত।"[৪৩৬]

আবুল হাশিম হলেন ঘরের সন্তান। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই তার শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। বয়ষ বাড়ার সাথে সাথে তিনিও মরিয়ম জামিলার মতো ইসলামের কালজয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মরিয়ম জামিলা ইসলামের জন্যই নিজ মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসেন। আবুল হাশিমের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তিনি ইসলামের পক্ষাবলম্বন করায় হিন্দুরেদ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে থাকতে না পেরে ঢাকায় চলে আসেন। বস্তুত আবুল হাশিমও মরিয়াম জামিলার মতো ইসলামের জন্য জীবনের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রত্যাখান করতে প্রস্তুত ছিলেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে আবুল হাশিম ও মরিয়ম জামিলা ছিলেন একই পথের পথিক।

আবুল হাশিমের সাম্যবাদ ও অন্যান্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামি ভাবধারা সাথে কমিউনিজমের মিল থাকায় আল্লামা আবুল হাশিম ইসলামি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। আল্লামা ইকবালও ঐ মতোবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি মনে করতেন, কমিউনিজমের সঙ্গে যদি ধর্মবিশ্বাসকে যুক্ত করা যায়, তবে যে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে, তা ইসলাম বিরোধী হবে না, বরং তা হবে ইসলামের কাছাকাছি। তিনি কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাঁকে যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক করা হতো, তাহলে সেই রাষ্ট্রকে তিনি প্রথমেই পরিণত করতেন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।[৪৩৭]

---

436 মরিয়াম জামিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

437 আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম ও ইকবালের মতো মাওলানা ভাষানীও ইসলামি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন: আমার সমাজতন্ত্র ইসলামি সমাজতন্ত্র। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে:

"পারিবারিক জীবনের অশুভ দিকও রহিয়াছে বটে। পরিবারের চাপেই মানুষ অতি বৈষয়িক হইয়া ওঠে এবং দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে, সমাজের কথা ভুলিয়া যায়, আত্মকেন্দ্রিক ও লোভী হইয়া পরে এই জন্যেই গোটা সমাজটাকে সমাতান্ত্রিক ছাঁচে গড়িয়া তোলা দরকার। তাহাতে কেহ লোভের বশবর্তী হইয়া বিপথগামী হইবে না। মন চাহিয়াছে কোন এক অলৌকিক শক্তির বলে হইলেও সমাজটাকে ওলট-পালট করিয়া দিয়ে মানুষের মুখে হাসি ফুটাই। আমার জীবনের বিনিময়ে যদি হাসি ফুটাতো তাহলে আমার জন্ম কতই না সার্থক হইত।[৪৩৮]

মুসলিম লীগের নেতা ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ [৪৩৯] ও ইসলামি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য তাঁর এক বন্ধু তাঁকে কমিউনিষ্ট বলে অভিহিতো করলে তিনি বলেছিলেন: "তা কৈতে পার, তবে আমি মুসলমান কমিউনিস্ট"।[৪৪০]

এক সময়কার মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা নওয়াব বাহাদুর ইয়ার জঙ্গও কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন:

"কমিউনিজম মানে যদি হয় দারিদ্র ও শ্রেণী-বৈষম্য দূর করা এবং দরিদ্র জনগণকে খাদ্য ও বস্ত্র দেয়া, তাহলে আমিও তাই। আমরা পাকিস্তানকে সেভাবেই দেখেছি। যদি তোমাদের পাকিস্তান সে রকম না হয়, তাহলে আমাদের তা চাই না।"[৪৪১]

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আবুল হাশিমের বক্তব্য ছিল: "Support where you can and oppose where you must."[442]

---

438 আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫।

439 আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯) তাঁর জন্ম ময়মনসিংহের ধানিখোরা গ্রামে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যতি রয়েছে। তিনি ১৯২১ সালে বি,এ এবং কলকাতা ল কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে বিএল পাস করেন। াতক ডিগ্রী লাভের পর কলকাতায় গমন করেন। সেখানে সাংবাদিকতায় যোগদান। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদের সাপ্তাহিক ছোলতান, মওলানা আকরাম খাঁর সাপ্তাহিক মোশ্কাদীয় সরহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬-১৯২৯ পর্যন্ত মৌলভী মাজিবর রহমানের দি মুসলমান পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। ১৯২৯-৩৮ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি করেন। এরপর পুণরায় সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। ১৯৩৮ সালে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

440 আবুল মনসুর আহমদ,আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পূর্বোক্ত, পৃ.-৬৮।

441 হাসান পারভেজ (সম্পা:), পাকিস্তান: ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি, পৃ. ৬৮।

442 Abul Hashim, In retrospect, Op. cit, p. 68.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আবুল হাশিমের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আবুল হাশিমের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি

আধ্যাত্মিক বিপ্লব

আল্লামা আবুল হাশিমের বিশ্বাস হলো, কালিমাই ইসলামী বিপ্লবের উৎস। এক সময় অনেকেই এ কালিমায় অবিশ্বাসী ছিল। রাসূল (সাঃ) এর আহ্বানে বিশ্ববাসীর বড় একটা অংশ ইসলাম গ্রহণ করে এবং ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে কালিমার আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিপ্লবীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাসূল (স) এর নবুওয়াতকাল তেইশ বছর। ব্যক্তি-জীবনে তেইশ বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবার সমষ্টিগত জীবনে এ মুদ্দত মহাসাগরের একটি বিন্দুর মতো। একটি অসভ্য জাতির চরিত্র গঠনের জন্য এই সমকাল খুবই কম; কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল,এই তেইশ বছরের মধ্যেই রাসূল (স) আরবের মতো একটি অসভ্য ও বর্বর জাতিকে সভ্য জাতিতে পরিণত করলেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য একটি সর্বজনীন ও স্থায়ী আদর্শ উপহার দিয়ে গেলেন। কেউ যদি জানতে চায় যে, কী করে এই বিরাট পরিবর্তন এত অল্প সময়ে সম্ভব হলো? হযরত মুহাম্মদ (স) এর শিক্ষা ও আদর্শের ভেতর এমন কী গুণ বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত ছিল, যা এত স্বল্প সময়ের মধ্যে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলো? এর জওয়াবে মনীষী আল্লামা আবুল হাশিম নিজেই বলেন: "This is itself is a miracle, the miracle of the Kalima"[443]

কালিমা মূর্তিপূজকদের কোনো মন্ত্র নয়। মূর্তিপূজক মুশরিকরা মনে করে থাকে যে, একটা মন্ত্র পড়লেই পাহাড় ঢলে যাবে; যমীন ফেটে তা থেকে পানি বের হবে। মন্ত্রের অর্থ কেউ বোঝুক বা না বোঝুক তাতে কোনো লাভ ক্ষতি নেই। তাদের ধারণা হলো, অক্ষরের মধ্যেই শক্তি নিহিত থাকে। কাজেই তা মুখে উচ্চারণ করলেই সকল রহস্যের দুয়ার খুলে যাবে।[888] কিন্তু ইসলামে এরূপ ধারণার কোনো মূল্য নেই। আবুল হাশিম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজ-কর্ম

---

443 Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P. 51; অর্থ: এটাইতো এক অলৌকিক কাণ্ড,ম সেই অলৌকিকত্ব তথা কালিমার শিক্ষাই এমনটি করেছে। (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্ম কথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯; অনুবাদে ইষৎ পরিবর্তন।)

444 সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, অনুবাদ: মুহম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৩৩-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন না আসলে কেবল কালিমার শব্দ উচ্চারনে কোনো লাভ নেই।[445] বরং মানুষের উচিৎ হলো বুঝে-শুণে কালিমা পাঠ করা; মন দিয়ে উপলব্ধি করা। তবেই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়বে এবং আত্মার উপর কালিমার পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হবে। মানুষ তখন আল্লাহর শক্তিমত্তাকে মেনে নিবে এবং সৃষ্টিকর্তা ও বহু খোদাবাদের ধারণা থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। আবুল হাশিমের ভাষায়:

"In clear and unequivocal terms proclaiming the unity of god, the Kalima summarily dismisses by a single mastertroke, Polytheism and all other misconceptions of Divinity."[446]

ইসলামের এই মহান ছোট্ট একটি বাণীর দু'টি বিষয় রয়েছে। পবিত্র কুর'আনের কোথা ও এ দুটি বিষয়ের একসাথে উল্লেখ নেই। সুরা মুহাম্মদের ১৯ নং আয়াতে কালিমার প্রথম বাক্য এবং সূরা ফাতাহর ২৯ নং আয়াতে কালিমার দ্বিতীয় বাক্য উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া কুরআন-হাদীসের পাতায় পাতায় এই কালিমার ভাব নানাভাবে বিবৃত হয়েছে।[447]

কালিমার প্রথমাংশের দু'টি অংশ আছে। প্রথমাংশ যা নেতিবাচক। এর অর্থ হলো কোন উপাস্য নেই'। কালিমার দ্বিতীয়াংশ যা হলো ইতিবাচক। এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্য অস্বীকার করে মানুষ একমাত্র আল্লাহকেই স্বীকার করে নিবে। একমাত্র আল্লাহর আইনই কার্যকর বলে মনে করবে। বস্তুত সর্বকাজে যদি মানুষ আল্লাহকে প্রতিনিয়ত স্মরণে রাখে, তবে তার আত্মা প্রাশান্তিময় হয়ে উঠে আল্লাহ বলেন:

সাবধান! আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই মানবাত্মা প্রাশান্তি লাভ করে।[448]

---

445 এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কারো তৃষ্ণা লাগলে পানি পান না করে যদি সকলাদ্ধা পানি পানি বলে চিৎকার করা হয়, তবে তাতে পিপাসা মিটবে না। এক গ্লাস পানি যদি পান করা যায়, তবে পিপাসা অবশ্যই মিটবে। কালেমার অবস্থাও ঠিক তাই। কালিমা আবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদ (স) এর নবুওয়াতে আস্থা স্থাপন নিছক বিশ্বাসের নাম নয়, বরং আমল ও অনুসরণেরও ব্যাপার। সুতরাং কালিমার শব্দগুলো মুখে বললেই সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে না। হ্যাঁ মানুষে মানুষে এরূপ পার্থক্য হয়ে যাওয়ার একটি উপায় আছে; আর তাহল, প্রথমে কালিমার শব্দগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে। সেই অর্থ যাতে মানুষের মনের মধ্যে শিকড় গাঁড়তে পারে, সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। (সাইয়েদ আবুল আলা মুওদূদী, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, পূর্বক্ত, পৃ. ৩৪)।

446 Abul Hashim, The Creed of Islam,P. 53; অর্থ: স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করে কালিমায় একটি নিপুণ আঘাতে বহুত্ববাদ এবং ঐশ্বরিকতা প্রভৃতি অন্যান্য সকল ভ্রান্ত ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০)।

447 (ক) এক আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়: তিনি তোমাদের আল্লাহ (মা'বুদ) যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই (আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১০২) (খ) আল্লাহ আরো বলেন: যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করল সে যেন আল্লাহর হুকুম মান্য করল। (আল-কুর'আন, সুরা ..... আয়াত: ৮০)

448 আল-কুর'আন, সুরা আর-রা'দ,আয়াত: ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

কালেমা হলো এমন একটি তরবারি, যা দিয়ে মানব মনে যত অজ্ঞতা-মূর্খতা ও কুসংস্কার রয়েছে, তা পরিষ্কার করতে হবে এবং তথায় বীজ বপন করে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে স্বীকার করে নিতে হবে। এ জন্য সূফী দার্শনিকগণ বলে থাকেন যে:[৪৪৯]

'আল্লামা ড. ইকবাল চমৎকার বলেছেন: [৪৫০]

সাবধান! কোন নি'আমত নেই, শুধু আল্লাহর নি'আমতই নি'আমত।'[৪৫১]

পবিত্র কুরআনে এ মর্মে এরশাদ হয়েছে:

সুতরাং তুমি জেনে রাখ,আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।[৪৫২]

আল্লাহ আরো বলেন:

মোমেন শুধু তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে।"[৪৫৩]

এখানে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের যে নির্দেশ রয়েছে, সে বিষয় ছাড়া মানব রচিত সকল আইনকে অস্বীকার করাই হলো তাওহীদে বিশ্বাসীদের কর্তব্য। আবুল হাশিম মনে করেন, কালিমার অন্তর্নিহিত মর্মবাণী না বোঝার কারণে দুনিয়ার কাফির-মুশরিকরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শক্তিমত্তার কথা ভুলে গিয়ে তারা প্রাকৃতিক শক্তির কাছে মাথা নত করে।[৪৫৪] অবশ্য মানুষ নিজ সম্পর্কে দু'রকমের ধারণা পোষণ করে আসছে। কখনো সে বাড়াবাড়ি করে নিজেকে প্রভু বলে দাবি করছে।[৪৫৫] আবার কখনো নিজেকে তুচ্ছ মনে করে বস্তুরাজির সামনে মাথা নত করছে। একদিকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়ছে, অপরদিকে মসজিদ হতে বের হয়েই স্বীয় নফসের দাসত্ব করছে। একদিকে মানুষ আল্লাহর নিকট এই বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই- অপরদিকে এই মানুষই আবার অন্যের কাছে সাহায্য চাচ্ছে।

---

449 ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, সাক্ষাৎকার, ২/৮/২০০৬।

450 ইকবাল, আল্লামা, বাংগে দারা, (তারানা মিল্লী) লাহোর ১৯৫২, পৃ. ১৭২; অর্থ: তাওহীদের মহান শক্তির আমানত আমাদের পক্ষে রয়েছে, তাই আমাদের নাম ও অস্তিত্ব বিলীন করা সহজ নহে।

451 ড. এ. বি. এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, সাক্ষাৎকার, ২/৮/২০০৬।

452 আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ,আয়াত: ১৯।

453 আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৯।

454 পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে: অর্থ: তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে। (আর-কুরআন, সূরা ইয়া-ছীন, আয়াত:৭৪)

455 ফিরআউনের দাবি ছিলো: অর্থ: আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালন কর্তা। (আল-কুরআন, সূরা আন নাযিআত,আয়াত: ২৪)

Dhaka University Institutional Repository

আরবের মূর্তিপূজকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও তাদের ধারণা হলো আল্লাহকে পেতে হলে কৃত্রিম উপাস্যদেরকে মাধ্যম ধরতে হবে। তাঁদের এই বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই জন্য। যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে এবং বলে আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করে থাকি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।[৪৫৬]

বস্তুত এই বিশ্বাসের কারণেই তারা গাছপালা, নদী-নালা পাহাড়-পর্বত, পাথর-মূর্তি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, অগ্নি-বায়ু পশু, সাপ ইত্যাদিকে মানুষের উপাস্য হিসেবে মনে করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করোনা, চন্দ্রকেও না, আল্লাহকে সেজদা কর; যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন।[৪৫৭]

আবুল হাশিমের ভাবনা হলো, মানুষ নিজ সম্পর্কে না জানার কারণেই প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে থাকে। মানুষ জানে না, সে ছোট নহে, তুচ্ছ নহে, সৃষ্টি জগতে তার চেয়ে অন্য কেউ বড় নহে। আর এই না জানার কারণেই মানুষ দিনের মধ্যে অসংখ্যবার কালিমা পাঠ করলেও এর তাৎপর্য বুঝতে সমর্থ হয়নি। এ কারণেই অবিশ্বাসী মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে হেয় ও নিচুস্তরে নামিয়ে আনে। অথচ আঠার হাজার সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআয়ালা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করেছেন।[৪৫৮] পৃথিবীর সকল কিছুকে তাঁর অধীন করে দেয়া হয়েছে। অতএব, মানুষ কেবল মাথা নত করবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কাছে। আবুল হাশিম বলেন:

"Who are the gods the Kalima negates? Basically they are the forces of Nature. Of all the attributes of God His omnipotence is prominently visible in Nature... The sun, the moon, the stars, thunder, storm and waves, in fact, everything that man feared in Nature became his gods...

---

456 আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩।

457 আল-কুরআন, সূরা হা-মীম সাজদা, আয়াত: ৩৭; আল্লাহ অন্যত্র বলেন: অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির দাসত্ব করবে না। (আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২); অথচ তাঁরা মূর্তিপূজা, জিনপূজা, ভূতপূজা, নক্ষত্রপূজা, মোটকথা এক আল্লাহর ইবাদত ছাড়া সমকালীন বিশ্বের পূজা প্রচলন ছিল সবগুলোতেই তারা লিপ্ত ছিল। (সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম (১ম খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪১)

458 আল্লাহ বলেন: অর্থ: আমি বনী আদমকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি। (আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৭০)

Dhaka University Institutional Repository

Beasts, reptiles, stocks, stones and trees whatever he considered powerful and big were included in the ever-expanding list of gods."[459]

আবুল হাশিমের মতে,মানুষ তখন ভাবতো, তার চারদিকে যা কিছু আছে সবই তার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং সে হলো হীন থেকে হীন। সুতরাং যা কিছু মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে তারা মনে করত, সেসব বস্তুর পূজা করার একটা প্রবণতা তাদের অন্তরে ঝেঁকে বসেছিল। এ অবস্থায় মানুষ চেষ্টা করতে লাগল, পূজা ও বলির সাহায্যে এসব ক্ষুধিত দেবদেবীর ক্ষুধা ও ক্রোধের অবসান ঘটাতে। আর এসব করতে গিয়েই দেবদেবী হয়ে বসলো মানুষের প্রভুরূপে। আর মানুষ হলো তাদের দাস।[৪৬০] আবুল হাশিম বলেন, মানুষ নিজের মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার কারণে কখনো বিভ্রান্ত বা বুদ্ধিহারা হয়ে সৃষ্টির সবকিছুতে দেবত্ব আরোপ করে এবং কখনো সে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পায়। কখনো মানুষের বিষয় কর্মের মধ্যে,কখানো ফুল ও গাছের মধ্যে, কখনো নির্জনতার মধ্যে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ যদি নিজ সম্পর্কে জানতে পারে যে,সে কে, কোথায় সে ছিল, কোত্থেকে এসেছে, কেনই বা এসেছে, তার দায়িত্ব কী, এসব প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব হলেই মানুষ আল্লাহকে চিনতে সক্ষম হবে। আর যেই জাতি এই কাজটি দক্ষতার সাথে করতে সক্ষম হবে, তারাই হবে মহৎ জাতি।[৪৬১] এ জন্য মনীষীগণ বহু সাধনার পর বলেছেন:

যে মানুষ আত্মাশক্তিকে উপলব্ধি করেছে সে নিশ্চয় তাঁর রবকেও উপলব্ধি করেছে।[৪৬২]

---

459 Abul Hashim, Thr Creed of Islam, Opcit, p. 55; অর্থ: কালিমা যেসব দেবতাদের অস্বীকার করে তারা কারা? মূলত: তারা হলে প্রাকৃতিক শক্তি। আল্লাহর সব গুণের মধ্যে তার সর্বশক্তিমত্তা রূপ যে গুণ সেটাই প্রকৃতিতে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। তাই মানুষ কোনো বিচার বিবেচনা না করে শক্তির পূজা আরম্ভ করে। এর ফলে যা কিছু তার নিজের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে হলে তাতেই সে খোদায়ীত্ব আরোপ করল। যে প্রাকৃতিক শক্তি তার মনে ভয় সঞ্চার করল, সর্বপ্রথম তাদের প্রতিই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, বজ্র, ঝড় ও তরঙ্গ মোটকথা প্রকৃতির যা কিছু মানব মনে ভয়ে সৃষ্টি করে, তাই তার কাছে দেবতা (খোদা) হয়ে দাঁড়াল। একবার দেবতার বহুত্ব স্বীকৃত হবার পর সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে সব দ্বিধাসংকোচ দূর হয়ে গেল। পশু, সরীসৃপ, স্তম্ভ, পাথর ও গাছপালা যা কিছু মানুষ শক্তিশালী ও প্রকাণ্ড বলে মনে করল সে সবই দেবতাদের ক্রমবর্ধমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হল। (আবুল হাশিম, ইসলামের মমকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২; অনুবাদে ইষৎ পরিবর্তন।)

460 Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P. 56.

461 Abul Hashim, As I see It, Opcit, p. 86.

462 যরীফ, মুহম্মদ, কাজী, ইকবাল কুরআন কী রশনী মে, লাহোর, ১৯৫৮, পৃ. ১৯৬; সুফী-সাধকদের বাণী হলো, অর্থ: মুমিনের হৃদয় হলো আল্লাহর আরশ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা রুমী বলেছেন:

আকাশ-জমিনে আমার সঙ্কুলান হয় না, অথচ আমার সঙ্কুলান হয় মুমিনের হৃদয়ে।

আরো পরিস্কার কথায়, যে নিজের আত্মা তথা নিজ ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি, শক্তি ও পরিণতির কথা চিন্তা-ভাবনা করেছে, সে খোদাকে নিঃসন্দেহে চিনতে পেরেছে। তাই কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন:

তুই খোদ্‌কে যদি চিনতে পারিস্
চিন্‌বি খোদাকে
তোর রুহানী আয়নাতে দেখরে
সেই নূরাণী রওশন।[৪৬৩]

সক্রেটিসও বলেছিলেন, Know theself আগে নিজকে চিন। আবুল হাশিমও বলেন, মানুষ নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নিজেকে চিনতে পারলে তখন চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষ-লতা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু ইত্যাদিকে আর প্রভুরূপে মেনে নিবো না। বরং মানুষই এদের উপর প্রভুত্ব অর্জন করার শক্তি পাবে। বস্তুত এই অনুভূতি যখন 'আরবদের মধ্যে উদয় হলো, তখনই মানুষের দেহ, মস্তিষ্ক, ধীশক্তি, প্রতিভা বিকাশের দ্বারা ও উন্মুক্ত হলো। ফলে যুগ যুগান্তের পুঞ্জিভূত ভয়-ভীতি দূর হলো। মানুষ সত্যিকার অর্থেই তাঁর আসল পরিচিতি লাভ করল। এভাবে কালিমা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম আসনে অধিষ্ঠিত করল।

আবুল হাশিম মনে করেন, মানুষ যখন নিজ প্রকৃতি হতে ছিটকে পড়ে এবং কৃত্রিম পরিবেশে প্রবেশ করে তখনি সে বিপদের সম্মুখীন হয়। মানুষ তখন নিজ প্রকৃতি ছেড়ে কুঅভ্যাসের দাসে পরিণত হয়। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ-এই বোধটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। একজন মস্তিষ্ক বিকৃত লোক তার নিজ কথাবার্তা ও কাজকর্মকে যেমন চূড়ান্ত ও যথার্থ বলে ধরে নেয়, তেমনি সে সমাজের অনেক অস্বাভাবিক আচার আচরণকেও স্বাভাবিক বলেই মনে করে। একজন মদখোর মদ পান না করতে পারলে অস্বাভাবিক আচরণ করে। মদের নেশা তাকে ঘোরের মধ্যে বিভোর রাখে। সে তখন অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়। মদ পান করাই তখন তার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় মানুষের বিবেক-বুদ্ধি তার নেশার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। তখন কুপ্রবৃত্তির কাছে বুদ্ধি হেরে যায়। আল্লাহ প্রদত্ত আত্মা তখন তার কুপ্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখতে পারে না বরং সে কৃত্রিমভাবে যে অভ্যাস গড়ে তুলেছে তারই বশবর্তী হয়ে চলে।

---

৪৬৩ নজরুল, গীতি সংকলন (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৮০; নজরুল রচনাবলি, (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬, পৃ. ২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম বলেন, একজন পাকা আফিমখোর যদি যথাসময়ে আফিম খেতে না পায়, তবে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই বলে আফিম খাওয়া তার স্বাভাবিক প্রকৃতি বললে মারাত্মক ভুল করা হবে, বরং এটা হলো তার সৃষ্ট একটি জঘন্য কুঅভ্যাস, যা সে কৃত্রিমভাবে গড়ে তুলেছে এবং যা তার প্রকৃতির শত্রু। মানুষ এভাবে অনেক অনাবশ্যক দৈহিক প্রয়োজন কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা।[৪৬৪] এভাবে তার আসল প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার হাতে গড়া কৃত্রিম পরিবেশে প্রবেশ করে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং আল্লাহর সাথে তার যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছে। এ অবস্থায় মানুষকে প্রকৃত সুখ ও মুক্তি পেতে হলে তাকে পুনরায় আসল প্রকৃতিতে ফিরে আসতে হবে। আর মানুষের বিবেক বা অন্তরাত্মাই তাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে।

বিজ্ঞানের উন্নয়নে আধ্যাত্মিকতা কিংবা স্বজ্ঞার ভূমিকা

আবুল হাশিমের অন্যতম অবদান হচ্ছে জ্ঞানের রাজ্যে স্বজ্ঞার কার্যকারিতার প্রতি স্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ। তিনি বলেন, জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হলো ইন্দ্রিয়। এদেরকে একসাথে পঞ্চইন্দ্রিয় বলা হয়। আবুল হাশিমের মতে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যেই সব জ্ঞান শেষ নয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মতো মানুষের অভ্যন্তরে আরো একটি ইন্দ্রিয় আছে, যাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় (Sixth Sense) বা অন্তরিন্দ্রিয়' (Inner sance) বা স্বজ্ঞা (Intuition) বলা হয়।[৪৬৫]

মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো ইন্দ্রিয়া মাধ্যম ছাড়া পরম সত্তার পক্ষ হতে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আরবিতে ইলহাম এবং বাংলা ভাষায় স্বজ্ঞা বা স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান বলা হয়। লতীফা বা কালবের বিকাশের মাধ্যমে যে জ্ঞানের নতুন দরজা খুলে যায়, সে পথে সাধনা করতে হলে আত্মশুদ্ধি, প্রেম অর্জনে সম্যক জ্ঞান চৈতন্য থাকা চাই। অবশ্য এ রকম জ্ঞান তারাই লাভ করে, যারা গভীরভাবে ধ্যান করে থাকে। বহিরিন্দ্রিয়গুলো কেবল বস্তুর স্থূল আকার-আকৃতি প্রত্যক্ষ করে থাকে। কিন্তু স্বজ্ঞা প্রবেশ করে বস্তু ও ঘটনার বাস্তবতার মূলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সামান্য জ্ঞানই অর্জন করা যায়। মানুষ তাঁর বুদ্ধির সাহায্যেই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান লাভ করে। বুদ্ধি মানে যুক্তি বা কার্যকারণ। যেমন চোখ দূরে কোথাও ধোঁয়া দেখতে পেল। তখন বুদ্ধিই বলে দেয় যে, ওখানে আগুন আছে। মোটকথা, বহিরিন্দ্রিয়গুলো মনকে প্রদান করে বস্তুর আপেক্ষিক সত্য, সেখানে স্বজ্ঞা প্রদান করে বস্তুর আসল রূপ।

---

[464] Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P. 5.3

[465] Ibid, p.7;Abul Hashim, As I See It, Opcit, P.41.

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে আদিযুগের শেষ পর্যায়ে প্লটনাস এবং আধুনিক যুগের সূচনার প্রথম পর্যায়ে স্পিনোজা স্বজ্ঞার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায় বলে গ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দিতে শেলী বুদ্ধিজাত স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে প্রচার করলেও দার্শনিক জগতে স্বজ্ঞা যথাযোগ্য মর্যদা লাভ করেনি। এমন কি সর্বশেষে বিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে ফরাসি দার্শনিক এরি বের্গ সোঁ কেবল মাত্র স্বজ্ঞানকেই জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে প্রচার করেছিলেন। বর্তমানে স্বজ্ঞারতো কথাই নেই। বুদ্ধির অবদানকেও অস্বীকার করে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণজাত উপকরণের ভিত্তির উপরই দার্শনিক সৌধ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে দেখা যায়। ফলে একদিকে যেমন তত্ত্বজ্ঞানকে বলা হচ্ছে অসম্ভব, তেমনি স্বজ্ঞালব্ধ ধর্মীয় বিষয়গুলোকে করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অস্বীকার।[৪৬৬]

দর্শনের পরিধি তাই ক্রমশ:ই সংকুচিত হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নও হয়ে যেতে পারে। বস্তুত স্বজ্ঞা সম্বন্ধে অতি আধুনিককালে সুধীমহলে না থাকলেও মুসলিম দার্শনিকগণ স্বজ্ঞাকে মোটেই মর্যাদা দিতে চান না। ইমাম গাযযালী তাঁর দার্শনিক আলোচনায় নবুওত ও অহী গ্রহণের মধ্যে যে একটা স্বতন্ত্র জ্ঞানের ক্রিয়া রয়েছে, তা প্রকাশ করলেও পরবর্তীকালেই ইলমুল কালামের প্রবর্তকগণ তা একেবারেই ভুলে যান। আল্লামা শিবলী নূমানী আমাদের এ উপমহাদেশের পুনরায় ইলমুল কালাম বা তর্কশাস্ত্রের প্রবর্তন করার চেষ্টা করলেও, রিসালত, নবুয়ত বা কাশফের মধ্যে স্বজ্ঞার যে কার্যকারিতা রয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেননি। বাংলায় আবুল হাশিমই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি জ্ঞান তথা ধর্মের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার ক্রিয়াশীলতার প্রতিফলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রত্যাদেশ বা revelation যে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞানের ফল সে সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেছেন।[৪৬৭]

অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞার জন্য যে প্রগাঢ় অর্ন্তদৃষ্টি প্রয়োজন, সহজ ইন্দ্রিয় কিংবা খণ্ড বুদ্ধির সাহায্যে একে প্রমাণ কিংবা খণ্ডন করা সম্ভব নয়। আর তা সম্ভব নয় বলেই এ স্বজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অন্ত হীন বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু তাই বলে একে সব অবস্থায় আমরা মূল্যহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। সত্যকে ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি করা হয়তো কোনো দিনই সম্ভব হবে না; তা সত্ত্বেও সত্যানুসন্ধান থেকে আমরা বিরতও থাকতে পারি না। এক্ষেত্রে যেভাবেই যতটুকু সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটুকুকে চূড়ান্ত সত্য অর্জনের একটি মূল্যবান পদক্ষেপ বলে স্বীকার করে নেয়াই শ্রেয়।[৪৬৮]

---

466 দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, জানু-জুন, ১৯৮১, পৃ. ৯০।

467 দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টে: সংখ্যা, ঢাকা, ২০০২, পৃ: ২৫।

468 আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিমের বক্তব্য হলো, পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বস্তুর চূড়ান্ত সত্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত কিছু আবিস্কার হয়েছে, তার মূলে অন্তরিন্দ্রিয়ের ভূমিকাই প্রধান। তিনি এটাকে এক ধরনের এলহাম বা দৈবজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ষষ্ঠইন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হলো খোদাপ্রদত্ত বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হতে হলে মানুষকে হতে হবে চিন্তাশীল,ভাবুক এবং গভীর অন্ত র্দৃষ্টিসম্পন্ন। এজন্য ধ্যান ও সাধনাশক্তি থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি পঞ্চইন্দ্রিয় তথা বহিরিন্দ্রিয়ের সাথে অন্তরিন্দ্রিয়ের সমন্বয় সাধন করতে না পারবে সে হবে জড়বাদী। পঞ্চইন্দ্রিয়ের বলে বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ প্রার্থিব কাজ-কর্ম সমাধা করে থাকে। আর এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাথে যদি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপন করা যায়, তবে নব নব আবিষ্কার সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

আবুল হাশিমের মতে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ইলহাম বা দৈবজ্ঞান পেয়ে থাকেন। তাঁর মতে, মধ্যাকর্ষণ শক্তির উদ্ভাবক নিউটনের অন্তরেও হয়তো ইলহাম হয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে প্রখ্যাত দার্শনিক রুশো দৈবজ্ঞানের মাধ্যমেই হয়তো জানতে পেরেছিলেন যে,মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীন হয়ে, কিন্তু দুনিয়ার বেড়াজালে আটকে পড়েই সে শৃঙ্খলিত হয়। স্টিফেনসন, ডারউইন, কার্লমার্ক্স, নিউটন, এডিসন, সেক্সপিয়ার, কালিদাস প্রমুখ বড় বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছিলেন এবং মানব কল্যাণে অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এগুলোর কোনোটিই বাহ্য যুক্তি ও বুদ্ধির অবদান নয়। এগুলো হচ্ছে উপলব্ধি তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ফল।[৪৬৯]

বিশিষ্ট দার্শনিক ও জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, কুরআন প্রদত্ত হিকমতের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। হিকমত হলো ইলমের একটি অংশ মাত্র। হিকমত ব্যতীতও বোধির (Intuition) কল্যাণে মানুষ ও জগত এ জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রত্যাদেশ বোধিরই অপর এক সংস্করণ।[৪৭০]

---

[469] Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P. ৬-৭।

[470] হাম্মদ আজরফ, ইসলাম ও মানবাধিকার, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের একসময়কার অধিবাসী পি.সি. সরকার হিন্দু ধর্মের অনুসারী হয়েও তিনি প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়।[৪৭১] আজকের দুনিয়ায় মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়ে আছে। মুসলমানদের এই দুর্গতি ও অবনতির জন্য অন্তরিন্দ্রিয়ের অভাবকেই দায়ী করেছেন আল্লামা আবুল হাশিম। তাঁর মতে, প্রাচ্যের জনগণ যদি আবার অন্তরিন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে, তবে তারা দুনিয়ার বুকে পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কারে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবে।[৪৭২] এজন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা ও সাধনা। জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার পাশাপাশি একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও সাধনার মাধ্যমেই মনে নতুন ভাবের উদয় হতে পারে এবং এভাবে বিজ্ঞানের নতুন থিউরি অন্তরে জাগ্রত হতে পারে। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম বলেন:

"Direct perception of truth cannot be experienced through the external sense organs. For this, are needed actions of the super-sensitive senses or supersenses which lie hidden below the five external sense organs. To activeise these inner senses singlehearted devotion to their culture and development is necessary."[473]

আবুল হাশিমের সূত্র ধরে বলা যায় যে, যুগে যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব তথ্য উপহার দিয়ে গেছেন তা রূহানী শক্তিরই ফসল।

বুদ্ধি ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয়

আবুল হাশিমের মতে, বুদ্ধি ও দৈবজ্ঞান দু'টি ভিন্ন বিষয়। এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হলে আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভূত হয়। যদি Intuition তথা দৈবজ্ঞান থেকে বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তবে বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে। Intellect থেকে Intuition কে বাদ দিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানবতাবোধ তখন শূন্য হয়ে পড়ে। আবুল হাশিম বলতে চেয়েছেন যে, Intuitioin কে বাদ দিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানবতাবোধ তখন শূণ্য হয়ে পড়ে।

---

471 এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ও ফার্সি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ..... বলেন, "আমি পিসি সরকারকে আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিবলে চলন্ত ট্রেনকে থামাতে দেখেছি।" (সাক্ষাৎকার, ২০/০২/২০০৬)

472 Abdul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, p. 9.

473 Abul Hashim, The Creed of Islam, Pp. 6-7; অর্থ: বাহ্যেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দৈবজ্ঞান অর্জন সম্ভবপর নয়। এর জন্য প্রয়োজন বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে তোলা। আর তার জন্য রূহানী শক্তির উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। (আবুল হাশিম,ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত, ৪; অনুবাদের ইষৎ পরিবর্তন।)

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম বলতে চেয়েছেন যে, Intuition তথা দৈবজ্ঞানকে বাদ দিয়ে যদি শুধু বুদ্ধি দ্বারা দুনিয়াকে পরিচালনা করা হয়, তবে পৃথিবীতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে দুঃখ-দৈন্য বাড়ে। মানুষের মধ্যে কৃত্রিমতা সৃষ্টি হয়। মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাঁধে। মানুষ যদি Intellect এর সাথে Intuition তথা দৈবজ্ঞানকে মিলিয়ে নিতে পারে তবে দুনিয়াতে সুখ-শান্তি আসবে। মানুষ তখন অগ্রগতির সোপানে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। তাঁর মতে, যেসব মানুষের মধ্যে Intuition থাকবে, তাঁর মধ্যে মানবতাবোধও বিরাজ করবে; তাঁর দ্বারা মানুষের কোনো ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা থাকবে না। Intuition ছাড়া যদি শুধু Intellect এর মাধ্যমে কাজ করে, তবে সেই কাজ হবে নিছক একটি মেশিনের মতো। মেশিন যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে সক্ষম নয়, তেমনি Intuition ভিন্ন মানুষও একটি যন্ত্রে পরিণত হবে।[৪৭৪] আবুল হাশিমের বক্তব্য হলো, আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যদি কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে, তাঁরা যদি নিজ আত্মাকে নিরপেক্ষরূপে গড়ে তুলতে পারে, সেই সাথে নবী-রাসূল ও ঋষিদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হতে পারে এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে সত্য জানবার চেষ্টা করে, তবে মানব জাতি ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পাবে এবং উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। আর তখনই প্রকৃতির সাথে নিজের জীবনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। তখন মানুষ এর মধ্য দিয়ে প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হবে।

নৈতিক বিপ্লব

আবুল হাশিম বলেন, কালিমা আমাদেরকে এ নীতিই শিক্ষা দেয় যে, যা কিছু ন্যায় তা গ্রহণ করতে হবে এবং যা কিছু অন্যায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বস্তুত ভালোকে গ্রহণ করা, আর মন্দকে পরিহার করাই হলো নৈতিকতা। মানব চরিত্রের বিকাশের জন্যই নৈতিকতা অবলম্বন করতে হয়। ন্যায় শব্দটির সাদামাটা অর্থ হলো সোজা বা নিয়মমাফিক। নীতিবিদ্যায় একটা কাজকে তখনই ন্যায় বলা হয়, যখন তা কোন মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হয়। মানুষের লোভ-লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, মিথ্যা, ব্যভিচার, রাহাজানি, দ্বন্দ্ব, কলহ, কুৎসা, কপটতা জাতীয় নিু প্রবৃত্তির ভাবাবেগকে ত্যাগ করে সরল ও ঠিক পথ অবলম্বনের জন্য আল কুরআনে তাগিদ করা হয়েছে। ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে জীবনে নৈতিকতার রূপায়ন ঘটাতে পারে। আর এক্ষেত্রে তাকওয়া অর্জন করাই হলো নৈতিকতার মূল ভিত্তি। যার মধ্যে যে পরিমাণ তাকওয়া থাকবে, আল্লাহ পাকের কাছে সে ততটাই সম্মানের অধিকারী হবে।

---

474 Ibid, p. 14.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিপ্লব

রাসূল (স) এর আবির্ভাবের সময় সভ্যতার মানদণ্ডে দুনিয়ার যেসব দেশ সুসভ্য বলে পরিচিত ছিল তাদের মধ্যবর্তী এলাকায় আরব দেশটি ছিল স্বতন্ত্র। তার চারপাশে ইরান, রোম ও মিসরে জ্ঞান, শিল্প-সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল। 'আরব ব্যবসায়ীরা তখন এ সকল দেশে যাতায়াত করলেও জ্ঞান চর্চার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। সারাদেশে হাতেগোনা কয়েকজন লোক লেখাপড়া জানতো।[৪৭৫] কিন্তু কালিমার আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিই আরবদেরকে বুদ্ধিবৃত্তির জ্ঞান অন্বেষণে অনুপ্রেরণা দান করে। মানুষের অন্তকরণে কালিমা তখন এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল যে, মানুষ তখন জানতে পারে, সৃষ্টি জগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ।[৪৭৬]

মানব জাতির প্রথম পুরুষ হযরত আদম (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর হাকীকত শিক্ষা দিয়েছিলেন। আদম সন্তান হিসেবে মানুষকে আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান আনলেই যথেষ্ট বলা হবেনা, বরং কালিমার দাবি হলো বৈষয়িক শিক্ষা গ্রহণের প্রতিও মনোনিবেশ করতে হবে।[৪৭৭] রাসূল (স) এর আবির্ভাবের সময় আরব দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করার তেমন কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। আরবদেশের চারপাশে ইরান, রোম ও মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল। আরব ব্যবসায়ীরা তখন ঐ সকল দেশে যাতায়াত করলেও জ্ঞান চর্চার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। সারাদেশে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন লোক লেখাপড়া জানতো। কিন্তু রাসূল (স) কর্তৃক কালিমার দা'ওয়াত পেয়ে আরবদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তি বেড়ে যায় এবং এ শক্তিই তাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অন্বেষণে অনুপ্রেরণা দান করে। আল্লামা আবুল হাশিম প্রমান করার চেষ্টা করেছেন যে, "নাই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া" কালিমার এই বিপ্লবাত্মক ধ্বনি যখন ঘুমন্ত আরব জাতির কানে পৌছল, তখনই তাঁরা সচেতন হয়ে উঠল। কি এক অমীয় সুধা যেন তাদেরকে সঞ্জীবনী

---

475 আবুল আলা মওদূদী, সাইয়েদ, সীরাতে সরওয়ারে আলম (১ম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।

476 (ক) মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ মানুষ যা চেষ্টা করে তা সে পায়। (আল-কুর'আন, সূরা আন-নাজম, আয়াতঃ ৩৯)

(খ) অর্থঃ আমি মানুষকে উত্তম অবয়ব দান করেছি। (আল-কুরআন, সূরা, আত্-তীন, আয়াতঃ ০৪)

477 এ সম্পর্কে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী বলেন, এখন প্রয়োজন আছে বিজ্ঞান চর্চা করা ও বিজ্ঞানের বই লেখা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দানের। বিজ্ঞান অনুশীলনে নিয়ত করতে হবে সৃষ্টি রহস্য জেনে-বুঝে সৃষ্টিকর্তাকে চেনা এবং মানবতার সেবা করা। প্রকৃত প্রস্তাবে রাব্বুল আলামীনের অর্থ আর-রহমানের মর্ম মানুষ তখনই উপলব্ধি করতে পারবে, যখন বিজ্ঞান অনুশীলনকে আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।' (মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, তাফসীরে সূরা ফাতিহা, (পাঞ্চ সূরা), ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি দান করে। মানুষ নিজ প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করে। এ সম্পর্কে আবুল হাশিমের ভাষ্য হলো:

"The clarion Voice of the Creator, "There is no Deity but God and Muhammad is His prophet" vibrates and revibrates in his ears. Only yesterday he was a salve of the forces of Nature. How to appease their anger and wrath was his constant concern. Today he is the master and they are his slaves. such was the change the Kalima made in his attitude towards the wealth of Nature."[478]

কালিমার ঘোষণা শুনে তখন মানুষ উপলব্ধি করল, প্রকৃতি থেকে উপকার লাভ করতে হলে প্রকৃতির রহস্য জানতে হবে। প্রকৃতির রহস্য উদঘাটিত করতে হলে জানতে হবে প্রকৃতি বিজ্ঞান। আবুল হাশিমও কালিমার মর্মবাণী উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, কালিমার অন্তর্নিহিত শিক্ষাই মানুষকে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার ও গবেষণা করার শক্তি যোগায়। মানুষ তখন অনুপ্রাণিত হয়ে চিন্তা করতে শিখে যে, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুরাজি তথা চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পালা, লতা-পাতা, জীব-জন্তু, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদিকে পূজা না করে কীভাবে এগুলোকে নিজেদের উপকারে ব্যবহার করা যায়। মানুষের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণের এই যে অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা এটা কালিমারই দান।

আবুল হাশিমের মতে, আলোর আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি কালিমার অনুসারিরাও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পায়। এজন্য ওহী নাযিলের সূচনাতেই আল্লাহ তা'আলা পড়ালেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে আবুল হাশিমের অভিমত হলো, কালিমায় বিশ্বাসী কোনো মুসলমান বা মুসলিম রাষ্ট্রই জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ থেকে বিরত থাকতে পারে না। তিনি বলেন:

"Acquisition of knowedge is, therefore, one of the contents of the faith in the Kalima. Faith in Kalima is to ignorance what light is to

---

478 Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P.81 অর্থ: তার কানে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হলো সৃষ্টিকর্তার উদাত্ত বাণী, "আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।" মাত্র গতকাল সে ছিল বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দাস, তার সার্বক্ষনিক চিন্তা ছিল কিভাবে এ সব শক্তির ক্রোধকে প্রশমিত করা যায়। আজ সে তাদের প্রভু, আর ওরা হলো দাস। কালিমা প্রকৃতির সম্পদ সম্বন্ধে তার মনোভাবের এই পরিবর্তন ঘটাল আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩; অনুবাদে ইষৎ পরিবর্তন।)

Dhaka University Institutional Repository

darkness. The Kalima thus creates an ever-increasing thirst for knowledge. One who is unmindful of learning is unmindful of the teachings if the Kalima and a society or a state which does not make serious and sincere efforts to give right and opportunity to each and all to acquire knowledge is not a Muslim society or a Muslim state."[479]

আল্লামা আবুল হাশিমের ভাষ্যমতে, মুসলমানরা কালিমার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রকৃতির রহস্য উৎঘাটনে আত্মনিয়োগ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় মনোবিবেশ করার ফলে তাদের অর্ন্তচক্ষু খুলে যায়। জ্বলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে শুরু হয় তথ্য সংগ্রহের অভিযান। জ্ঞান অন্বেষণের এই প্রাণ মাতানো উন্মাদনায় মুসলমানরা স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে আবুল হাশিম বলেন:

"To the early Muslims, Kalima was not a lip profession but it was a reality like breath, the very means of his sustenance. The Arabs inspired by the gospel of the Kalima made an all out campaing and effort to acquire knowledge."[480]

এভাবে মুসলমানরা কালিমার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হলো দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমাজবিদ বৈজ্ঞানিকসহ বহু চিন্তাবিদ। তাঁরা তাদের কলমের শক্তিতে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। এসবের উপর ভিত্তি করেই মূলত আধুনিক বিজ্ঞানের সুউচ্চ মিনার গড়ে উঠেছিল।

---

479 (ক) জ্ঞান অন্বেষনের জন্য রাসূল (সাঃ) সাহাবীগণকে অমুসলিম দেশ চীন যেতে বলেছেন কারণ তৎকালে চীন দেশে শিক্ষা দীক্ষায় সবচেয়ে অগ্রসর ছিল। জানা যায়, ছয় জন সাহাবা চীন দেশে ইন্তেকাল করেন এবং তাদের কবর সেখানে রয়েছে। (শামসুল আলম, ইসলামী প্রবধমালা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪, পৃ. ১৩২ (খ) বদরের যুদ্ধে বন্ধী অমুসলিম বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া হত এ শর্তে যে, তারা দশজন, অন্তত একজন মুসলিমকে লেখাপড়া শিক্ষা দেবে। কাফিররা মুসলানদেরকে অবশ্যই ইসলাম শিক্ষা দিত না; তারা আরবী ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিত। (শামসুল আলম, ইসলামী প্রবন্ধমালা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২)

480 Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, Pp. 82-83 অর্থ: প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কাছে কালিমা একটি মৌলিক বুলি ছিল না। তাদের কাছে কালিমা ছিল নিঃশ্বাসের মতো বেঁচে থাকার বাস্তব উপায়। কালিমাল শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরবরা জ্ঞান আহরণের জন্য সর্বাত্মক অভিযান ও প্রচেষ্টা চালায়। জ্ঞানার্জনে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে, জ্ঞান অন্বেষণে আরবরা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। (আবুল কাশিম, ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪; অনুবাদে ইষৎ পরিবর্তন।)

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় ও স্পেনীয় মুসলিম শাসনামলে ইসলামের পুরোপুরি রূপায়ন না হলেও জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ বলে ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। নবম শতাব্দির গোড়ার দিকে বাগদাদে খলীফা আল-মামুন প্রতিষ্ঠা করেন তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, যার আরবি নাম ছিল বায়তুল হিকমা। এই বায়তুল হিকমাই গ্রিক জ্ঞান সাধকদের জন্য পরবর্তীকালে রেনেসাঁর বীজ বপনে সাহায্য করে। আধুনিক সভ্যতার নির্মাণে স্পেনের কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোজের গারোদি বলেন:

"প্রাচ্যদেশ ইউরোপকে দিয়েছে একটি সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা। লাইব্রেরি, বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যক্রম-পরিকল্পনা, শ্রেণিবিভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়-এ সমস্তই ইউরোপ পেয়েছে মুসলমানদের কাছ থেকে। দলে দলে বিদেশী ছেলেরা আসত মুসলিম ইউরোপে-সিসিলির স্যালোন্যো আর স্পেনের কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরবর্তী যুগে খৃষ্টান ইউরোপে ত্রয়োদশ শতকের বুলো, প্যারী, মন্ট পালিয়ে অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শেই গঠিত।"[৪৮১]

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আজও যদি মুসলিম জাতিকে আবার মাথা তুলে দাড়াতে হয়ে, তবে কালিমার বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

সামাজিক বিপ্লব

সামাজিক কাম্য

ইসলামে সামাজিক কাম্য বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের আত্মা বিকাশের সমান সুযোগকে বোঝায়। আবুল হাশিম মনে করেন, কালিমা আমাদেরকে এ নীতিই শিক্ষা দেয় যে, আদম সন্তান হিসেবে এক মানুসের উপর অপর মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং মানুষ হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষ একই রকম। আবুল হাশিম বলেন, আরব মুসলিমগণ তাদের নিজেদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের যে সংস্কৃতি স্থাপন করেছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে এমন নজির আর কোথায় ও দেখা যায় না। সদালাপ, বিনয়, স্বদ্যবহার, নম্রতা, সরলতা, সত্যবাদিতা, নিরহংকার, অনাড়ম্বর জীবন যাপন-এই সব গুণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কালিমার অনুসারীগণ ইসলামের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এমন এক সাম্য ও ন্যায়ের সমাজ গড়ে তুলেছিলেন যেখানে রাষ্ট্রের খলীফা এবং সাধারণ লোক সমান সুযোগ লাভ করতেন। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকরের সময়

---

481 আবদুল গফুর, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৭৯, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফতের কর্মচারী ও অন্যান্যদের বেতন ও মাসোহারা সমান ছিল। উমর অবশ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ও ত্যাগের তারতম্যের ভিত্তিতে সামান্য পার্থক্য পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর খিলাফতের শেষদিকে তিনিও আবু বকরের সাম্য নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) কঠোর সাম্যবাদী ছিলেন। আবুল হাশিম বলেন, কালিমার অন্তর্নিহিত ভাবধারার মধ্যে আল্লাহর পিতৃত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা মেলে। আল্লাহ যেমন তাঁর সন্তানতুল্য মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না, তেমনি মানুষও নিজেদের মধ্যে ভেদরেখা টানতে পারেনা। আরববাসী মুসলমানগণ কালিমার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই মদীনার আনসারগণ মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণকে আপন ভাই এর মতো সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিল।[৪৮২]

আবুল হাশিম বলেন, আধুনিককালে রাজা, মহারাজা ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদেরকে যেভাবে আড়ম্বরপূর্ণ উপাধিযোগে সম্বোধন করা হয়, খিলাফতকালে খলীফাগণকে সেভাবে সম্বোধন করা হতো না। আজকের দিনে যেমন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা নিু বেতন পেয়ে থাকেন, তার ঠিক উল্টো, খলীফাগণ নিতেন সর্বনিু বেতন। আর এজন্য তারা যুক্তি দেন, "জননেতা জনগণের খাদেম বা সেবক বৈ কিছু নয়" আর সেবক হিসেবে "প্রভুদের" জনগণের চাইতে নিতম বেতনই তাঁদের প্রাপ্য।[৪৮৩] তখন একজন খলীফা ও সাধারণ লোকের মধ্যে মাত্র এইটুকু পার্থক্য ছিল যে, খলীফা পদাধিকার বলে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার লাভ করতেন।[৪৮৪] আজকের দিনের রাজা বাদশাদের মতো খলীফাগণ ব্যক্তিগত গাড়ি-বাড়ি লাভ করা তো দূরের কথা, তখনকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত খলীফাগণ সাধারণ জনসাধারণের অনুরোপ সুযোগ সুবিধা লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। হযরত উমর লম্বা লোক ছিলেন। সাধারণ উচ্চতর লোকের জামায় যে পরিমাণ কাপড় প্রয়োজন হতো, হযরত উমরের জামার জন্য তার চেয়ে বেশি কাপড়ের দরকার হতো। তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত খিলাফতী শাসনের অপরাধের কারণে, কেউ শাস্তি প্রাপ্ত হলে খিলাফতী আইনের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারোর থাকতে পারে না।[৪৮৫] তদ্রুপ প্রকৃতির আইনের মতোই খিলাফত আমলে রাষ্ট্রের আমীর থেকে শুরু করে সর্বনিু শ্রেণীর একজন কর্মচারীরও সমান অধিকার ছিল। ইসলামের নীতি হল একজন পানি বহনকারী কিংবা কাষ্ঠ বহনকারীর জন্য যে আইন প্রযোজ্য, বাদশার জন্যও সেই একই আইন প্রযোজ্য।

---

482 Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, p. 139.

483 আবদুল গফুর, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

484 Abul Hashim The Creed of Islam, Opcit, P. 98-99.

485 আবুল হাশিম, রাব্বানী দৃষ্টিতে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে আবুল হাশিম বলেন:

"The Highest dignitory of the state is, therefore, subject to the same discipline of law in an islamic state as any Caliphate numerous instances of practice of this absolute rule of law can be found."[486]

খিলাফত আমলে অন্যায়ভাবে কোনো খলীফা বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারতো না। এ প্রসঙ্গে আবুল হাশিম বলেন:

"খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদিগের প্রাসাদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং তাদেরকে মোটা কাপড় এবং মোট আটা ব্যবহার করতে অর্থাৎ সাধারণ মজুরের মতো জীবন যাপন করতে নির্দেশ দেয়া হতো। কোনো ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং অপরাপর উচ্চপদস্থ খিলাফতের কর্মচারীদেরকে সামান্য অপরাধীর মতো শাস্তি পেতে হতো। স্বয়ং খলীফার কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জনসাধারণ তার প্রতি খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না।"[৪৮৭]

আবুল হাশিমের মতে, ন্যায়বিচার ইসলামী সমাজের একটা মৌলিক ব্যাপার। বিচারক যদি এ বিষয়ে কোনো পক্ষপাতিত্ব, কুণ্ঠাবোধ বা সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, তবে সে আর বিচারক থাকে না, সে হয় আসামী। মদীরার এক ধনী ও অভিজাত পরিবারের এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। নবীজীর দরবারে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করা হলো। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা) আসামীর পক্ষে সুপারিশ করেন। বিশ্বনবী (সাঃ) উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহর শাস্তির সুপারিশ করতে এসেছ? নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, যখন তাদের অভিজাত বংশের কেউ চুরি করতো, তাকে ছেড়ে দেয়া হতো এবং যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো, তাকে শাস্তি দেয়া হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

অর্থ: আল্লাহর শপথ, যদি মুহাম্মদ (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমাও (রা.) চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।"[৪৮৮]

---

[486] Abul Hashim, As I see It. Opcit, P. 38; অর্থ: সুতরাং ইসলামী স্টেটের সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি আইনের শাসনের শাসনাধীন হবে পানি বহনকারী ও কাঠ কর্তনকারীর ন্যায়। খিলাফতের গৌরবময় ইতিহাসের এই আইন প্রয়োগের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

[487] আবুল হাশিম, রাব্বানী দৃষ্টিতে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

[488] সহীহ বুখারী (৪র্থ খণ্ড) পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ৬৭৮৮, পৃ. ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক জগতে আইনের শাসনের এমন দৃষ্টান্ত কোথাও কার্যকর হয়েছে, এমনটি দেখা যায় না। দূর্নীতিতে আমাদের দেশটি চার চার বার প্রথম হয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশের জন্য এমন খবর নিশ্চয় অপমানজনক। এদেশে খিলাফত শাসনের আদলে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে দূর্নীতিসহ সকল বেআইনী কর্মকাণ্ড অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হতো বলে আমি মনে করি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির একটি উপাদান। ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। ইসলামের মূল বিশ্বাস হচ্ছে কালিমায়ে তায়্যিবার শক্তিতে নিজকে বলীয়ান করা। আবুল হাশিম এখানে কালিমার সংস্কৃতি বলতে ললিতকলা ও সাহিত্যকে বোঝাতে চাননি। তবে এগুলো অবশ্যই সংস্কৃতির বাহন। তিনি সংস্কৃতি বলতে মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ এবং বাহ্যিক কাজ-কর্মে এর প্রতিফলন করাকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, একজন মুসলমানের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে যা কিছু প্রকাশ পাবে তা-ই সংস্কৃতি। আর এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব দেখা যায় মদিনার প্রাথমিক মুসলিম সমাজে। আবুল হাশিম মনে করেন, প্রাচ্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ ও লেখকগণ ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে দামেস্ক, বাগদাদ, আলেকজান্দ্রিয়া এবং কর্ডোবার সাম্রাজ্যবাদী আরব, সাম্রাজ্যবাদী তুর্কী এবং দিল্লি ও আগ্রার মুঘলদের সংস্কৃতির সাথে একাকার করে ভুল করেছেন। আবুল হাশিমের মতে, ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন থাকতেই হবে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলী, বিধিব্যবস্থা পালনীয়, এগুলো ইসলামী সংস্কৃতিরই অংশ। সুতরাং ইসলামী জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো সংস্কৃতিই মুসলিম সংস্কৃতি হতে পারে না। রাসূল (স) বলেছেন-

অর্থ: কেউ অপর জাতির বিশ্বাসজনিত কাজকে অনুসরণ করলে সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে[৪৮৯]

এ কারণে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি থেকে মুসলিম সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। আর তাই সংস্কৃতির নামে অশ্লীল গান-বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি বিষয় তথা যা কিছুই মানুষের চারিত্রিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার কিছুই ইসলাম স্বীকার করে না। মোটকথা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্রধর্মী রূপ রয়েছে আবুল হাশিম এখানে সেগুলোকে ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

---

৪৮৯ সুনানু আবী দাউদ (৩য় খন্ড), পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ৪০৩১, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক জাতি আপন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বোধের দ্বারাই নিজ জাতীয় সত্তা পরিচিত, জাতীয় ঐক্য-সংহতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। মুসলমানদের জন্যও প্রয়োজন হলো আপন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখা। ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখা অপরিহার্য। কোনো মুসলমান যেন নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত না হয় এ জন্য হাদীসে কঠোরভাবে তাকীদ করা হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন:

অর্থ: তোমরা ইয়াহুদি ও মুশরিকদের বিপরীত কর।[৪৯০]

উল্লেখ্য তারা পাগড়ি পরিধান করতো কিন্তু পাগড়ির নীচে টুপি ব্যবহার করতো না। রাসূল (স) তাদের বিপরিত করার জন্য পাগড়ির নিচে টুপি ব্যবহার করার জন্য বলতেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সংস্কৃতির একটি নিজস্ব স্বরূপ সংরক্ষণ করতে হবে। এই স্বরূপের আলোকেই একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে আবুল হাশিম আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বুদ্ধিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা তুলে ধরেছেন। বস্তুত মানুষ যদি কালিমার সংস্কৃতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারে, তবে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে, মুসলমানকে পরাজিত ও পরাভূত করতে পারে। আল্লাহ্ বলেন:

নিজ সত্তার হিফাজত করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তোমরা ঠিক পথে থাকলে কেউ পথভ্রষ্ট হলেও তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।[৪৯১]

আবুল হাশিম মনে করেন, পৃথিবীর কোনো ধর্মেই জীবনের পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা নেই। তাই সেই ধর্মগুলো পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কালিমার দর্শন হলো জীবনের সকল দিকের সুসামঞ্জস্য উন্নয়ন ও সমতার দর্শন। আবুল হাশিমের মতে, একজন মুসলমানের জীবনাচরণ তথা আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বুদ্ধিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে উন্নতরূপ প্রকাশ পায় তা-ই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। আর জীবনের সকল ক্ষেত্রের একটি পরিশীলিত রূপরেখার দিক-নির্দেশনা ইসলামেই রয়েছে।[৪৯২]

---

490 সহীহ বুখারী (৪র্থ খন্ড), পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৫৮৯২, পৃ. ৭৩; সুনানু আবী দাউদ (১ম খন্ড), হাদীস নং ৬৫২, পৃ. ২১৬.

491 আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১০৫।

492 Abul Hashim, The Creed of Islam, Op.cit, 154-64.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিন্যাসে আবুল হাশিমের রচনাবলি

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আরবী চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিন্যাস

আবুল হাশিমের রচনাবলি

জ্ঞান চর্চায় আবুল হাশিম

বাংলাদেশে আরবি চর্চার অতীত ও বর্তমান ইসলামি মূল্যবোধের সংজ্ঞা ইসলামি মূল্যবোধ/ দর্শনে আবুল হাশিমের চিন্তাধারা জ্ঞান বলতে 'বোধ', 'বুদ্ধি' বা বুঝার শক্তিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করাই জ্ঞান। জীবনে চলার পথে জ্ঞান মানুষের অপরিহার্য দিশারী। জ্ঞান না থাকলে আমাদের অবস্থা হয় অন্ধকারে ইতোস্তত ছুটাছুটি করার মতো। একমাত্র জ্ঞানই আমাদের এ অনিশ্চতার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। জ্ঞানের পরিধি যার যত বেশি তিনি তত শক্তিশালী। জ্ঞান মানুষের মনের চোখ খুলে দেয়। তখন জ্ঞানহীন মানুষ যা দেখতে পায় না, জ্ঞানী লোক তা উপলব্ধি করতে পারে। অন্যের কাছে যা ধরা দেয় না, জ্ঞানীর কাছে তা ধরা দেয়। আল্লাহকে চিনতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন। ইসলামি জ্ঞানের মূল উৎস হলো আল কুর'আন ও আল হাদিস। কুর'আনের জ্ঞান যে অন্তরে নেই, সেই অন্তরকে ছাড়া বাড়ির সাথে তুলনা করা হয়েছে হাদিসে পাকে।[৪৯৩] জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কোরআনে উল্লেখ রয়েছে:

"যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?"[৪৯৪]

জ্ঞান মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের সর্বপ্রথম বাণী অবতীর্ণ হয় সেই 'জ্ঞান'কে কেন্দ্র করে। জ্ঞান অর্জনের পাশা পাশি লেখনীর উপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করে কোরআনে উল্লেখ রয়েছে:

"পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ কর, তোমার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।"[৪৯৫]

---

৪৯৩ রাসূল (স) বলেছেন ঃ (মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযি, সুনানুত তিরমিযি (৫ম খন্ড), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, তারিখ বিহীন, হাদীস নং- ২৯৯৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

৪৯৪ আল-কুর'আন, সূরা আয যুমার, আয়াত ঃ ৯।

৪৯৫ আল-কুর'আন, সূরা আত-আলাক,আয়াত ঃ ১-৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাদিসে পাকেও বিদ্যার্জন ও প্রচার, প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

"বিদ্যার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।"[৪৯৬]

রাসূল (স) বলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।"[৪৯৭]

সকল যুগ ও কালের মানুষের জন্য শিক্ষা গ্রহণ, প্রচার, প্রসার, বিস্তার এবং রক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আল-কুর'আনে আদেশ জারি করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

"হে রাসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি বা অবতীর্ণ হয়েছে।"[৪৯৮] রাসূল (স) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন ঃ

"আমার পক্ষ হতে একটি কথা শুনতে থাকলেও তা অপরের কাছে পৌছে দাও।"[৪৯৯]

এমনিভাবে কুর'আন-হাদি সের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জ্ঞান অন্বেষণ এবং বিতরণের প্রতি তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ কারণেই যুগে যুগে মুসলমানগণ ইসলামের জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন এবং এ লক্ষ্যে তারা শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছেন। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। যুগ যুগ ধরে এ দেশ ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। তের শতকের শুরুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই এ দেশে 'আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় ইসলামি সাহিত্যে চর্চার ধারা গড়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যে চর্চার প্রয়াস সূচীত হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং ক্রমে ক্রমে বিশাল ইসলামি সাহিত্যে ভান্ডার গড়ে উঠে।

---

496 মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ, সুনানু ইবনু মাজাহ (১ম খন্ড), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৫ হাদীস নং ২২৪, পৃ, ৮১।

497 সহীহ বুখারী (৩য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, হাদিস নং- ৫০২৭, পৃ. ৪২৭।

498 আল-কুর'আন, সূরা মায়িদা, আয়াত ঃ ৬৭।

499 কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা, আলী পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় এদেশের মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষাকে ধর্মের জন্য ক্ষতিকর মনে করতো। কিন্তু ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউস্কীম মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার সমন্বয় ছিল বলে মুসলমানরা তাদের সন্তানদের ঐ ধরণের মাদ্রাসায় ভর্তি করাতে আগ্রহী হয়। এভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বৈরীভাব আস্তে আস্তে কাটতে থাকে। ফলে বিশ শতকের গোড়ার দিকে যথেষ্ট সংখ্যক ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম লোকের আবির্ভাব ঘটে। আবুল হাশিমও ছিলেন এই শতকের লোক। তিনি ইসলামি জ্ঞানের প্রতিটি শাখা হতেই জ্ঞান অর্জন করে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন। চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তি। তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান সুচিন্তিত আলোচনারূপে বহি:প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে। তিনি তরুণ বয়স থেকেই ইসলাম এবং পৃথিবীর প্রায় সকল মতোবাদ নিয়ে তুলনামূলক স্টাডি করেছিলেন। তখন থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কুর'আনের অন্তর্নিহিতো ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে 'আরবি ভাভা, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেভাবেই তিনি তাঁর মন-মানসকে প্রস্তুত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তিনি বলেনঃ

"In Darwins classic Book "Origin of Species" I came across an idea that 'No creature has escape from influence of inheritance and environment'. This led me to the study of sociology and all its branches, Economics, Political Science. History and Law. Study of Sociology led me to the study of Philosophy. From these studies I saw that for proper understanding of Quran a fair Knowledge of Philosophy, Sociology and Biology was necessary. I then devoted myself to a comparative study of Islam and Communism."[500]

---

[500] Abul Hashjm, In Retrospect, Opcit, Pp-21-22 "ডারউইনের বিখ্যাত বই 'The Origin of Specis' পড়তে গিয়ে এই ধারনায় উপনীত হলেন যে, জন্মগত ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থেকে কোন জীবরই পরিত্রাণ নেই। এই তত্ব থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি সমাজবিজ্ঞান ও তার অন্যান্য শাখা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও আইনশাস্ত্র পড়াশুনা করেন। সমাজ বিজ্ঞান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দর্শনশাস্ত্রও পাঠ করেন। এসব পড়তে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, কুর'আনকে ভালভাবে বুঝতে হলে দর্শনশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার উপর একটা সুষ্ঠ ধান-ধারণা থাকা প্রয়োজন। এজন্য পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ও কম্যুনিজমের তুলনামুলক পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম বিষয়ক পড়াশোনা সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর বলেন, 'তিনি ইসলাম বিষয়ক পড়াশোনা মোটামুটি ইংরেজির মাধ্যমেই করেছিলেন। প্রথম দিকে ইসলামি সাহিত্যে পড়াশোনা করলেও ইসলামের প্রতি তাঁর খুব একটা ঝোঁক ছিল না। ঐ ঝোঁকটা সক্রিয় হয়ে উঠে মাওলানা আযাদ সোবহানীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর। তাঁর সহচর্যে থেকেই আবুল হাশিমের ইসলামি জ্ঞানের বিকাশ হতে থাকে। আবুল হাশিমের ধর্ম চর্চা করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁরই এক আত্মীয় আবূ নাহিদ বরেনঃ

"বর্ধমান শহরের তেতুলতলার বাড়িতে হাশিম ও আযাদ সুবহানীকে দেখতাম, তাঁদের আলোচনার বেশির ভাগই থাকত ধর্ম সম্পর্কিত। আবুল হাশিম একজন অনুগত ছাত্রের মতো আযাদ সুবহানীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতেন। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের আলোচনাও গভীর থেকে আরো গভীর হতো।"[৫০১]

এমনিভাবে আবুল হাশিমের মধ্যে ইসলামি চিন্তার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি পুরোপুরি ইসলামি চিন্তাজগতে প্রবেশ করেন। এ সম্পর্কে আযাদ সোবহানীর "বিপ্লবী নবী" গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে আবুল হাশিম নিজেই বলেনঃ

"যে সকল বিপ্লবীর ভাবধারা মানুষের চিন্তায় গতিশীলতা সঞ্চার করিয়া মানুষকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে আজাদ সুবহানী সেই ধরনের একজন বিপ্লবী। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে নিবিড়ভাবে জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল; বলাবাহুল, তাঁহার কাছ হইতেই আমি কিছুটা শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যাহা আমি অন্য কাহারো নিকট হইতে পাই নাই।"

ইসলাম কেবল ব্যবহারিক কতিপয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়-বরং এতে রয়েছে জীবন ও জগতের সকল দিক ও বিভাগের দিক নির্দেশনা। এই বোধ থেকেই আবুল হাশিম রাজনীতির পাশাপাশি ইসলামের জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অন্ধত্বকে উপেক্ষা করে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন ইসলামের মহিমায় অন্বেষায়। ইসলামি জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর আত্মনিষ্ঠা খুব গুরুত্বপূর্ণ। খুব সম্ভবত অন্ধত্বই আবুল হাশিমকে ধর্ম-দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। জীবনের শেষ অবধি তিনি জ্ঞান সাধনাকে পবিত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর ইসলামি বিশ্বাস ও মতোবাদকে বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন।

---

১০১ মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট

পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর মধ্যে 'আরবি ভাষা অন্যতম। বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি লোকের ভাষা হলো 'আরবি।[৫০২] মহানবী (স) এর মাতৃভাষা হলো 'আরবি'। এ ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে কুর,আন ও হাদিস। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

অর্থ: নিশ্চয় আমি কুর'আন আরবি ভাষায় নাযিল করেছি, যেন তোমরা এর মর্মবাণী অনুধাবন করতে পার।[৫০৩]

কুরআন হাদীসের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাসূল (স) বিদায় হজের ভাষনে বলেছিলেন:

অর্থ: আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা ঐ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব কুর'আন মাজীদ এবং অপরটি হাদীসে রাসূল (স)।[৫০৪]

আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক কুর'আন শরীফ তিলাওয়াত করতে জানেন, অথচ অর্থ বোঝেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। পড়ার সাথে সাথে মর্মবাণী উপলব্ধি করতে না পারলে পড়ার আনন্দ পুরোপুরি পাওয়া যায় না। সুতরাং কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করে এর থেকে সঠিক পথ পেতে হলে সর্বপ্রথম 'আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ কারণেই 'আরবি ভাষা আমাদের একান্ত প্রিয় ভাষা হওয়া উচিৎ। রাসূল (স) বলেছেন।

অর্থ: তোমরা তিন কারণে আরবিকে ভালবাসবে। এক: আমি আরবি ভাষাভাষি মানুষ, দুই: কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং তিন: বেহেশতের ভাষা হবে আরবি।

তদুপরি বিভিন্ন তাফসীর, ফিকহ, আকাইদ[৫০৫] ও অন্যান্য ইসলামি সাহিত্যে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থরাজি আরবি ভাষায় লিখিত হয়েছে। এগুলো বুঝতে হলেও আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। যথাযথভাবে নামাজ আদায় করার জন্য বিশুদ্ধ উচ্চারণ পদ্ধতিতে আল কুরআনের তিলাওয়াত জানা অপরিহার্য। পৃথিবীর একটা বিরাট অঞ্চলের মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। আমাদের এদেশের বিপুল জনশক্তি সে সমস্ত দেশে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে বিপুল অর্থ-সম্পদ উপার্জন করছেন। তাই সার্বক্ষনিকভাবেই আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

---

502 আবু যফর সিদ্দীক, মোঃ আরবী সাহিত্য সমালোচনা, ঢাকা, সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ভূমিকা।

503 আল-কুর'আন, সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২।

504 মুয়াত্তা, কিতাবুল জামি, হাদীস নং, ১৬৬১; কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

505 আকাইদ: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কিত শাস্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

স্মর্তব্য, যেকোনো ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করতে হলে সে ভাষায় ব্যাকরণ সম্পর্কে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তদুপরি ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের জন্য এমনিতে আরবি ভাষা আয়ত্ত্ব করা সহজসাধ্য বিষয় নয়। তাই এ ভাষা আয়ত্ব করতে হলে ইলমে নাহুর কোনো বিকল্প নেই নাহুর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় বাক্যের মধ্যে নাহুর অবস্থান খাবারের মধ্যে লবনের ন্যায়। অর্থাৎ যেরূপভাবে লবনহীন খাবার সুস্বাদু হয় না, তদ্রুপ নাহুবিহীন আরবি ভাষার মজা পাওয়া যায় না। তাই আরবি ভাষার মজা বুঝতে হলে ইলমে নাহুর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ আরবি সাহিত্যিক আহমদ আমীনের মতে, আরবি ভাষা হলো উন্নত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় ভাষা। যারা আরবি ও অন্যান্য ভাষা বোঝেন তারা নিশ্চয় এ কথাটি অকপটে স্বীকার করবেন। শব্দ বিন্যাসের দিক দিয়ে অন্যান্য ভাষা থেকে আরবি ভাষা ভিন্নধর্মী। আরবি ভাষার মধ্যে নতুন নতুন অর্থবহ শব্দের যে পরিবর্তন ঘটে, অন্যান্য ভাষায় তা পরিলক্ষিত হয় না। একটি আরবি শব্দ থেকে অনেকগুলো নতুন শব্দ নির্গত হয়। প্রত্যেকটি নতুন শব্দ একটি বিশেষ অর্থ প্রদান করে। অন্য ভাষার ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে গণ্য।

আরবি ভাষাকে সহজবোধ্য করার জন্য এ যাবতকাল নাহু-ছরফ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এ যাবতকাল বাংলাদেশে আরবি ভাষার গ্রামারের উপর ইংরেজি ভাষায় রচিত কোনো গ্রন্থ আমার গোচরে আসেনি। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে ইংরেজি ভাষায় রচিত আরবি ভাষার গ্রামারের উপর এ বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হয়ত আবুল হাশিমের Arabic Made Eassy গ্রন্থটি প্রথম। ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষার্থীদেরকে আরবি ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে যে অভাব দীর্ঘদিন থেকে ছিল আবুল হাশিম উল্লিখিত গ্রন্থখানি লিখে অভাব বহুলাংশে পূর্ণ করেছেন। এটা তাঁর বিরাট অবদান। সহজ ও সরল ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হওয়ায় এটি যে কোনো ভাষাভাষী মানুষকে আরবি ভাষা শেখা ও বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

আলোচ্য গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, আল্লামা আবুল হাশিম ছিলেন একজ ভাষা বিজ্ঞানী। কারণ আরবি ও ইংরেজি দুটিই বিদেশী ভাষা। তাই দুটি ভাষায় সমান পারদর্শিতা না থাকলে একজন অন্ধ ও বাংলাভাষি মানুষের পক্ষে আরবি ভাষার গঠন প্রকৃতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে কলম ধরা সহজ ব্যাপার নয়। এ গ্রন্থ লেখার মধ্য দিয়েও আবুল হাশিমের মেধা, যোগ্যতা ও মনীষা সহজভাবে আন্দাজ করা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো এতে বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে যতগুলো অধ্যায়ের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে পৃথকভাবে অনুশীলনী

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজন করা হয়েছে। অনুশীলনীতে কিছু শব্দ এবং কিছু বাক্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শব্দের ব্যবহার করে কিভাবে বাক্য গঠন করতে হয়, এখানে তা দেখানো হয়েছে। আরবিতে রূপান্তর করার জন্য। অত্র গ্রন্থের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বাক্যই অত্যন্ত মিনিংফুল। ফলে গ্রন্থটি আরবি ভাষা প্রেমিকদের কাছে অনেক বেশি সমাদৃত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এই গ্রন্থটির প্রকাশক- খুরশীদ আজম খুরশীদ এন্টার প্রাইজ, ১১/৩, হেয়ার স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা-৩,পাকিস্তান, প্রকাশ কাল ১৯৬৯।

Arabic Made Easy এর বাংলা অর্থ হলো "সহজভাবে আরবি গঠন" কিংবা "সহজ উপায়ে আরবি শেখা"। এটি ইংরেজি ভাষায় রচিত একটি 'আরবি ব্যকরণ গ্রন্থ। আরবি ব্যকরণবিদদের মতে, জ্ঞানগবেষণার জগতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের সহিতো আবুল হাশিমের সুসম্পর্ক থাকায় বইটি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেন।

১৯৯০ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি। গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আবুল হাশিম বলেন:

"I am deeply grateful to Mohammad Mahamood Mustafa Shaban, Cultural Delegate of the Government of U.A.R at Dhaka and to my literary secretary Maulana Mohammad Emdadullah for the active co-opartion I recieved from them, In fact, the book is the out come of a joint enterprise."[506]

বইটি সম্পর্কে শামসুল 'উলামা আমীন আব্বাসী' বলেন:

"I have made critical study of the book. I am confident that a careful and intelligent study of the book would enable one to have a working knowledge of Arabic language in course of one year. I had been a professor of Arabic language and literature for thirty years and I am happy to find that the book really makes Arabic easy. The book is unique in its presentation of intricate problems of Arabic grammar and composition. Its appropriate examples elucidating application of

---

[506] Abul Hashim, Arabic Made Easy, Bangladesh co-operative book society Ltd, Chittagong-Dhaka, 1969, P.VI.

Dhaka University Institutional Repository

grammatical rules and its execises teach one how to speak and write correct Arabic. The book deals with grammatical rules essential for learning the language and does not discuss subtleties of Arabic garmmar which more often than not create confusion in the minds of the reader. I congratulate the author for his insight into principles of Arabic grammar and com position."[507]

বইটির প্রকাশক বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে বলা হয় যে:

"This book, (Arabic Made Eassy) we found to be the easiest guide and helping tool to learn Arabic through English medium. Arabic is noe of the original and old languages of the world and its importance is gradually increasing with growing memebership of Arabic Speaking nations in the UNO. Commercial importance of Arabic these days, needs not be emphasized.

We Muslims, must try to learn Arabic; at least to understand the Holy Quran properly, Considerable books have been published for learning "Arabic" but we think this book is by far the best in it's approach for learning the same within the shortest possible time and without disrupting normal daily activities."[508]

আলোচ্য গ্রন্থের গুরুত্ব ও এটির পঠনরীতির প্রসঙ্গে আবুল হাশিম বলেন:

"The book is intended to help learn the Arabic language within the shortest possible time without the least interference with normal life and work. Thorough study of one lesson a week will give working knowledge of Arabic language in fifteen months. Each lesson must be mastered before the next lesson is studies.

---

[507] Ibid, P. VII.

[508] Ibid, P. VIII.

Dhaka University Institutional Repository

Learning a foreign language requires a general idea of grammar. In this book the rules of grammar have been presented in the simplest forms with illustrations to make it easy to understand.

It is expected that the book will give a basic knowledge of Arabic language and will enable the readers to make further study of Arabic language and literature with the help of Arabic dictionary."[509]

এতে যে সমস্ত বিষয় স্থান পেয়েছে তা হলো:

The Alphabet
Vowel Points
Alphabets with Vowel Points
Various forms of Alphabets
Long Vowels
Reading and Writings
Grammar and Composition
Number The dual
Number The plural
Broken Plural
Prepositions
Personal Pronouns
Demonstrative Pronouns
Electives
Colors and bodily defects
Adverbs
and
The Hyperbole and the Dimuntive
Numerals (One to Ten)

---

[509] Abul Hashim, Arabic Made Easy, Op.cit, P.IX.

Dhaka University Institutional Repository

Numerals (Eleven to Nineteen)

Numerals (Twenty to Ninety-nine)

Numerals (Hundred and upwards)

The Ordinal Numbers

Fraction

Decimal

Verbs

Moods

Negatives

Derivatives

Classification of Simple Triliteral Verbs

Triliteral Verbs with addition of some letters to the root

Quadriliteral Verbs

Hamzated Verbs

Weak Verbs

Permutation of

Doubled Verb

Classification of Verbs according to their redicas

Con‡jvugation of some typical weak & Doubled verbs

Emphatic Verbs

Verbs expressing wonder

Defective Verbs

Conditional Sentence

Relative Pronouns

Particles resembling verbs

Some Verbs resembling defective verbs

The Objects

Distinctive Term

Dhaka University Institutional Repository

Verbs of Praise and blame

The Exceptive

Relative Adjectives

THE CREED OF ISLAM

The Creed of Islam Or The Reolutionary Character of Kalima

এটি আবুল হাশিমের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায় যে, বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে লীগের তরুণ কর্মী ও তাঁর রাজনীতির ছাত্রদের ইসলামের জীবন-দর্শন ও বৈপ্লবিক বিষয় সম্পর্কে ক্লাস করতেন। সে সময়েই তিনি ভেবেছিলেন ইংরেজিতে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করা দরকার, যাতে বিভিন্ন সময় ইসলামের গতিশীলতার উপর আরোপিত কলঙ্কের অপনোদন ঘটে এবং ইসলামের একটি নিখুঁত ও শাশ্বত রূপ দুনিয়াবাসীর সামনে উদ্ভাসিত হয়।

বস্তুত যুগে যুগে ইংরেজি লেখকদের বিভ্রান্তিমূলক বই-পুস্তক পাঠ করে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের পক্ষে বিপদগামী হওয়া এবং ধর্মের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হওয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এ পরিণতির কথা চিন্তা করে আবুল হাশিম তাঁর মানসিক উদ্বেগের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমগণের ধর্মীয় বিশ্বাস অটুট রাখার মানসে "The Creed of Islam" গ্রন্থ লেখার কাজে হাত দেন। মুসলিম লীগের রাজনীতি হতে অবসর নেয়ার পর থেকেই তিনি নিজেকে আরো বেশি করে নিয়োজিত করেন। ইসলামের জ্ঞান অনুশীলনে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পূর্ব থেকেই পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতা টাঙ্গাইলের শামসুল হক প্রায়ই আবুল হাশিমের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন শামসুল হক ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু। আবুল হাশিমের ন্যায় তাঁর মধ্যেও ইসলাম ও ইসলামি রাজনীতির প্রতি প্রচন্ড ঝোক ছিল। আবুল হাশিম তাঁকে পেয়ে খুবই খুশি হলেন এবং লেখা-লেখির কাজে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিতে লাগলেন। সে মোতাবেক The Creed of Islam এর পান্ডুলিপি তৈরীর উদ্দেশ্যে আবুল হাশিম মুখে মুখে বলে যেতেন এবং শামসুল হক তা কাগজে লিখে নিতেন। পান্ডুলিপি তৈরীর কাজ শেষ হলো বটে কিন্তু তখনও বই আকারে তা ছাপা ও প্রকাশিত হয়নি। তার আগেই ঐ পান্ডুলিপির অনুসরণে ইষৎ পরিবর্তন করে শামসুল হক নিজের নামে বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করা হয়। শামসুল হক

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক আবুল হাশিমের পাণ্ডুলিপি নকল করে বই প্রকাশ করতে তিনি খুবই মর্মাহতো হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন:

"শামসুল হক সাহেব সেবার বর্ধমান থেকে (বাড়িতে) যাওয়ার সময় রাজনৈতিক পার্টির খসড়া ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র ছাড়াও "The Creed of Islam" এর প্রথম খসড়ার একটি কার্বন কপি সঙ্গে নিয়ে যান। তিনি যাওয়ার কিছুদিন পর কামরুদ্দীন আহমদ সাহেব ঢাকা থেকে আব্বাকে একটি চিঠি লিখে জানান যে, শামসুল হক সাহেব আব্বার সেই খসড়াকে ভিত্তি করে 'রব্বানি দৃষ্টিতে ইসলাম' অথবা ঐ ধরনের কোনো নামে (প্রকৃতপক্ষে বইটির নাম হলো 'বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম') একটি বাংলা বই প্রকাশ করেছেন। সেটা জেনে আব্বা বিচলিত না হলেও দুঃখিত হয়েছিলেন।"[৫১০] শামসুল হকের স্বীকারোক্তি থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বইতে উল্লেখ করে বলেছেন: "তার লিখিত বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম' নামক বইটি লেখা হয়েছে জনাব আবুল হাশিম লিখিত 'কালেমার বৈপ্লবিক রূপ' (The Creed of Islam) নামক গ্রন্থ এবং সাপ্তাহিক মিল্লাতের প্রথম অধ্যায় 'কালেমা' শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে।"[৫১১]

পরবর্তীতে অবশ্য আবুল হাশিমের নির্দেশেই "The Creed of Islam" এর আলোকে আরো কিছু সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখার জন্য বিভিন্ন লোকের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। এতে আবুল হাশিমের লক্ষ্য ছিল, যাতে অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা সংকলন প্রকাশ করা, যাতে ইসলামের বিভিন্ন দিক সূচারুরূপে প্রতিভাত হয়। এ উদ্দেশ্যে অধ্যাপক আবুল কাসিমের কর্মতৎপরতায় ও অধ্যাপক 'আব্দুল গফুরের সম্পাদনায় 'বিপ্লবী উমর' নামক একখানা সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে হযরত 'উমর ফারুক (রা) এর জীবনের নানা দিকের উপর আলোচনা করেন মরহুম ড. হাসান জামান, অধ্যাপক আবুল কাসিম, অধ্যাপক আব্দুল গফুরসহ আরও অনেকে।[৫১২]

"Creed" শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'ধর্মমতো'[৫১৩]। ইংরেজিতে বল হয় A system of religious belief.. সুতরাং The Creed of Islam এর অর্থ হলো 'ইসলামের ধর্মমতো'। ভারতে থাকা অবস্থায় এটি লেখা হলেও ১৯৫০ সালে তিনি যখন স্থানীয়ভাবে ঢাকায় বলে

---

510 মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পা:), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১।

511 শামসুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

512 দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ১৭-১৮।

513 Ashu. Tosh Dev, Student's Favorite Dictionary, Priti Art Press, Dhaka, 1996.p.330.

Dhaka University Institutional Repository

আসেন তখন বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির কলেবর ছিল ১৬+১৫৮ পৃষ্ঠা। এতে ঠিকানা যা লেখা ছিল তা হলো:

First published: November, 1950

published by B.M Umar for UMAR Brothers, 23/1, Modanmohan Basak Road, Dacca.

Printed by Abdul Ghani Hazari at Al-Helal press. 3/1, Johnshon Road, Dacca.

বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল To Seekers of Truth

১৯৬৩ সালে ইসলামিক একাডেমী থেকে বইটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। একই স্থান থেকে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হয় ১৯৫০ সালের ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে। এই সংস্করণে প্রকাশকের পক্ষ হতে একটি নতুন ভূমিকা সংযুক্ত করা হয়। তাতে বলা হয়েছে:

"The Creed of Islam by late Mr. Abul Hashim is a landmark in the history of original thinking in Islam The book was frist printed in 1950 and was at once acclaimed as a basic contribution of revolutionary import. The book has been translated into Bengali, Urdu and Arabic. It has been prescribed as a referance book in the Al-Azhar University of Egypt. It was reprinted in 1970 by the then Islamic Academy and for many years it has been out of print.

Mr. Abul Hashim, one of the most redical exponents and profound philosophers of Islam of this century; breathed his last on 5th October, 1974. He has left behind a number of valuable and significant contributions in Bengali, English and Arabic.

The Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, considers it an honour to publish the 4th print of his magnum opus 'The Creed of Islam' and present it to the serious students of Islam, both at home and abroad."

বইটির প্রচ্ছদের পেছনের পৃষ্ঠায় আবুল হাশিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ইসলামের মর্মবাণী:

ইসলামের মর্মবাণী গ্রন্থটি হচ্ছে The Creed of Islam এর বাংলা অনুবাদ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২ সালে। এই গ্রন্থেরও একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে ছাপা হয়েছিল লেখকের কর্মসচিবের নাম। পরবর্তীকালে ইসলামিক একাডেমী এই গ্রন্থের অন্য একটি সংস্করণ প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গ্রন্থের আরেকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে নাম লেখা ছিল নিম্নরূপ:

"ইসলামের মর্মবাণী (কালিমার বিপ্লবী ব্যাখ্যা)

(The) Creed of Islam গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

মূল: আবুল হাশিম, অনুবাদ করেছেন: বদরুদ্দীন মুহাম্মদ উমর, অধ্যাপক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বইয়ের পেছনের প্রচ্ছদে লেখা রয়েছে: "ইসলামের মর্মবাণীর মূল গ্রন্থ (The) Creed of Islam 'ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' ইসলামিক পলিটিক্যাল থিওরিজ', পলিটিক্যাল ইকোনমী' ইত্যাদি বিষয় নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য সিরিজভুক্ত হয়েছে: যথা অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য: ম্যাকগ্রিল, কানাডা; আল-আজহার, আরব প্রজাতন্ত্র; করাচি, ঢাকা, রাজশাহী ও পাকিস্তান।

এছাড়া প্রকাশনা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রকাশনায়: ফারুক মাহমুদ

১৪৩ বংশাল রোড, ঢাকা। প্রচ্ছদ চিত্রণে: হাশিম খান।

ব্লক নির্মাণে পূর্বাচল প্রসেস ওয়ার্কস ১৪৩ বংশাল রোড, ঢাকা।

মুদ্রণে-মীর হাসান আলী, আইডিয়েল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১২৮ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ; ৩১ আগস্ট ১৯৬২।

১৯৮১ সালে ইসলামি ফাউন্ডেশন The Creed of Islam গ্রন্থের আরো একটি অনুবাদ প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী অনুবাদ গ্রন্থে লেখকের দার্শনিক ভাবের পুরোপুরি প্রকাশ পায়নি বলে নতুন করে এ উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে জানা যায়। নতুন করে অনুবাদ প্রকাশ করার কারণ ব্যাখ্যা করে এতে "প্রবন্ধ কথা" যোগ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের নাম দেয়া হয়েছিল "ইসলামের মর্মবাণী"। এর পরিবর্তে নতুন নামকরণ করা হয় "ইসলামের মর্মকথা।" এই শিরোনামে অনুবাদ করেন জনাব মুসলিম চৌধুরী। তিনি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্ট স্বীকার করে আবুল হাশিমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিবেদনস্বরূপ এই গ্রন্থটি বিনা সম্মানিতে অনুবাদ করেন। মূল বইতে The

Dhaka University Institutional Repository

Revolutionary Character of Kalima নামে বইয়ের যে উপ-শিরোনাম ছিল, এবারে এতে তা বাদ দেয়া হয়। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়:

অক্টোবর ১৯৮১, আশ্বিন ১৩৮৮, জেলহজ্ব ১৪০১

প্রকাশক: অধ্যাপক শাহেদ আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মুদ্রক: বাংলা উন্নয়ন প্রেস, ১৭ কৈলাশ ঘোষ লেন, ঢাকা। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২০+১২৮।

বইটির শুরুতেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক 'আব্দুল গফুর "আমাদের কথা" শিরোনামে একটি বাণী প্রদান করেছেন। শাহেদ 'আলীর "প্রসঙ্গ কথা" এতে স্থান পেয়েছে।

Bangladesh Co-operative book society এর পক্ষ হতে Creed of Islam এর পঞ্চম সংরক্ষণ ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। বহুরঙ্গের একটি শিল্পকর্মের প্রচ্ছদে বইটির কভার পৃষ্ঠায় লেখা আছে:

The Creed of Islam or The Revolutionary character of Kalima
Abul Hashim, Published by: Munawwar Ahmad
Chairman-Bangladesh co-operative book society Ltd
Nizamanzil, Jublee road, Chittagong

এই বইতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ১৯৮৫ প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণের অনুরূপ একটি ভূমিকা সংযুক্ত করা হয়। তাতে সোসাইটির পক্ষ হতে বলা হয় যে:

"The Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Considers it an honour to publish the 5th print of his magnum opus The Creed of Islam' and present it to the serious students of Islam, both at home and abroad. The society has decided to reprint his works gradually by and to restor them for future Generation. Mr. Bodruddin Omar his eldest son, the celebrated thinker and writer was very king to permit us to reprint it."[514]

উল্লেখ্য যে, অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত বইটি পাওয়া যায়নি। তবে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত মফিদুল হক কর্তৃক রচিত "আবুল হাশিম" শীর্ষক বইতে

---

[514] Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, Pp. VII-VIII.

Dhaka University Institutional Repository

মূল বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেখান থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমার গবেষণা কর্মের সকল স্থানে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি: থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি ব্যবহার করেছি।

বই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা:

The Creed of Islam গ্রন্থে আবুল হাশিম যে দর্শন তুলে ধরেছেন, তা হেগেল বা রবীঠাকুরের ভাববাদী দর্শন নয়, স্বীয় জীবনের অনুভূতিলব্ধ ব্যক্তিগত দর্শনও নয়, বরং তা হলো ইসলামের দর্শন তথা খোদাপ্রদত্ত দর্শন। সমগ্র ইউরোপ যখন নিমজ্জিত ছিল অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার অতলে, তখন সেই মধ্যযুগে কুর'আন ও হাদিসের প্রেরণাপুষ্ট মুসলমানরা কি করে মুক্তবুদ্ধি অনুশীলন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাধীন চর্চা এবং বর্ণাঢ্য দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল এ সব প্রশ্নের উত্তর এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। একদিকে কুর'আন হাদিস এবং অন্যদিকে গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শন কীভাবে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতিকে নির্ধারিত ও প্রভাবিত করেছে, তারও অনুসন্ধান করা হয়েছে এই গ্রন্থে।[৫১৫]

আবুল হাশিম এই গ্রন্থের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে যে ম্যাসেজটি দেয়ার চেষ্টা করেছেন, তাহলো কালিমায়ে তায়্যিবার অন্তর্নিহিতো ভাবধারার একটা পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরা। আবুল হাশিমের সব চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু হলো এই কালিমা। এটাই বিপ্লবের হাতিয়ার। কিয়ামতো অবধি এ শক্তি মানুষকে কল্যাণের দিকে অগ্রবর্তী করতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীলতার দাবীদার আধুনিক অনেক চিন্তাবিদ যখন ধর্মের অনুসারীদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন এবং ধর্ম তথা ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে বলে মনে করেছেন, তখন আবুল হাশিম ইসলামের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাম করে কালিমাকে চিন্তার জগতে একটি বিপ্লবী শ্লোগান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবুল হাশিম নৈরাশ্যবাদী ছিলেন; ছিলেন আশাবাদী। তাঁর মতে সব মতোবাদেরই উত্থান-পতন আছে। মুসলমানদেরও উত্থান-পতন হয়েছে। তিনি মনে করেন,কালিমার অনুসারীরা এক সময় বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল জীবনের সকল ক্ষেত্রে; আগামীতেও সে বিপ্লব ঘটাবে জীবনের সকল স্তরে। কিন্তু পার্থিব মোহের কারণে মুসলমানরা আজ পথভ্রষ্ট, কিন্তু তাদের ভ্রান্তি কোথায়, তা অনেকের কাছেই

---

515 এখানে বলা প্রয়োজন যে, ডিকটেশন দেয়ার সময় আবুল হাশিম ধূমপান করতেন বলে জানা যায়। এ সম্পর্কে এস এম আজিজুল হক শাজাহান বলেছিলেন, "তিনি মুরাদাবাদী হুক্কার নল মুখে দিয়ে গড় গড় করে টেনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়তেন। তাঁর পাশে বসা ব্যক্তিটির উপস্থিতি তাঁকে তাঁর চিন্তার বা ধ্যানের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতো না। তিনি হুক্কাটার নলটি হাতে নিতেই আর বলে যেতেন। পাশে বসা ব্যক্তিটি লিখে যেতেন। এমন করে তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন।" (মনসুর আহমদ, সৈয়দ, (সম্পা:), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩-১৪)

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট নয়। আবুল হাশিম সেই গলদ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, ইলামের মূলমন্ত্র যে কালিমা, সেই কারিমার প্রকৃত মর্ম থেকেই আমাদের বিচ্যুতি ঘটেছে। তিনি এই কালিমার মধ্যেই মানুষের ইহজাগতিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। আর সে কথাগুলোই আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

'The Creed of Islam' বইটি আবুল হাশিমের প্রথমগ্রন্থ হলেও এটি তাঁর মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল বলে স্বীকৃত। শান্তির ধর্ম ইসলামের বহুমুখি বিস্তার ও অবদানের ক্ষেত্রে নি:সন্দেহে এটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইসলামকে মানুষ একটি জীবন্ত শক্তিরূপে গ্রহণ করুক এমন একটা জেহাদি আশা নিয়েই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বইটি কেন লেখা হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করে আবুল হাশিম বলেন, মুতার যুদ্ধে পর পর কয়েকজন সেনাপতি যখন শাহাদত বরণ করলেন, তখন সর্বশেষ পর্যায়ে নবীজীর পক্ষ হতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় খালেদ বিন ওয়ালিদের উপর। তিনি নিজেও মনে করেন যে, কালিমা তথা ইসলামের মর্মার্থ যখন মানুষ ভুলতে বসেছিল, এমন এক শুন্যতার যুগে কালিমা তথা ইসলামের ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য হলো:

"The author places his first venture before the thinking public as a humble and grateful servant of God in the spirit in which the famous Muslim General Khalid-Ibni Walid took the standard of Islam as the self appointed by the Holy Prophet had fallen in the field leaving a vacuum. May God in His infinite beneficence and mercy guide us all in the right path and make Islam once again a living force in the affairs of man.

আবুল হাশিমের মতে, কালিমার মধ্যেই নিহিতো রয়েছে ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা এবং সব সমস্যার সমাধান। তিনি মনে করেন, ইসলামের মানবিক দিকগুলো মানুষ প্রায় ভুলেই গিয়েছে এবং কালিমার মানবিক দিকগুলো এতোদিন পর্যন্ত লেখা হয়নি। এজন্য তিনি কালিমার মূল্যবোধগুলো পুনরায় মানব সমাজের সামনে তুলে ধরার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। অবশ্য তিনি যে পুরোপুরি সফল হয়েছেন- এমন দাবি তিনি করেননি। এজন্য তিনি প্রতিভাবান চিন্তাশীল লেখকদেরকে ইসলামের পক্ষে কলম ধারণ করার আহব্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন:

"The human aspect of Islam has been long forgotten and for centuries no serious attempt has been made to formulate in concerete term; the human aspect of the contents of the Holy Qur'an and its creed,

Dhaka University Institutional Repository

the Kalima. The author in this small treatise has attempted in his humble way to rediscover humab values of Kalima and thus to lay the foundation of a humab approach to Islam in particular and religion in general in the expectation that really capable and talented persons will come forward and with the might of their pen will create once again a mighty revolution in thinking, feeling and action of man."[516]

বইটিতে কু'রআন ও হাদিসের প্রসঙ্গ টেনে অসংখ্য নতুন ও মৌলিক চিন্তার অবতারণা করা হয়েছে। বাইটি রচনায় তাঁর ধৈর্য্য, গবেষণা, প্রজ্ঞা এবং সতর্কতা প্রশংসার দাবী রাখে।

বইটিতে কালিমার বিশ্লেষণের পাশাপাশি আরেকটি অনিবার্য সত্যের দিকে আহবান করা হয়েছে। আর সেই সত্যটি হলো মানুষের 'রুবূবিয়্যাত' তথা লালন ও পালনবাদ গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টির কল্যাণে আত্মো নিয়োগ করা। মাওলানা আযাদ সোবহানীও মনে করেন, নামক গ্রন্থটি রব্বনিয়াত দর্শনকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে।[৫১৭] তিনি দুই-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পূর্ণরূপে একমতো পোষণ করেছেন।[৫১৮] গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

"The author of the Creed of Islam Janab Abul Hashim is my closest associate in thought and action. I have read the book word by word and line by line, and have weighed each word with great care and attention. It is my considered opinion that in the horizon of creative genious the book is a new star which appears in intervals of centuries and creates I revolution in the world of wisdom and original thingking. The beauty of the book lies in the philosophy which, my own writings apart, is still a sealed bottle of wine to the intelectuals of the world. This

---

516 Ibid, P.XV; "অর্থঃ ইসলামের মানবিক দিক বহু পূর্বেই ভুলে যাওয়া হয়েছে বহু শতাব্দির মধ্যে পবিত্র কুর'আনের বিষয়বস্তু এবং এর মূলতত্ত্ব কালিমার মানবিক দিকগুলো সহজবোধ্য ভাষায় সূত্রবদ্ধ হয়নি। লেখক তার এই ছোট পুস্তকে নিজের নগণ্য রীতিতে কালিমার মানবিক মূল্যবোধসমূহকে পুনরুদ্ধার করে বিশেষভাবে ইসলামকে এবং সাধারণভাবে সব ধর্মকে জানার একটি মানবীয় দৃষ্টিকোণের ভিত্তি স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এই আশায় যে, প্রকৃতদত্ত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে নিজেদের জোরে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মে আরেকবার মহাবিপ্লব ঘটাবেন।" (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্ম কথা, পূর্বোক্ত, দ্র. অবতরণিকা)

517 Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P.IX.

518 Ibid, P.IX.

Dhaka University Institutional Repository

philosophy is the phiosophy of Rubbaniyat which is a rare fruit of intellectual pursuit and is the very essence and spirit of the teachings of A1-Quran" [519]

গ্রন্থ সম্পর্কে আযাদ সোবহানী আরও বলেন:

"I feel proud that this masterpiece has been produced by one who is my nearest companion, comrade and brother. May the Creator, Sustainer and Evolver of the Univeres protect The Creed of Islam' and its reputed author under the wings of his Rubbaniyat."[520]

Creed of Islam গ্রন্থে আবুল হাশিমের মনীষা, যুক্তিশীলতা, ধর্ম বিশ্বাস এবং মানুষের শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আস্থার সম্মিলন ঘটেছে। যে আশা নিয়ে বই রচনায় হাত দিয়েছিলেন তার অনেকটা বাস্তব রূপ লাভ করেছে। সমাজে ইসলামের আশানুরোপ প্রতিফলন না হলেও তাঁর লিখিত ইসলাম ও ইসলামি দর্শন বিষয়ক Creed of Islam বইটি বুদ্ধিজীবী ও ইসলামি জ্ঞান সচেতন শিক্ষিত মানুষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রাখছে বলে আমার বিশ্বাস। এই বইটি তাঁকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। গ্রন্থটি শিক্ষিত সমাজে এতেঠটাই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভুক্ত রয়েছে।[৫২১]

এ গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে অনেক শিক্ষিত লোকের চিন্তার জগতে পরিবর্তন আসে এবং অনেকেই ইসলামকে নতুনরূপে চেনার সুযোগ লাভ করে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আহমদ ছফা বলেন:

'Creed of Islam' বইটা যখন পড়ার সুযোগ পেলাম, তখন তাঁর দিকে (আবুল হাশিমের) নতুন করে তাকাতে আরম্ভ করলাম। সে সময় আমার ইংরেজি ভাষায় অধিকার ছিল,

---

519. Ibid, p.1; অর্থঃ ইসলামের মর্মকথার লেখক জনাব আবুল হাশিম চিন্তা ও কর্মে আমার ঘনিষ্ঠতম সহযোগী আশি শব্দে শব্দে ছত্রে ছত্রে বইখানা পড়েছি এবং অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ তারকা যা শত শত বছরের ফাঁকে ফাঁকে আবির্ভূত হয়ে প্রজ্ঞা ও মৌলিক দৃষ্টির জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বইটির সৌন্দর্য তার দর্শনে, যা আমার লেখা ছাড়া এখনও বিশ্বের বুদ্ধিজীবিদের নাগালের বাইরে রয়েছে বলে আমার ধারণা। এ দর্শন হচ্ছে "রব্বানিয়ত" এর দর্শন যা জ্ঞান চর্চার এক দুর্লভ ফল ও আল কুর'আনের শিক্ষার সারমর্ম ও তাৎপর্য। (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্ম কথা, পৃ মুখবন্ধ)

520 Abul Hashim, The Creed of Islam. Opcit, P. XVI; "আমি গর্ববোধ করছি যে, এই বইখানা রচনা করেছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আমার ঘনিষ্ঠ সহচর, বন্ধু ও ভাই। বিশ্বের সৃস্টিকর্তা ও বিবর্তনকাল ইসলামের মর্মকথা ও এর স্বনামধন্য লেখককে তাঁর রব্বানিয়াতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। আমীন।" (আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. মুখবন্ধ)

521. এস মুজিবুল্যাহ, যৎকিঞ্চিৎ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

নিতান্তই সামান্য। তা সত্ত্বেও, হাশিম সাহেবের গদ্যরীতি, যুক্তির শক্তি, পঠনপাঠনের ব্যাপ্তি এবং সুগভীর মননশীলতা আমার মনে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে। আমি একেবারে স্কুল জীবন থেকে ন্যাপ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির লোকদের সংস্পর্শে বড় হয়েছি আমার মানস সংগঠনে কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের অনেকখানি প্রভাব অদ্যবধি সক্রিয়। এই পুস্তকখানি পাঠ করার পর আমি হাশিম সাহেবকে আমার গুরু মনে করতে থাকলাম। তাঁর বড় ছেলে প্রফেসর বদরুদ্দীন উমর ইসলামের মর্মবাণী শিরোনাম দিয়ে বইটির একটি বাংলা অনুবাদও করেছিলেন। এই বইটি পাঠ করা আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইসলাম সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে সামান্য পরিমাণ লেখাপড়া করার সুযোগ আমার হয়েছে। আবুল হাশিম তাঁর এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে আমার ভেতরের সেই বীজটি চারিয়ে দিয়েছেন।"[৫২২]

বই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন: "জনাব আবুল হাশিমকে চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসেবেই শ্রদ্ধা করতোম। তার লেখা The Creed of Islam বইটিও তাঁর এ পরিচয়ই বহন করে।"[৫২৩]

বই সম্পর্কে এ. জেড. এম শামসুল আলম বলেন, 'আবুল হাশিম সাহেবের লেখা কিছু বই ও প্রবন্ধ আছে তন্মধ্যে The Creed of Islam বইটি অন্যতম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এই সাইজের যতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে, তন্মধ্যে তাঁর The Creed of Islam বইটি আমার কাছে সর্বোত্তম বলে মনে হয়েছে। এটা শুধু আমার কথা নয়, বিদেশিরাও এটা স্বীকার করেছেন।'[৫২৪]

বইটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলো এই:

1. Introduction
2. Spiritual Revolution
3. Moral Revolution
4. Intellectual Revolution
5. Social Revolution
6. Political Revolution

---

522 মনসুর আহমদ, সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২-৩০৩।

523 গোলাম আযম, অধ্যাপক, জীবনে যা দেখলাম (১ম খন্ড). পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।

524 ১৪ অক্টোবর ২০০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে আবুল হাশিমের ৩০ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণ।

Dhaka University Institutional Repository

7. Economic Revolution and
8. Cultural Revolution

আবুল হাশিমের বিশ্বাস হলো, কালিমাই ইসলামি বিপ্লবের উৎস। কালিমার অন্তর্নিহিত মর্মবাণী না বোঝার কারণেই দুনিয়ার কাফির-মুশরিকরা রাব্বুল আলামীনের শক্তিমত্তার কথা ভুলে গিয়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাস্য হিসেবে মনে করে। আবুল হাশিমের বিশ্বাস হলো, দুনিয়ার কোনো মতোবাদই কালিমার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব ও কার্য্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। কালিমার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আজও তা মানুষকে সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে তিনি কালিমার আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন।

কালিমার আধ্যাত্মিক দিক হচ্ছে- মানবজীবনে সার্বভৌম সর্বশক্তিমান আল্লাহর ধারণা প্রতিষ্ঠা করা। এর নৈতিক দিক হচ্ছে সকল কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা আনয়ন করা। এর সামাজিক দিক হচ্ছে মানুষের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টিকরা। এর অর্থনৈতিক দিক হচ্ছে দুনিয়া থেকে জাতি, সম্প্রদায় গোত্র ও ব্যক্তি বিশেষের অধিকার লোপ করে সকল সম্প্রদায়ের ওপর সকল মানুষের সম ভোগ-দখলেও নীতির প্রবর্তন করা। এর রাজনৈতিক দিক হচ্ছে- সম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ সাধন করে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করা। এর সাংস্কৃতিক দিক হচ্ছে জাতির তাহযীব-তমুদ্দুনকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলা।

বইটি প্রথম অধ্যায় Introduction তথা ভূমিকাতে আবুল হাশিম 'মানবাধিকার' নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন যে, যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ [৫২৫] প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে তিনি জাতিসংঘের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছেন। জাতিসংঘের লোক দেখানো শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আবুল হাশিম আধুনিকা মহিলোর ঠোটের লিপস্টিকের সাথে তুলনা করেছেন। এ অবস্থা থেকে মুক্তি ও শান্তির পথে ফিরে যেতে হলে তিনি মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার আহবান জানিয়েছেন।

---

525 ১৯৪৪ সালের মধ্যে ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ওয়াশিংটন কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে করা হয়। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সনদ তৈরী হয়। ৫১ জাতি প্রথম এতে স্বাক্ষর করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৭০। সিকিউরিটি কাউন্সিলের ৫ জন স্থায়ী সদস্য চীন, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকরী করা হয়। এর সদর দফতর নিউইয়র্কে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম আলোচ্য অধ্যায়ে প্রজ্ঞার কার্যকরিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে তিনি পশ্চিম যুক্তিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তা চর্চার বদলে প্রাচ্য দেশীয় লোকদেরকে প্রজ্ঞা (রুহানী ইলম) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছেন। তিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে বুদ্ধির সমন্বয় সাধনের উপর জোর দিয়েছেন।[৫২৬]

'কুদরাত এবং ফিতরাত' হচ্ছে এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফিতরত হলো প্রকৃতি, কুদরত হলো পরম শক্তি। প্রথমে ভারতীয় দর্শনের আলোকে, অত:পর ইউরোপীয় দর্শনের সাহায্যে ফিতরত ও কুদরত সম্পর্কে লেখক নিজের কথা বলেছেন। কুদরত ও ফিতরত সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক ভারতীয় দর্শনের চর্চাকারীদের বক্তব্যকে উপেক্ষা করেছেন এবং ইউরোপীয় বস্তুবাদীদের প্রকৃতিবাদ ও শক্তিবাদকেও যথাযথ গুরুত্ব দেন নি।

ইসলামের মূলনীতির উৎসের ব্যাপারে আলোচ্য গ্রন্থের মতোবাদটিও আমার কাছে অভিনব বলে মনে হয়েছে। তিনি 'ফিতরাত' কে ইসলামের প্রথম উৎস, কুর'আনকে দ্বিতীয় উৎস, 'রাসূল করীম' (স.) বাণী ও কর্মকে তৃতীয় এবং 'খুলাফায়ে রাশিদীন ও নির্ভরযোগ্য সাহাবীগণের জীবনাদর্শকে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ উৎস বলে মনে করেন।[৫২৭] তাঁর এই ভাবধারার মধ্যে একটা নতুন আইডিউলজির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর এরূপ ব্যাখ্যা, একান্তই মৌলিক মতোবাদ বলেই মনে হয়। অবশ্য স্যার সৈয়দও এমন চিন্তা করতেন।

ইসলাম বিশারদগণ এযাবতকাল কুর'আনকেই ইসলামের প্রথম উৎস বলে চিহ্নিত করে আসছেন। আবুল হাশিম কর্তৃক হঠাৎ করে 'ফিতরাত'কে ইসলামের প্রথম উৎস বলে প্রচার করায় মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ইসলামের উৎসের কথা বলতে গিয়ে তিনি 'ইজমায়ে সাহাবা' এবং 'কিয়াসের' কথা বাদ দিয়েছেন। অথচ অন্য গ্রন্থে তিনি যুগের প্রয়োজনে ইজতিহাদ করার উপর তাগিদ আরোপ করে স্ববিরোধিতার পরিচয় দিয়েছেন।

আবুল হাশিম মনে করেন, মানুষের আকল-বুদ্ধি বা জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এজন্য তাকে অনেকটা আসমানী কিতাব তথা ঐশী গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হবে। তাঁর মতে, শুধুমাত্র জড়বাদী বিজ্ঞানের সাহায্যে কিংবা বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো কিছু আবিষ্কার করা যায় না। এজন্য ঐশী গ্রন্থের সাহায্য প্রয়োজন। তাঁর কাছে পবিত্র কুর'আনই হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক উৎস।[৫২৮]

---

526 Abul Hashim,THe Creed of Islam. Opcit, Pp. 8-9.

527 Ibid, P. 30.

528 Ibid, Pp. 42-43.

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম এখানে বেহেশত ও দোযখের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, বেহেশত ও দোযখ কেবল পরকালীন বিষয় নয়; পার্থিব চোখে তা দেখা না গেলেও জগৎ বেহেশত-দোযখ শুন্য নয়। মানুষ ইচ্ছা করলে এ দিনিয়াকেও বেহেশত রূপে গড়ে তুলতে পারে, আবার নরকেও পরিণত করতে পারে। তিনি এখানে বলার চেষ্টা করেছেন যে, জান্নাত-জাহান্নাম কেবল মৃত্যু পরবর্তী বিষয় নয়। দুনিয়ার জীবন সুন্দর হলে বৈষয়িক জীবনেও বেহেশতী পরিবেশ তৈরী হতে পারে।[৫২৯] বস্তুত তিনি মানুষের মনের শান্তি এবং এর উন্নত অবস্থাকেও বেহেশত ও দোযখের সাথে তুল না করেছেন।

আবুল হাশিমের মতে, "বেহেশত-দোযখ এই দুনিয়াতেই" এই ধারণার সাথে আমি দ্বিমতো পোষণ করি। কারণ কুর'আন হাদীসে বলা হয়েছে বেহেশত-দোযখ ভোগ করবে আখিরাতে। কিন্তু এই পৃথিবীতেই বেহেশত বিদ্যমান রয়েছে, এমন কথা কোথাও বলা হয়নি। দুনিয়াতে বেহেশতের অস্তিত্ব সর্ম্পকে আবুল হাশিম যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তা যেকোনো শিক্ষিত মানুষকে সন্দেহের ধুম্রজালে ফেলতে পারে।

আবুল হাশি Spiritual Revolution তথা আধ্যাত্মিক বিপ্লব অধ্যায়ে বহু ইশ্বরবাদ খন্ডন করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। লেখক বস্তবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজচেনতনার ধারণাকে খন্ডন করেছেন একেশ্বরবাদের আলোকে। ইসলামের একেশ্বরবাদের তত্ত্বকে যুক্তি ও ইতিহাসের আলোকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ইসলামের মর্মকথার মূল উদ্দেশ্য হলো মার্কসবাদকে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে খন্ডন করে এক আল্লাহবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা; আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্য, মানুষের প্রতি সৃষ্টির বাকি সব কিছুর আনগত্য, কালিমার এই শিক্ষা মানুষকে তার সীমা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে এবং এক আল্লাহবাদের ও নাস্তিকতা এই দুই চরমের মধ্যবর্তী উজ্জ্বল বিন্দু দেখিয়ে দেয়। আবুল হাশিম বস্তবাদের ব্যাপক পটভূমিতে এক আল্লাহবাদীদেরকে বিচার করেননি। ভাববাদের আলোকে একেশ্বরবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন। মোটকথা, আবুল হাশিম এখানে আত্মার উন্নতি সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫৩০]

আবুল হাশিম Moral Revolution অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, বিবেক হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি। 'আরবদের বিবেকশক্তি না থাকায় 'মানুষ যে সৃষ্টির সেরা জীব' একথা তারা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু কালিমা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল

---

529. Ibid, Pp. 42-43.

530. Abul Hashim, The Creed of Islam, Opcit, P. 7.

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার প্রভাব এতেঠটাই কার্যকর হয়েছিল যে,মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা তেমন একটা সৃষ্টি হতোনা। তাদের মনের পুলিশই তাদেরকে সমস্ত মন্দ কাজ হতে বাধা দিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের মধ্যে কালিমার সেই নৈতিক বিপ্লবের জোয়ার এসেছিল। আজও যদি মানুষ কালিমারকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে, তবে নৈতিকতা বিরোধিতা কোনো অপরাধ সৃষ্টি হতে পারে না।[৫৩১]

'আল্লামা আবুল হাশিম Intellectual Revolution তথা কালিমার আধ্যাত্মিক বিপ্লব অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, কালিমার মানসিক শক্তিই 'আরবদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অন্বেষণে অনুপ্রেরণা দান করেছিল। কালিমার গুণেই মানুষ নিজ প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছিল। আবুল হাশিমের বিশ্বাস হলো মুসলমানরা কালিমার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলেই অতীতের মুসলমানগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমাজবিদ, বৈজ্ঞানিকসহ বহু চিন্তাবিদ। তাঁরা ও তাদের কলমের শক্তিতে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মে আমুল পরিবর্তন সাধন করেছিল। এসবের উপর ভিত্তি করেই মূলত আধুনিক বিজ্ঞানের সুউচ্চ মিনার গড়ে উঠেছিল। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আজও যদি মুসলিম জাতিকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়, তবে কালিমার বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।[৫৩২]

Social Revolution অধ্যায়ে আবুল হাশিম কালিমার সাম্যের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রাক ইসলাম যুগে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো 'আরব দেশের মানুষের মধ্যেও সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অভাব ছিল প্রকট। কালিমার 'লা ইলাহা'র আঘাতে মানব সৃষ্ট সকল ভেদাভেদ ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। আদিম অধিবাসীদের সাথে ব্রাহ্মণদের ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তা তো দূরের কথা, তারা তাদের ছায়াও মাড়াত না। কিন্তু কালিমার প্রভাবে তাদের সেসব কুঅভ্যাস কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। 'আরব জাতি পরিণত হয় এক অদর্শবাদী জাতি রূপে। তিনি মনে করেন, ইসলামে সাম্য বলতে সকল কিছু সমান সমান ভাগ করে দেয়া নয়। মানুষ হাত, পা, চোখ, কানের দিক থেকে সমান হলেও তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা, শক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বংশ, পরিবার,সমাজ, পরিবেশ, শিক্ষা এবং সুযোগ সুবিধার কারণে তারতম্য হয়ে থাকে। বস্তুত মানুষ

---

531. Ibid, P.51-52.

532. Ibid, P. 81-82.

Dhaka University Institutional Repository

যেমন কর্ম করবে তেমন ফল ভোগ করবে। মানুষ ঠিকমতো খেলে, ঘুমালে, কিংবা বিশ্রাম করলে তার সুফল যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি অনিয়ম করলে, না খেলে, অখাদ্য, কু-খাদ্য খেলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেহের উপর হবে। আর এগুলো সবই মানুষের ক্রিয়া কর্মের প্রতিফল।

আবুল হাশিম মনে করেন, কালিমার অন্তর্নিহিতো ভাবধারার মধ্যে আল্লাহর পিতৃত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা মেলে। পিতা যেমন সন্তানদের অভিভাবক হিসেবে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, তদ্রুপ আল্লাহ হলেন সকল মানুষের পিতৃতুল্য এবং মানুষ হলো তার সন্তানতুল্য। আবুল হাশিম মনে করেন, প্রকৃতিগতভাবেই অসাম্য যুগে যুগে ছিল। এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বস্তুত পেশার ভিন্নতা, ধন-সম্পত্তির বৈষম্য থাকার কারণেই মানব সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সমাজে এরূপ ব্যবধান না থাকলে কোনো সমাজই সুশৃংখলভাবে চলত না। তাই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজে বিভিন্ন পেশার লোকও বিভিন্ন অবস্থার লোক থাকা স্বাভাবিক।[৫৩৩]

আবুল হাশিম Political Revolution তথা কালিমার রাজনৈতিক বিপ্লব বলতে মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতার বদলে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমের স্বীকৃতি দেয়াকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, আল্লাহ্ তায়ালার তা'আলার প্রভূত্বে বিশ্বাসী কোনো মানুষ ইসলামি হুকুমতো ভিন্ন মানব রচিত কোনো মনগড়া আইনকানুন ও মানতে পারে না। আবুল হাশিম মনে করেন যে, কালিমা আমাদেরকে এ নীতিই শিক্ষা দেয় যে, সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আইনকেই মানতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কিংবা সংখ্যালঘু লোকের মতোমতো এখানে বড় কথা নয়। ইসলামের চার খলীফার মনোনয়ন তথা নির্বাচনের বিষয়টি বিবেচনায় এনে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, খিলাফতে রাশিদার সময়কালই হচ্ছে বিশ্বের ইতিহাসে একমাত্র কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সুতরাং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের ইমাম নির্বাচন-পদ্ধতিই সর্বকালের জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণীয়।[৫৩৪]

Economic Revolution অধ্যায়ে আবুল হাশিম ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। অর্থনীতি সম্পর্কে ইসলামের মূল ঘোষণা হচ্ছে, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের নিরংকুশ মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। সম্পত্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতো মানুষের নেই। সুতরাং সম্পত্তিকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অনুমতিও মানুষকে দেয়া হয়নি। আবুল হাশিম এখানে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে ইসলামি অর্থনীতির বিপরীত হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি মনে করেন,

---

[৫৩৩] Abul Hashim, The Creed of Islam, Op.cit, p. 95-96.

[৫৩৪] Ibid, P. 117-18.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও মার্কসবাদী কমিউনিজম অভিন্ন নয়, আবার পরস্পর বিরোধিও নয় অর্থনীতির বিপরীত হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। ইসলাম হচ্ছে উৎস, যা থেকে কমিউনিজম ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, এ দুইয়েরই উৎপত্তি হয়েছে। একই উৎসের দৃশ্যত পরস্পর বিরোধী দু'টি তরঙ্গ কমিউনিজম ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাতিল করে দিয়ে। তিনি এখানে এ দু'টি ধারাকে সমন্বিত রূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত প্রক্ষে আবুল হাশিম স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রীকতা ও পুঁজিবাদের সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে ইসলামি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এর মাধ্যমেই বিশ্বে প্রকৃত সাম্যবাদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সুদ ছাড়াও যে সুষ্ঠভাবে ব্যাংকব্যবস্থা চলতে পারে এ বিষয়টিও আবুল হাশিম আলোচ্য অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন।[৫৩৫]

আবুল হাশিম বলেন, সম্পদ জমা করার জন্য নয়, বরং খরচ করার জন্য। তাঁর মতে, যাকাত ও মীরাসী আইন দ্বারা অগাধ পুঞ্জিভূত করার অনুমতি বোঝায় না। বরং সম্পদকে অনেকের মাঝে বন্টন করাকেই উৎসাহিতো করে।[৫৩৬]

এখানে আবুল হাশিমের বক্তব্যে দ্বিমুখিতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা সম্প সঞ্চয় করা না গেলে, অসময়ের বিপদ-আপদে কেউ সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসবেই এমনটা আশা করা যায় না। তাছাড়া যাকাত ও মীরাসী আইন না থাকলে সম্পদ বন্টনের প্রশ্নই বা কেন আসবে?

ইসলামে ভূমি নীতির প্রসঙ্গে আবুল হাশিমের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁর মতে, বিশ্বের সকল মানুষ এক জাতি হিসেবে যেখানে কাজের সুযোগ আছে, সেখানেই তাদের যাওয়ার অধিকার আছে এবং ভোগদখলেরও অধিকার রয়েছে। তাঁর মতে, মানব রচিত আইন তথা ভিসা প্রক্রিয়া মানুষের অবাধ চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কিন্তু সমাজে স্থায়ী শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির ধারা অব্যাহতো রাখতে হলে পৃথিবীর সকল দেশকে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। জন্মগতভাবে মানুষ যে দেশের হোক না কেন, সারা বিশ্বের সম্পদ সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে-এটাই ইসলামের শিক্ষা।

আবুল হাশিমের আলোচ্য বক্তব্যের মধ্যে একটা নতুন দিক নির্দেশনা রয়েছে। প্রশ্ন হলো, বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ভিসামুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা এবং যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও বসবাস

---

[535] Ibid, p. 148.

[536] Ibid, p. 149-50.

Dhaka University Institutional Repository

করা কি সম্ভব হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে এতেঠটুকু বলা যায় যে, তাঁর এই আশাবদ হয়ত কোনো এক সময় সফল হবে কিন্তু তখন হয়ত এই সমাজের কেউ থাকবে না।

শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদার বিষয়ে আবুল হাশিম বলেন, মানুষ মাত্রই শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করবে এটাই হলো কালিমার দর্শন। সকল নবী-রাসূল তাই করতেন। ইসলাম কাজের মূল্যায়ন করে, পেশাকেও নয়। মানুষ তার শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী যে কোনো কাজ করতে পারে, এতে কোনো লজ্জা নেই। এ সবই কালিমার সাংস্কৃতিক রূপ থেকে উদ্ভূত।

আবুল হাশিম Cultural Revolution তথা কালিমার সংস্কৃতি বলতে ললিতকলা ও সাহিত্যেকে বোঝাতে চাননি। তিনি কালিমার সংস্কৃতি বলতে মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ এবং কাজ-কর্মে এর প্রতিফলনকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে,একজন মুসলমানের জীবনাচরণ তথা আধ্যাত্মিক, নেতিক, বুদ্ধিগত, সংস্কৃতি। এ কারণে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি থেকে মুসলিম সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। তাই সংস্কৃতির নামে অশ্লীল গান-বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি যা কিছু মানুষের চারিত্রিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার কিছুই ইসলামি সংস্কৃতি হতে পারে না। সর্বোপরি জীবনের সর্বস্তরে সর্বোচ্চ মানে আরোহণ করার চেষ্টা-সাধনা করাই ইসলামি সংস্কৃতির মূল কথা।[৫৩৭]

ইসলামের মূল আদর্শ হলো মানুষকে পূর্ণরূপে গড়ে তোলা। ইসলাম চায় প্রতিটি মানুষকে তার সহস্র কার্যকারিতার ভেতর দেখতে। আলোচ্য গ্রন্থে আবুল হাশিম একজন পরিপূর্ণ মানুষের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর কোনো ধর্মেই জীবনের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা নেই। তাই সেই ধর্মগুলো পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কালিমার দর্শনের মধ্যে নিহিতো রয়েছে জীবনের সকল দিকের সুসম উন্নয়নের গ্যারান্টি। সুতরাং কালিমা মানুষকে পূর্ণ মানবরূপে গড়ে ওঠতে সাহায্য করে।[৫৩৮] বস্তুত আবুল হাশিমের ভাবধারার মধ্যদিয়ে দার্শনিক ও কবি 'আল্লামা ড. ইকবালের "ইনসানে কামিল" তথা পরিপূর্ণ মানবের চিত্রটিই ফুটে উঠে।

'The creed of Islam' গ্রন্থ সম্পর্কে যে কথাটি বলা যায় তা হলো, এ গ্রন্থটি ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সাহিত্যের উপর লেখা আবুল হাশিমের মনীষা সম্যকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটি রচনা করে তিনি ইসলামপন্থী ব্যক্তিদের নতুন করে চোখ খোলার সুযোগ করে দেন। আলোচ্য

---

537 Abul Hashim. The Creed of Islam, Op.cit, 154-64.

538 Ibid, p.64-45

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতির বিরাট খিদমতো সান করেছেন। নানা দিক থেকে বিচার করলে এ মহামূল্যবান পুস্তকখানা হলো মুসলিম জীবন-দর্শনের একটি অন্যতম দিক নির্দেশক। এক কথায় বলা যায়, 'The creed of Islam' গ্রন্থটি আবুল হাশিমকে অমর করে রাখবে।

গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও রচনা পর্যালোচনা

জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে গ্রন্থের বিকল্প নেই। গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে বহু মনীষী অনেক মূল্যবান কথা বলে গেছেন। কবি 'উমর খৈয়াম বেহেস্তে তাঁর প্রাথমিক সরঞ্জামের কথা বলতে গিয়ে গ্রন্থের কথা ভুলেননি। চার্লস ল্যাম্প বলেছিলেন, বই পড়তে যিনি ভালোবাসেন তার শত্রু কম। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছিলেন, বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলিয়া হয়নি। বাংলা সাহিত্যের কবি প্রমথ চৌধুরীর মতে, স্ব-শিক্ষিত লোক মাত্রই সুশিক্ষিত। এর জন্য প্রয়োজন শ্রম, সাধনা, ত্যাগ ও তিতীক্ষা।

জ্ঞানীরা জ্ঞান-চর্চার মসি দিয়ে লিখে রাখে তাদের কথা। সে জ্ঞান মানুষকে দেয় প্রাণ, দেয় গতি। মসির ক্ষুরধার লেখনিই মানুষের চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে পারে। মানুষের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলো চর্চায় সত্য ও সুন্দরের আলো। আবুল হাশিম মানব মনে সেই আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন। এজন্য মসিই তাঁর কাছে প্রধান হাতিয়ার। ইসলামের আলোকে মানবাত্মাকে জাগ্রত করার জন্যই তিনি কলম পরিচালনা করেছিলেন।

আবুল হাশিম যখন গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন, তখন তিনি প্রায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ কারণে গ্রন্থ রচনার পথে তিনি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারপরও তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই ও প্রবন্ধ লেখে গেছেন। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর লেখার পরিমাণ অনেক বেশি না হলেও বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক থেকে নিঃসন্দেহে তাঁর অবদান ছিল ব্যাপক। শেখ সা'দী[539] বলতেন, 'ভাবুক আর ভ্রমণকারী শ্রেষ্ঠদরবেশ। আবুল হাশিমের রচনা পড়ে আমি যা বুঝতে পেরেছি, তা হলো, তিনি ভাবতেন বেশি, লিখতেন কম। আর দার্শনিকদের বৈশিষ্ট্য হলো: তাঁরা যা কিছু লিখেন চিন্তাভাবনা করেই লিখে থাকেন। আবুল হাশিমের প্রতিটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রয়েছে। যদি জ্ঞান আহরণ করা না যায়, তবে কাঁড়ি কাঁড়ি বই থাকলেও লাভ নেই। বাংলাদেশে তো বইয়ের অভাব নেই। কিন্তু জাতিকে দিন নির্দেশনা দিতে পারে-এমন গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। বস্তুত ভাল বইয়ের সংখ্যা কম হলেও তার গুরুত্ব থাকে অনেক বেশি। বিশিষ্ট কবি মীর্যা

---

539 আজাদ সবহানী, 'আল্লামা, বিপ্লবী নবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

গালিব[৫৪০] মাত্র 'আঠার শ' লাইন কাব্য লিখে 'মীর তাকী মীর'[৫৪১] এর 'আশি হাজার' লাইন কবিতার উপর প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী[৫৪২] অনেক বেশি লিখেও ইকবালের মর্যাদায় উপনীত হতে পারেননি। শাপলা ফুল, জাতীয় ফুল হওয়া সত্ত্বেও শত শত শাপলা ফুল একটি গোলাপ ফুলের সৌরভ দিতে অক্ষম। 'আল্লামা আবুল হাশিমের ব্যাপারেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। লেখক আজ আমাদের সামনে নেই কিন্তু তিনি যে সমস্ত যুগান্তকারী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রেখে গেছেন, বিষয়বস্তুর বিচারে ও চিন্তাশীল পাঠকের কাছে নি:সন্দেহে তা অনেক বেশি গুরুত্বের দাবী রাখে।

আবুল হাশিমের লেখায় ইসলামের ব্যবহারিক দিক তথা শরী'অতের বিশ্লেষণ তেমন একটা স্থান পায়নি। মুসলমানদেরকে শরী'অতনিষ্ঠ করে তোলাও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক

---

540 মীর্যা গালিব এর অন্য নাম হল মীর্যা আসাদুল্লাহ খান (১৭৯৭-১৮৬৯)। পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত উর্দু ও ফার্সী ভাষার কবি। গালিবের কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভা আল্লাহ্ প্রদত্ত বলে জানা যায়। এজন্য তাঁর বিশ্বময় খ্যাতি রয়েছে; দশ বৎসর বয়স হতেই তিনি কবিতা চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে উর্দু কবি নাম হিসেবে 'আসাদ' ব্যবহার করতে এবং ফার্সী কবিতায় কবি নাম ব্যবহার করতেন 'গালিব'। অতপর উর্দূতেও গালিব নামটি ব্যবহার করতে থাকে। (ইসলামী, বিশ্বকোষ, ১০ খন্ড, পৃ.৪০১-০২)

541 মীর মুহাম্মদ তাকী (হি১১৩৫-১২২৫) উর্দু ভাষার একজন খ্যাতনামা কবি ও জীবনীকার। মীর এর পূর্বপুরুষ গুজরাট আগমন করেন। তাঁর পরদাদা আকবর আবাদে আসীয়া স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করেছিলেন। মীর তাকী কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। যথা 'কুল্লিয়াতে নাজমে উর্দু, নিকাতুশ শু'আরো, যিকরে মীর, দীওয়ানে ফার্সী, (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯ খন্ড, পৃ. ৩৬৩-৬৪)

542 আলতাফ হোসাইন হালীর (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রীঃ) জন্ম পানিপথে। পানিপথে তর্কশাস্ত্র, দর্শন, হাদীস, ফিকহ্ ইত্যাদির শিক্ষা শিক্ষার জন্য ১৮৫৪ সালে তিনি দিল্লী যান। তথায় তিনি বিখ্যাত উর্দু কবি গালিবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সেখানে একটি 'আরবী মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হলে সেই বিশৃঙ্খলার সময় তিনি পানিপথে ফিরে আসেন। তিনি চার বছর বাড়ীতে থাকার পর তিনি জাহাঙ্গীরাবাদের উর্দু কবি মুস্তফা খাঁ শিফতার সাহচর্য লাভ করেন (১৮৬৩) তাঁরই প্রভাবে কবি হালীর মনে আধুনিক উর্দু কবিতা রচনার প্রেরণা জন্মে। ১৮৭৪ খ্রীঃ. আযাদ 'আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাব' নামে লাহোরে একটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আধুনিক রুচি সম্পন্ন কবিদের কবিতা চর্চার ফলে আধুনিক উর্দু কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হালী বিভিন্ন কবি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমানদের দুরবস্থায় মর্মাহত হয়ে যে সব কবি ও সাহিত্যিক আপন লেখনী শক্তিকে জাতীয় জাগরণে উৎসর্গ করেছিলেন এবং যাদের পরশ পেয়ে উর্দু সাহিত্য প্রথমবারের মত জগত ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তাঁদের মধ্যে হালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত উর্দু কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, সমাজ সংস্কারক ও ধর্মীয় বক্তা। ১৮৭৫ খ্রীঃ হালী দিল্লীর আংলো অ্যারাবিক স্কুলে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৮৯ খ্রীঃ শিক্ষকতা ছেড়ে পানিপথে গমন করেন এবং জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যের নাম হল 'মুসাদদাস-এ-মদ্দ-জযর-এ-ইসলাম' (ইসলামের জোয়ার ভাটা)। 'মুসাদদাস-এহালী' তাঁর যুগসৃষ্টিকারী আরেকটি কাব্য। এরই ফলে তিনি জাতীয় কবিরূপে ভূষিত হন। তাঁর এ কাব্যটি তদাপ্রন্তন মুসলিম সমাজে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তাই হালীকে আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত বলা হয়। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে মুসাদদাস-এ-হালী হায়াত-এ-জাবীদ, হায়াত-এ-সাদী, ইয়াদগার-এ-গালিব, ও দীওয়ান-এ-হালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হালী পানিপথে ইন্তেকাল করেন। (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৪)

Dhaka University Institutional Repository

আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে ইসলামের অন্তর্নিহিতো মর্মবাণীই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। ইসলামের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। তাঁর প্রতিভা আর ক্ষুরধার লেখনি শক্তি দিয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাস আর স্বাতন্ত্রকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। আমৃত্যু তিনি লড়ে গেছেন অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে। তিনি ইসলামের বোধ, বিশ্বাস ও মননের সর্বাত্মক বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি ইসলামের আত্মক প্রেরণা, জেহাদী সুলভ মনোভাব, কর্ম ও গতিশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কামনা-বাসনা ছিল- মুসলিম জাতির জীবন-ব্যবস্থাকে ইসলামি প্রেরণার ছাঁচে গড়ে তোলা। যে পন্থা অবলম্বন করলে মুসলিম জাতি বিশ্বে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে, সেই দিকে তাদেরকে ধাবিত করার জন্যই তিনি মসি ধারণ করেছিলেন। ইসলাম বিষয়ক লেখনি বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি মিক্ষিত সমাজের মধ্যে নব জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আহমদ ছফা বলেন: "হাশিম সাহেবকে যদি না চিনতাম, যদি তাঁর বই না পড়তাম, ইসলাম ধর্মের আকীদা, ঈমান এই সব বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহই জন্মাতো না।"[৫৪৩]

মোট কথা ইসলামের দর্শন তুলে ধরার জন্যই তিনি গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন।

আবুল হাশিমের জ্ঞান–গরিমা পাশ্চাত্য একাডেমিক শিক্ষার মানদণ্ডে বিচার্য নয়। তিনি ছিলেন দিব্যদৃষ্টির অধিকারী এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি ছিলেন আমাদের ধর্ম তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। বাংলা ভাষাভাষী লোক হলেও লেখার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। ছাত্র থাকা কালে আবুল হাশিম দর্শনশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, আইন শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। স্কুল-কলেজে লেখা-পড়ার মাধ্যমে ইংরেজি হলেও ইংরেজি সাহিত্যে তিনি উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেননি। এতদসত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ। তৎকালে মুসলিম বুদ্ধিজীবি শ্রেণির এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষিত সমাজের চিন্তা-চেতনার ভাষাও ছিল ইংরেজি। বোধ হয় সেই কারণেই তিনি ইসলামের দর্শন মুসলিম শিক্ষিত সমাজ ও বিশ্ববাসীকে জানাবার জন্য তাঁর সকল চিন্তাধারাকে ইংরেজি ভাষায় রূপ দিয়েছেন। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের দর্শন ফুটিয়ে তোলার মতো বাংলা ভাষাভাষী লেখকের সংখ্যা খুব কম। এদিক থেকে 'আল্লামা আবুল হাশিম ছিলেন একজন দিকপাল। নিম্নে তাঁর গবেষণাধর্মী গ্রন্থের একটি তালিকা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব এবং গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

---

৫৪৩ মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

বহু চেষ্টা সাধনা এবং বিভিন্ন লাইব্রেরী ও বহু লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে আবুল হাশিম কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-যা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

"The Creed of Islam" (১৯৫০) পরবর্তীতে এটি "ইসলামের মর্মবাণী" ও "ইসলামের মর্মকথা" নামে প্রকাশিত হয়। "Contribution of Pakistan to Humanity" (১৯৬৪) পরবর্তীতে এটি "মানবতার সংকটে পাকিস্তানের ভূমিকা" নামে অনূদিত হয়। As I See It (১৯৬৫), "Integration of Pakistan" (১৯৬৭) পরবর্তীতে এটি "পাকিস্তানের সংহতি" নামে অনূদিত হয় (১৯৭০), "Arabic Made Easy" (১৯৬৯), "রাব্বানী দৃষ্টিতে" (দশটি নিবন্ধ সংকলন-১৯৭০), In Retrospect (১৯৭৪), পরবর্তীতে এটি "আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি" নামে অনূদিত হয় (১৯৮৭)। "মুসলিম দর্শনের রূপরেখা" (১৯৬৬), "মওলানা আকরাম খাঁ" (১৯৬৮), মওলানার ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত প্রবন্ধ,) "Let us go to war" (৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ এ তাঁর প্রেস বিজ্ঞপ্তি), "ইজতিহাদ", "আল ফাতিহা" (এটি 'আরবি ও ইংরেজি অনুদিত হয়), "ফারুকী খিলাফত", "আতিশয্যের শেষ পরিণতি", "How to Begin", "Economic problems and their solution in Islam"। বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে 'দি ডেইলী পিপল' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি আর্টিকেল লিখেন। আর্টিকেলগুলো হলোঃ The ideals of Bangladesh Secularism, The ideals of Bangladesh Nationalism, The Ideals of Bangladesh Socialism, Ideals of Bangladesh democracy. তাঁর অনেকগুলো অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিও রয়েছে।[৫৪৪]

১. মানবতার সংকটে পাকিস্তানের ভূমিকা

"মানবতার সংকটে পাকিস্তানের ভূমিকা" এটি আবুল হাশিমের একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ। মূল গ্রন্থের নাম হলো "Contribution of Pakistan to Humanity"। অনেক চেষ্টা করার পরও এর মূল কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৪ সালে 'মানবতার সংকটে পাকিস্তানের ভূমিকা' শিরোনামে ইসলামিক একাডেমী পত্রিকায় এটি ছাপা হয়। আলোচ্য গ্রন্থে আবুল হাশিম

---

৫৪৪ এস. মুজিবউল্যাহ, যৎকিঞ্চিৎ, ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭,পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেছেন যে, মনুষ্য জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং প্রকৃত সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করে সমৃদ্ধতর সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌছাতে হলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। যথা: (১) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্ব জাতীয়তাবাদ (২) মানুষের সার্বভৌমত্বের অস্বীকৃতি বা বিশ্ব সরকার কায়েম করা এবং (৩) সম্পদে ব্যক্তি মালিকানার অস্বীকৃতি বা বিশ্ব অর্থনীতি।[৫৪৫]

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি বিশ্ব মানব সংস্থা গঠনে যত প্রকার বাধা-বিপত্তি আসতে পারে, তার প্রায় সবগুলোই পাকিস্তান রাষ্ট্রে রয়েছে। এমতোাবস্থায় তার সম্ভাব্য সমাধান বের করাও পাকিস্তানের স্বাভাবিক দায়িত্ব। অত্র গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করে বলেন, পাকিস্তানী মানবগোষ্ঠি জাতিগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত নানারূপ বৈচিত্র্যের অধিকারী। এর এক অংশ থেকে অপর অংশ ভিন্ন জাতি ও দুহাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। তাঁর মতে, বিচিত্র জীবনযাপন প্রণালী থাকা সত্ত্বেও একটি সাধারণ আদর্শবাদ যদি পাকিস্তানীদের মধ্যে থাকে, তবে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই যে, পাকিস্তানের এ উদাহরণ ও প্রেরণা সমগ্র বিশ্বে একতা আনতে সহায়তা করবে।

আবুল হাশিম মনে করেন, পাকিস্তান হলো একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ও এর আদর্শবাদ হলো ইসলাম। পাকিস্তানীরা যদি কথায় ও কাজে, আক্ষরিক ও আন্তরিকভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে তারা বিশ্বমানবতাকে বহুবিদ দানে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, যেকালে সমগ্র সভ্যজগত বস্তুবাদের পাষাণ বেদিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেকালে আমরা পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছি। ইসলামের প্রতি যদি আমাদের আন্তরিকতা থাকে এবং যদি একাগ্রভাবে তা কার্যকরী করবার প্রয়াস পাই, তবে বিশ্বমানবের জন্য আজকের অতীব প্রয়োজনীয় একটা পরীক্ষার কাজ পাকিস্তান সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।[৫৪৬]

4. As I See It

আবুল হাশিমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম হলো As I See It.

গ্রন্থের প্রকাশক: শাহেদ আলী, পাবলিকেশন অফিসার, ইসলামিক একাডেমী

৬৭ পুরানাপল্টন, ঢাকা-২, প্রকাশ কাল ১৯৬৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩।

---

545. আবুল হাশিম, মানবতার সংকটে পাকিস্তানের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।

546 ঐ, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গ্রন্থটিকে তাঁর মুক্ত চিন্তার ফল বলে অভিহিত করে ছিলেন। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম বলেন:

"The contents of the book are the product of his free encuiry, guided more by his intrution than by his inteect."[547]

As I See It এর বাংলা অর্থ হলো "যেমন আমি ভাবি" কিংবা "আমার দৃষ্টিতে"। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সাহিত্যে-সভায় পঠিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর লিখিত স্বতন্ত্র নিবন্ধসমূহের সংকলনরূপে বইটি প্রকাশিত হয়। এতে ১৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

প্রবন্ধগুলো হলো:

1. Categories of Understanding of Divine will and Action
2. The Beautiful Model of Human conduct
3. Islamic Mind
4. Isamic Concept: Natural Religion
5. Islamci Way of Life: Its Social Basis
6. Human Rights in Islam
7. A Short Sketch of the Philosophy of Islam with a Prefatory Note on Nature of Philosophy
8. Islamic Values which should form the basis of social reconstmction
9. Islam and Economic Problems
10. Muslim view of the Family and the Place of Women in Isamic Society
11. The Miraj
12. History of Islam
13. Greatness of a Nation
14. On Alcoholic Drinks

---

[547] Abul Hashim, As I See It, Op.cit, p. Auther,s Preface.

Dhaka University Institutional Repository

" Categories of Understanding of Divine will and Action". শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল হাশিম আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় ও ক্রিয়াশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই পৃথিবীর সকল ভালো-মন্দ সৃষ্টি করেছেন। কেউ চক্ষুষ্মান কেই অন্ধ, কেউ জ্ঞানী কেউ বোকা-এটা যেমন আল্লাহ্রই হুকুমে হয়ে থাকে-তেমনি এগুলো মানুষের কর্মফলও বটে। মানুষ যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল ভোগ করবে-এটাই প্রকৃতির নিয়ম। বস্তুত আবুল হাশিম এখানে 'আল্লাহ্র অভিপ্রায়' বলতে আল্লাহ্র প্রকৃতি এবং আল্লাহর ক্রিয়া বলতে এই নিয়মের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন।[৫৪৮]

"The Beautiful Model of Human conduct" শীর্ষক প্রবন্ধটি আবুল হাশিম নবীপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেন। এখানে তিনি নবীজীর চারিত্রিক গুণাবলির একটা চমৎকার বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তির এক বা একাধিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করা কঠিন নয় কিন্তু ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহত্ত্বের শিখরে আরোহণ করা খুবই দুর্লভ। এমন মহত্ত্বের কৃতিত্ব লাভ করেছেন মাত্র একজনই, তিনি হলেন হযরত মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (স) এমন একজন মানুষের স্মরণে ইরানের বিখ্যাত ফার্সি কবি শেখ সাদী (র) রচিত 'আরবি কবিতায় মাত্র চারটি চরণের মধ্যে মহানবী (স) এর যে মহান চরিত্রের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন, তা এক কথায় অনন্য।[৫৪৯]

Islamic Mind- শীর্ষক অধ্যায়ে আবুল হাশিম একজন মুসলমানের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। বস্তুত একজন মুসলমানের লক্ষ্য হলো, আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার বেঁচে থাকা, আমার মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে। বস্তুত প্রত্যেক মানুষেরই একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। দার্শনিক নিটশের আইডিউলজি ছিল 'পারফেক্ট ম্যান' সেক্সপিয়ারের আইডিউলজি ছিল 'সুপুরিয়র ম্যান' ইকবালের আইডিউলজি ছিল মরদে মুমিন তথা ইনসানে কামিল। আবুল হাশিমও ইনসানে কামিলে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আলোচ্য অধ্যায়ে বলার চেষ্টা করেছে যে, মানুষ শুধু খাওয়ার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেননি; মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো বৈষয়কি কর্মের মধ্য দিয়ে আখিরাতের জীবন শান্তিময় করা। এজন্য তিনি আল্লাহর গুণাবলি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫৫০]

---

548 Abul Hashim,As I see It, Op. cit, P.13.
549 Ibid, 19-20.
550 Ibid, 23-24.

Dhaka University Institutional Repository

Islamic Way of Life: Its Social Basis শীর্ষক অধ্যায়ে আবুল হাশিম সমাজ জীবনে ইসলামের জীবন পদ্ধতি কেমন হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি এখানে বলার চেষ্টা করেছেন যে, একজন মুসলমানের জীবন পরিচালিত হতে হবে কুর'আন হাদীসে বর্ণিত জীবন পদ্ধতির আলোকে। যেমন আল্লাহ একত্ববাদের স্বীকৃতি, রাসূল (স) কে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ও রাসূল প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালিত করাই হলো একজন মুমিনের কর্তব্য এবং সেই সাথে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সৃষ্টজীব, প্রকৃতি ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল হওয়া। এক কথায় এখানে আবুল হাশিম আল্লাহর খলীফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই একটি গতানুগতিক বিষয় স্থান পেয়েছে।[৫৫১]

Islam Concept: Natural Religion এবং Human RIghts in Islam শীর্ষক দু'টি অধ্যায়ে আবুল হাশিম যুক্তির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ইসলাম হলো প্রকৃতির ধর্ম। প্রকৃতির আইন যেমন কারো প্রতি পক্ষ পাতিত্ব করে না, তদ্রুপ প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার আইনানুযায়ী পরিচালিত খিলাফতও কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না। আগুনের বৈশিষ্ট্য হলো পুড়িয়ে দেয়া। আগুনের মধ্যে দহনশক্তি থাকায় কেউ আগুনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে না। তেমনি আল্লাহর আইন মোতাবেক অপরাধীর শাস্তি হলে খিলাফতী আইনের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারোর থাকতে পারে না। আবুল হাশিমের মতে, প্রকৃতির আইনের মতোই খিলাফত আমলে রাষ্ট্রের আমীর থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজন কর্মচারীরও সমান অধিকার ছিল। ইসলামের নীতি হলো একজন পানি বহনকারী কিংবা কাষ্ট বহনকারীর জন্য যে আইন প্রযোজ্য, বাদশার জন্যও সেই একই আইন প্রযোজ্য হবে।[৫৫২]

A Short Sketch of the Philosophy of Islam with a Prefatory Note on Nature of Philosophy শীর্ষক অধ্যায়ে আবুল হাশিম সাধারণ দর্শন ও ইসলামি দর্শনের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রত্যেক দার্শনিকেরই নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। যেমন হিটলার ও মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে "জোর যার,মুলুক তার" এটি সত্য কথা। সুতরাং বৃহৎ মৎসটি যে ক্ষুদ্র মৎসটিকে খেয়ে ফেলবে তা স্বাভাবিক।

---

551 Abul Hashim, As I see It, Op.cit, 30-34.

552 Abul Hashim, As I see It, P. 26-27; 35-35.

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে ইসলামি দর্শনের রয়েছে একটি ভিন্নরূপ। আবুল হাশিমের মতে, যথার্থ দর্শন মাত্রই জীবন-দর্শন। অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এমন একটি সামগ্রিক ধারণা, যা সমানভাবে প্রভাবান্বিত করে চিন্তা ও কর্মকে। তিনি মনে করেন, যে দর্শনের সাথে বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ নেই, তার কোনো মূল্য নেই। তাই দার্শনিকের উচিত, চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় সাধণ করা এবং এই পৃথিবীটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সাথে সাথে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা।[৫৫৩]

উল্লেখ্য যে, আবুল হাশিম তাঁর Creed of Islam নামক গ্রন্থের Intellect and Intuition শিরোনামে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, আলোচ্য প্রবন্ধেও অনেকটা তা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের কথাও এখানে স্থান পেয়েছে। আবুল হাশিম এখানে আরো যা দেখানোর চেষ্টা করেছেন তা হলো, বর্তমান বিশ্ব বস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে অনেক উন্নতি করেছে সত্য কিন্তু ১ম বিশ্বযুদ্ধ, ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো ৩য় বিশ্বযুদ্ধের পায়তারা করছে। এর কারণ হিসেবে তিনি দায়ী করেছেন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের স্খলনকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি মানুষকে একটি বিশ্বজনীন জীবন-পদ্ধতি তথা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার আহবান জানিয়েছেন।[৫৫৪]

Islamic Values which should form the basis of social reconstruction শীর্ষক আবুল হাশিম, সামাজিক মূল্যবোধ, আল্লাহর গুণাবলি অর্জন, আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইসলামের বিচার পদ্ধতি, সম্পদের মালিকানা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বমানবতাবাদ, ইসলামি সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন।[৫৫৫]

অর্থনীতি সম্পর্কে আবুল হাশিমের বক্তব্য উল্লেখ রয়েছে Islam and Economic Problems শীর্ষক অধ্যায়ে। The creed of Islam এবং As I see It নামক গ্রন্থে। ইসলামের অর্থনীতি নিয়ে প্রায় একই ধরনের আলোচনা করা হয়েছে। বিলাস দ্রব্য উৎপাদন ও আমদানীর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে আবুল হাশিম এখানে বলেন, মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে কেবল এমন দ্রব্যের উৎপাদন ও বাজারজাত করাকেই ইসলাম উৎসাহিতো করে। তাই যেকোন অকল্যাণকর ও বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করা হতে মুসলিমকে বিরত থাকতে হবে।[৫৫৬]

---

553 Ibid, P. 41.
554 Ibid, p. 42-43.
555 Ibid, 43-57
556 Ibid, 58-68

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম Muslim view of the Family and the Place of Women in Islamic Society এই প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র হবে আলাদা আলাদা। কোনো পুরুষ নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে, কিংবা কোনো নারী পুরুষের কর্মকে বেছে নিলে, তাতে উভয়েরই নির্দিষ্ট বিধি লংঘন করা হবে। সুতরাং এই উভয় শ্রেণি যখন নিজ নিজ গন্ডিতে যথার্থভাবে কাজ করবে, তখনি সৃষ্টি-কর্ম সফল হয়েছে বলে বলা যাবে।

নাবালেগ নাবালেগার বিয়ে বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের বিরোধীতা করে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে আবুল হাশিম বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী যদি তার পিতা বা দাদার অভিভাবকত্ব ছাড়া বিবাহ করতে অথবা ভঙ্গ করতে পারে, তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে তাদের পিতা বা দাদার সম্মতিতে বিবাহ হয়ে থাকলেও প্রাপ্ত বয়স্ক বা বয়স্কা হওয়ার পর ঐ বিবাহ টিকিয়ে রাখা না রাখার অধিকার তাকে প্রদান করা কুর'আন সুন্নাহ বিরোধী হবে না। তিনি আরো মনে করেন, যুগের প্রয়োজনে যদি বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করা হয়, তবে তাও বিন্দামাত্র শরী'অত বিরোধী হবে না।

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে আবুল হাশিম বলেন, পুরুষের প্রকৃতি হচ্ছে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা। তাদের যৌন-ক্ষমতো নারীর তুলনায় অধিকতর। তাই যৌক্তিক কারণেই পুরুষকে বহু বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারলে মহিলো কেন তা করতে পারবে না-এ প্রশ্নে আবুল হাশিম বলেণ, যদি একজন মহিলো একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে চায়, তবে স্ত্রীর গর্ভে যে বাচ্চা জন্ম নিবে, তা নির্ধারণ করা হয়ে কষ্টকর। তাই কোনো স্ত্রীই একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না।

তালাক প্রশ্নে আবুল হাশি বলেন, ইসলামে স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতো স্বামীরই রয়েছে। তবে শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীও তার স্বামীকে খোলা তালাক দিতে পারে। তবে ইসলামে বিভিন্ন কারণে তালাক দানের ক্ষমতো স্বামীর হাতে অর্পণ করাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। দু'জন স্ত্রীলোককে কেন একজন পুরুষের সমান ধরা হলো এ প্রশ্নে আবুল হাশিম বলেন, নারীজাতির মধ্যে বিভিন্ন দুর্বলতা থাকার কারণেই আল্লাহ তা'আলা পক্ষ হতে এমান বিধান দেয়া হয়েছে।

ইসলাম অপ্রধান প্রথা ও পাশ্চাত্য উচ্ছৃখলতা এ দু'টি অকল্যাণের মাঝখানে এক অনুপম সমাধান দিয়েছে যাকে পর্দাপ্রথা বলা হয়। মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে না, এমন কোনো নেতিবাচক নির্দেশ কুর'আন-হাদীসে পাওয়া যায় না। সুতরাং নারীরা পর্দাসহ ঘরের বাইরে তথা স্কুল, কলজে,

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমনকি আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজনে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবে।[৫৫৭]

The Miraj অধ্যায়ে আবুল হাশিম মিরাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি মিরাজ আধ্যাত্মিক ছিল না শারীরিক ছিল সে বিতর্কও তুলে ধরেছেন। রাসূল (স) এর মিরাজে গমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আবুল হাশিম বলেন, মিরাজের মাধ্যমে নবীজীকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। যথা: মহাজগৎ সম্পর্কে প্রত্যেক জ্ঞান দান, মহাবিশ্বে আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়সমূহ কিভাবে কার্যকর হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করা। মানুষ কিভাবে নিজ কাজের মধ্য দিয়ে নিজের ভাগ্যকে গড়ে নিচ্ছে কিংবা নষ্ট করছে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।[৫৫৮]

আবুল হাশিম History of Islam (ইসলামের ইতিহাস) শীর্ষক শিরোনামে ইতিহাস লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেক ঐতিহাসিককে দেখা গেছে যে, তাঁরা মূলত History of Muslim এর উপর ভিত্তি করে বই লিখেছেন- অথচ তাঁরা এর নামকরণ করেছেন History of Islam। তাঁর মতে, যারা History of Islam এর নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা মূলত মুসলিম রাজা-বাদশাদের ইতিহাসই লিখেছেন। তাই এটাকে বড় জোর 'মুসলমানদের ইতিহাস' বলা যেতে পারে। ইসলামের ইতিহাস বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আবুল হাশিম জাস্টিস আমীর আলী ও পিকে হিট্টীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেণ, অন্যান্য ইতিহাস লেখকদের মতো তাঁরা মুসলিম শাসকদের ইতিহাস রচনা করেছেন কিন্তু ইসলামের ইতিহাস বলে নামকরণ করেননি বরং তাঁরা যে বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বই এর নামকরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবুল হাশিম বলেন:

"Mr. Justice Ameer Ali, the reputed thinker and scholar, titled his book 'The History of Saracens' and not history of Islam, the Amercian istorian Hitti Titles his book the History of the Arabs' and not history of Islam."[559]

---

[557] Abul Hashim, As I see It, Op.cit, P. 67-78.

[558] Ibid, P.79-80.

[559] Abul Hashim, As I see It, Op.cit, P. 82; অর্থ: বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও স্কলার বিচারপতি আমীর আলী তাঁর লিখিত বইয়ের শিরোনাম দিয়েছেন The History of Saracens (আরবের ইতিহাস)- তিনি ইসলামের ইতিহাস নাম দেননি। অনুরোপভাবে আমেরিকান/ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক হিট্টিও তাঁর বই এর শিরোনাম দিয়েছেন History of the Arabs (আরব জাতির ইতিহাস) ইসলামের ইতিহাসরূপে নামকরণ করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম বলেন, অনেক লেখকের লেখাতেই ইসলামের ইহিত্যোসের নামে মুসলিম শাসকদের অপশাসনের চিত্র তুলে ধরা হয়, অথচ ইসলামের ইতিহাসে বিপ্লব সৃস্টিকারী স্বর্ণালী যুগের ইতিহাস তুলে ধরা হয় না এবং প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসও তাতে তুলে ধরা হয় না। ফলে এর দ্বারা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, ইসলামের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে যে, নবীজীর (স) সময় এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকালে ইসলামের ছায়াতলে দলে দলে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে। একটি অসভ্য ও বর্বর জাতি তাঁদের পুরনো কুঅভ্যাস ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সভ্য ও অনুপম জাতিতে পরিণত হয়। আবার পৃথিবীবাসী এটাও দেখতে পেল যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের ৩০ বছর পার হওয়ার পর, মুসলিম নামধারী শাসকরা তাঁরে পূর্বসূরীদের আদর্শ ত্যাগ করায় কিভাবে তাঁদের সামাজিক সংহতি ধ্বংস হয়ে গেল।[৫৬০]

আবুল হাশিম বলেন, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে যারাই ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করেছে, তারাই বিশ্বের উন্নততর জাতি হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পাশ্চাত্য জগত তথা খ্রীষ্টান, ইহুদী সম্প্রায় ইসলামের ব্যবহারিক দিক তথা নামাজ, রোযা ইত্যাদি পালন করে না। কিন্তু ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষা তথা পরিশ্রম, সততা, সত্যতা, আন্তরিকতা, মানবতাবোধ, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বশীভূত করে সেই শক্তিকে দীন-দুনিয়ার উন্নয়নে প্রয়োগ ইত্যাদ তাঁরা গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অন্য দিকে মুসলিম জাতি ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ধরে রাখতে না পারায় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আবুল হাশিম আমাদেরকে একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করায় পাশ্চাত্য জগত বৈষয়িক উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে ইসলামের আদশ ত্যাগ করায় মুসলিম নামধারী শাসক শ্রেণী থেকে শাসন ক্ষমতা আজ বিধর্মীদের হাতে চলে গেছে। ইতিহাস লেখকদের প্রতি অভিযোগ এনে আবুল হাশিম বলেন, ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহনের ফলে পাশ্চাত্য জগত কিভাবে উন্নতি সাধন করল, তার ইতিহাস আজ আর লেখা হয় না, বরং ইসলামের ইতিহাসের নামে যা লেখা হয়, তা হলো মুসলিম রাজা-বাদশাদের ইতিহাস। আর এটাকেই ইসলামের ইতিহাস বলে অভিহিতো করা হয়। আবুল হাশিম আরো বলেন, ইসলামের ইতিহাস নামে

---

560 Ibid, P. 84.

Dhaka University Institutional Repository

যে সব বিষয়বস্তু পড়ানো হয়, তা আসলে 'ইসলামের ইতিহাস' নয়। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের ইতিহাস হলো ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করে যুগে যুগে নবী-রাসূল এবং খুলাফায়ে রাশিদীনগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিভাবে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন- সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কিন্তু বর্তমানে ইসলামের ইতিহাস নামে যা পড়ানো হয়, তাতে ইসলামের ইতিহাসের বিষয়বস্তু ছিটেফোটা থাকলেও তা থেকে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা লাভ করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে পাঠ্য তালিকায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তার অধিকাংশই প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসের সিলেবাসভুক্ত নয়। বস্তুত পক্ষে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ইসলামের ইতিহাস নামে সাধারণ ইতিহাসই পড়ানো হয়ে থাকে। তাই আবুল হাশিম বিশ্বের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী তথা দার্শনি সমাজবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকদের প্রতি প্রকৃত ইসলামের ইতিহাস রচনার আহবান জানান। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

"I draw the attention of eminent of eminent philosophers, sociologists and historiant to this problem in the expectation that their intelectual wealth will eventually produce for our study a real hsitory of Islam distinct from the hsitory of Muslim nations, which every unfortunately now passes as the history of Islam."[561]

আবুল হাশিম বলেন, অনেকে মুসলিম জাতির পতনকে ইসলামের পতন বলে মনে করে থাকেন-এ কথাটি ঠিক নয়। তাঁর মতে, মুসলিম জাতির পতন হয়েছে- এটা ঠিক; কিন্তু ইসলামের পতন হয়েছে এমনটা বলা যাবে না। মুসলমানরা ইসলামের আদর্শ ধরে রাখতে না পারার কারণেই তারা ধংস হয়েছে। কিন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যারাই ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করেছে পৃথিবীতে তারাই উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাসে তার ভূরী ভূরী দৃষ্টান্ত রয়েছে। আজকের দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, দায়িত্বশীলতার গুণ মুসলিম অপেক্ষা অমুসলিমদের মধ্যেই বেশি লক্ষনীয়। এক সময় এসব গুণাবলী মুসলিমদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। যতদিন তাঁদের মধ্যে এসব গুণ বিদ্যমান ছিল, ততদিন তাঁরা ছিল পৃথিবীর শাসক। কিন্তু যখনি তাদের মধ্য হতে এসব গুণ বিদায় নিয়েছে, তখনি তাদের পতন হয়েছে। সততা,

---

561 Abul Hashim, As I see It, Op.cit, P. 84; অর্থ আমি বিখ্যাত দার্শনিক, দার্শনিক সমাজবিদ ও ঐতিহাসিকদের এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই আশায়, যেন তাদের বুদ্ধিমত্তার সম্পদ অচিরেই আমাদের সত্যিকার ইসলামের ইতিহাস লিখতে পারেন, যা হবে মুসলিম জাতির ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র। দু:খের বিষয় মুসলমান জাতির ইতিহাসকে, ইসলামের ইতিহাস বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণগুলো আজ অনেকাংশে অমুসলিমদের মধ্যে দেখা যায়। তাই তাদের উন্নতি আজ শনৈঃ শনৈঃ পর্যায়ে। মুসলমানদের পতনের কারণ হলো তাদের মধ্যে আজ ইসলামি চরিত্র নেই। কাজেই মুসলমানের দুর্বলতার কারণে বৈষয়িক দুনিয়ায় তাদের যে পতন হয়েছে এটাকে ইসলামের পতন বলা যাবে না।[৫৬২]

Greatness of a Nation প্রবন্ধে আবুল হাশিম বলার চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে অমীয় সম্ভাবনার গুণ দিয়ে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষই নিজ ক্ষমতো সম্পর্কে অবগত নয়। আর এটা না জানার কারণেই মানুষ প্রাকৃতিক বস্তুর পুঁজা করে থাকে। আবুল হাশিম বলেণ, মানুষ নিজের মধ্যে নিহিতো আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে অবহিতো না হওয়ার কারণে কখনো বিভ্রান্ত বা বুদ্ধিহারা হয়ে সৃষ্টির সবকিছুতে দেবত্ব আরোপ করে; কখনো সে প্রকৃতির বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পায়; কখনো মানুষের বিষয় কর্মের মধ্যে, কখনো ফুল ও গাছের মধ্যে, কখনো নির্জনতার মধ্যে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ যদি নিজ সম্পর্কে জানতে পারে যে, সে কে, কোথায় সে ছিল, কোথেকে এসেছে, কেনই বা এসেছে, তার দায়িত্ব কি- এসব প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব হলেই মানুষ আল্লাহ্কে চিনতে সক্ষম হবে। আর যেই জাতি এই কাজটি দক্ষতার সাথে করতে সক্ষম হবে, তারাই হবে মহৎ জাতি।[৫৬৩]

On Alcoholic drinks তথা মাদক পানীয় প্রসঙ্গে আবুল হাশিম মাদক দ্রব্যের নিষিদ্ধের পর্যায়ক্রমিক ধারা বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন যে, ইসলামের কোনো বিধানই চূড়ান্ত নহে। সকল নীতিরই ব্যতিক্রম আছে। মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষ যখন সুস্থ্য থাকবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য কিংবা কঠিন ব্যাধি নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন হলে এবং কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা না গেলে, চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেমাদক দ্রব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। কোনো বিধর্মীর একান্ত ই মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে তা কিভাবে সরবরাহ করা হবে আবুল হাশিম আলোচ্য প্রবন্ধে তারও একটা প্রস্তাবনা পেশ করেছেন।[৫৬৪]

---

562 Abul Hashim, As I see It, Op.cit, p.82.

563 Ibid, p. 86.

564 Ibid, p. 88-93.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামকে আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের পটভূমিতে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আবুল হাশিমের অসাধারণ দক্ষতার কথা স্বীকার করেও আমরা বলতে পারি-তাঁর কোনো কোনো বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমতো পোষণের অবকাশ রয়েছে। এরূপ দু-একটি বিষয়ে তাঁর মতোমতের সঙ্গে একমতো হতে না পারলেও "As I see It" পুস্তকের অন্যান্য সকল মতামতের সাথে আমি একমতো পোষণ করি। তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো-তিনি একই কথা একাধিক স্থানে বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছেন- এই গ্রন্থটি তাঁর 'Creed of Islam' গ্রন্থের চর্বিত চর্বন।

দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ 'As I See It গ্রন্থকে 'Creed of Islam' এর পরিশিষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৬৫] তিনি মনে করেন, 'Creed of Islam' গ্রন্থে আবুল হাশিম যে সব বিষয় গোছালোভাবে আলোচনা করতে পারেননি 'As I See It' গ্রন্থে তিনি সেগুলোর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

আমিও মনে করি, 'As I See It' গ্রন্থটিকে আবুল হাশিমের 'Creed of Islam' এর বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলির ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে তুলে ধরা গোছালো রূপ বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার, আবুল হাশিম অন্ধ হওয়ার কারণে তাঁর সমস্ত রচনা ডিকটেশনের মাধ্যমে লিখিত হয়েছে। তাই নিজস্ব চিন্তা ভাবনা স্মৃতি থেকে বলার কারণে কোনো কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তার পরও বলতে হয় যে, সাবধানতা অবলম্বন করলে এ গ্রন্থে যে সব বিষয় একাধিকবার এসেছে তিনি তা পরিহার করতে পারতেন। এতে করে আবুল হাশিমের ভাবমূর্তি পাঠকদের সামনে আরো উজ্জ্বল হতো।

৫. Integration of Pakistan

Publlished by: Syyed Mujibullah

2/2REamkrishna Mission Road. Dhaka, Pakistan.

Printed by: Powel Prining Press. Dhaka, Total Pages: 51.

আবুল হাশিম পাকিস্তানকে দেখেছিলেন আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্ররূপে। তথায় ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি সফল হননি। এর কারণ কি ছিল তা তিনি আলোচ্য গ্রন্থে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

---

565 ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-জুন ১৯৮১, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ইসলামের নীতিমালা কিরূপে বাস্তবায়িত করা যায়, তিনি এর একটা ফর্মূলা আলোচ্য গ্রন্থে বাতলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ছিল পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে মুসলিমদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা। এই চেতনাবোধ থেকেই উপমহাদেশের দশ কোটি লোক মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এবং পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তারপরও পাকিস্তানে ইসলামি শাষন কায়েম না হওয়ার জন্য আবুল হাশিম অত্র বইটিতে তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। যথা: (১) সুবিধাবাদী রাজনীতি, (২) ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি এবং (৩) শ্লোগান সর্বস্ব ইসলামি রাজনীতি।

তদুপরি তিনি ইসলাম পন্থীদেরকেও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা (১) গোঁড়া বা গতানুতিক, (২) নফসানী এবং (৩) রব্বানী।[৫৬৬]

আবুল হাশিম এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিফলন না ঘটিয়ে একটি রাষ্ট্রকে কেবল ইসলামি রাষ্ট্র নামে অভিহিতো করলে এবং সোনার অক্ষরে আল কুর'আন লিপিবদ্ধ করলেই কোনো রাষ্ট্র ইসলামি রাষ্ট্র হবে না। বরং ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য যে সব উপাদান থাকা অত্যাবশ্যক, তা সৃষ্টি করতে হবে। তিনি মনে করেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত যারা ক্ষমতোায় ছিলেন, তাঁরা পাকিস্তানকে একটা ইসলামি রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা কেমন হবে, তার কোনো রূপরেখা তাদের সামনে ছিল না। এতেঠদসত্ত্বেও সস্তা জনপ্রিয়তা পাবার আশায় তাঁরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। আবুল হাশিম মনে করেন, জোড়াতালি দিয়ে কোনো রাষ্ট্রকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা যায় না। এর জন্যে সর্ব প্রথম প্রয়োজন হলো জাতির চিন্তায় ও কর্মে পুরোপুরি বিপ্লব সাধন করে জনগণকে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা। এজন্য আবুল হাশিম একক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫৬৭]

৬. পাকিস্তানের সংহতি

মূল: Integration of Pakistan.

অনুবাদ: মোহাম্মদ ইব্রাহীম। বইটি 'ইসলামিক একাডেমী' ১৯৭০ সালে প্রকাশ করে। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৯।

---

[566] Abul Hashim, Integration of Pakistan, Op.cit, P. 36; 38.

[567] Ibid, P. 49.

Dhaka University Institutional Repository

৮. রব্বানী দৃষ্টিতে

আবুল হামিমের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক অপর গ্রন্থটির শিরোনাম হলো 'রব্বানী দৃষ্টিতে'।

প্রকাশক: আবজুর গিফারী সোসাইটির পক্ষে অধ্যাপক শাহেদ আলী। প্রকাশকাল, ১৯৭০।

এতেও আবুল হাশিমের মনীষা সম্যকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে আবুল হাশিম নিজেই বলেছেন, শাসক ও শোষণ নহে, আল্লাহর পালন নীতির আলোকেই এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছে এবং এজন্যই এর নামকরণ করা হয়েছে রব্বানী দৃষ্টিতে।[৫৬৮]

উল্লেখ্য যে, এর কয়েকটি প্রবন্ধ 'As I See It' নামক ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হিসেবে পুনরুল্লেখ রয়েছে। এতে নিম্নলিখিত দশটি নিবন্ধ সংকলিত হয়।

নিবন্ধগুলো হলো:

১। আল ফাতিহা

২। ইজতিহাদ

৩। সমাজের জন্ম ও জীবন

৪। সমাজ জীবনে গতি বৈচিত্র

৫। সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামি মূল্যবোধ

৬। ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা

৭। ইসলামি সংস্কৃতির অর্থ

৮। ইসলামে পরিবারের মর্যাদা ও নারীর স্থান

৯। ফারুকী খিলাফত

১০। আতিশয্যের শেষ পরিণতি

"সূরা আল ফাতিহা" আবুল হাশিমের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এতে তাঁর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ গ্রন্থ পাঠ করলে মনে হবে যে, ইকবালের ভাববাদী দর্শন তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। তিনি এখানে সূরা "আলে-ইমরানে" উচ্চারিত রব্বানী শব্দটিকে বিশ্বমানের কল্যাণকামীতার উৎসধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রব্বানিতন্ত্রকে যুক্তিগ্রাহ্য করবার মানসে আবুল

---

568 আবুল হাশিম, রব্বানী দৃষ্টিতে, পূর্বোক্ত, পৃ. চ।

Dhaka University Institutional Repository

হাশিম রচনা করেছেন সুরা "আল ফাতিহার" তাফসীর। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা আবদুর রহীম প্রমুখ বিখ্যাত আলিমগণ সূরা ফাতিহার উপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী সূরাটির অর্থ হলো ও তাত্ত্বিক দিক কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন। আবুল হাশিম সুরাটির তাফসীর করতে গিয়ে শব্দার্থের উপর জোর না দিয়ে ভাবের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফাতিহার তাফসীরের মধ্য দিয়ে আল কুর'আনের সারাংশকে তুলে ধরা। লেখক সূরাটির মধ্যে মানব জীবনের বিকাশ এবং সম্ভাবনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছেন। মানুষের নৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক দিক নিয়ে আলোকপাত করার সময়ে লেখক উপলব্ধি করেছেন যে মানবাত্মার পরিপূর্ণতা সৃষ্টিকর্তার কৃপার মধ্যেই নিহিতো রয়েছে। এ দিক থেকে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ লিখিত 'উম্মুল কিতাবের' ব্যাখ্যার সাথে আবুল হাশিমের ব্যাখ্যার একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সূরা ফাতিহার তাফসীর লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। আবুল হাশিম তা করেননি। তাঁর কাছে সূরা ফাতিহা হলো শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসস্থল। মানুষের সত্তার আলোকে সূরা ফাতিহার বাণীকে হাজির করেছেন আবুল হাশিম। সূরা ফাতিহার বাণী অবলম্বনে তিনি ব্যক্ত করেছেন সূরাটির মূল বক্তব্যকে। এ জন্যই সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সুরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। সূরা আল ফাতিহা যেমন কুর'আনুল কারীমের জ্ঞানবৃক্ষের বীজ, ঠিক তেমনি সালাত ইসলামের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বীজ। এ কারণেই সালাতের সহিতো সুরা ফাতিহার সম্পর্ক এতেঠ নিগূঢ়। তাই আবুল হাশিমের সূরা ফাতিহার তাফসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আহমদ ছফা বলেন:

"এ রচনাটি পড়ে আমি অভিভূত হয়ে যাই। মানুষ নারীর সৌন্দর্যের কথা বলে, পুরুষের শারীরিক সৌন্দর্যের কথা বলে কিন্তু জ্ঞানী পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে যে অপূর্ব সৌন্দর্য নিহিত থাকে, কয়জন সেটা অনুভব করতে পারে। এই উম্মুল কুরআন পাঠও আমার জীবনে একটা সুদূর প্রসারী ভূমিকা রেখেছিল।"[৫৬৯]

পরবর্তীতে আবুল হাশিম রচিত সূরা ফাতিহার তাফসীরের গুরুত্ব অনুভব করে বাংলা থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন ওস্তাদ মুহাম্মদ মাহমুদ মুস্তফা শা'বান। এটি ১৯৭৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬০।

---

[৫৬৯] মনসুল আহমদ, সৈয়দ (সম্পা:), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

'ইজতিহাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটি আবুল হাশিমকে অন্যতম ইসলামি চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদীরূপে প্রকাশ করেছে। ইজতিহাদ সম্পর্কে ড. আল্লামা ইকবাল এবং আবুল আলা মওদূদীও (র) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা ইকবাল যুগের আলোকে ধর্মীয় দর্শনকে পুনর্গঠনের প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর Reconstrution of Religious Thought in Islam নামক দীর্ঘ বক্তৃতামালায়। আবুল হাশিমের রচনাটি এতেঠ দীর্ঘ নয়। অন্যান্যদের সাথে আবুল হাশিমের পার্থক্য হলো তিনি ইজতিহাদের ব্যাখ্যা যতটা যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন অন্যরা তা পেরেছেন কি না সন্দেহ। রচনাটিতে ইজাতিহাদের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের একটি চিত্র তুরে ধরেছেন। ইজতিহাদ প্রবন্ধটি আসলে আবুল হাশিমের ইসলামিক সংস্কার আন্দোলনের সার সংকলন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবুল হাশিম মনে করেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়া ইসলামের গতিশীলতা অব্যাহতো রাখতে হলে বা ইসলামকে গতিশীল ও সজীব রাখতে হলে ইজতিহাদ করা অপরিহার্য। তখনই এই ইজতিহাদ মুসলমানদের জন্য রহমতো বা আর্শিবাদরূপে পরিচালিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সব সমস্যা সমাধানের জন্য কুর'আন ও হাদীসের উপর নির্ভরশীল হতে বলেছেন, তেমনি বুদ্ধিও ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল কুরআনের জ্ঞানের সহিতো বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা সব সমস্যার সমাধান করার পদ্ধতির নামই হলো ইজতিহাদ।

আবুল হাশিম তাঁর ইজতিহাদ শীর্ষক প্রবন্ধে হাদীসে রাসূলকে কুরআনের মতো শাশ্বত বলে মনে করেননি। তাঁর মতে, অধিকাংশ হাদিসই রাসূল (স) এর ব্যক্তিজীবন ও তদানীন্তন যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থও সংকলিত হয়েছে নবম শতাব্দীতে। তাই এই সব হাদিস গ্রন্থের মধ্যে কোনো কোনো হাদিস যথার্থ এবং কোনোগুলো নয় এর বিচার বিশ্লেষণ করার অবকাশ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এজন্য তিনি নতুন করে বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের সংকলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫৭০]

"সমাজের জন্ম ও জীবন" এবং "সমাজ জীবনে গতি বৈচিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আবুল হাশিমের সমাজ চিন্তা স্থান পেয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুনের থিউরী অবলম্বন করে আবুল হাশিম বলেন, ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় এবং মৃত্যু আছে। তিনি মনে করেন, জন্ম লাভ করলে মরতে হবে এটা বিধির বিধান। জন্ম-মৃত্যুর এই প্রাকৃতিক নিয়মেই হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবী রাসূল এবং মুহাম্মদ (স) জন্ম লাভ করেছেন আবার

---

570 আবুল হাশিম, রব্বানী দৃষ্টিতের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল করেছেন। তবে মুহাম্মদ (স) এর মৃত্যুর অর্থ এই নয় যে,তাঁর প্রবর্তিত ইসলামের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর প্রবর্তিত যে জীবনাদর্শ তার স্থায়ীত্ব ক্ষেত্র বিশেষে স্বল্প ও অধিক হতে পারে। কিন্তু একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, মুহাম্মদ (স) প্রবর্তিত জীবনাদর্শ মহাকালকে উপেক্ষা করে যুগে যুগে নতুন নতুন সমাজ সৃষ্টি করবে।[৫৭১] আবুল হাশিম এখানে সামাজিক বিবর্তনের তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। যথা: এক: প্রাকৃতিক,দুই: অর্থনৈতিক এবং তিন: আদর্শগত। তাঁর মতে, আদর্শ ভিত্তিক সমাজের কাছে কোনো সমাজই টিকে থাকতে পারে না। পৃথিবীতে রক্তভিত্তিক, স্বার্থভিত্তিক ও আদর্শভিত্তিক সমাজ লক্ষ্য করা যায়। রক্তভিত্তিক ও স্বার্থভিত্তিক সমাজে স্থায়ী বন্ধন গড়ে উঠে না। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস স্থায়ীভাবে সমাজকে বদলে দেয়।

সমাজের জন্ম ও জীবন, সমাজ জীবনের গতি বৈচিত্র্য প্রভৃতির ভাষা এবং বিষয়বস্তু আমাদের সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সমাজ বিজ্ঞানী আবুল হাশিমের এক নতুন রূপ আমাদেরকে কেবল চমৎকৃতই করে না, সমাজের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনার দিগন্তকে প্রসারিত করে।

"সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামি মূল্যবোধ" এই প্রবন্ধটি আবুল হাশিমের Islamic Values which should form the basis of social reconstruction এর বাংলা অনুবাদ। এই প্রবন্ধটি ইসলামি একাডেমী পত্রিকায় ১৯৬২ সালে জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ছাপা হয়। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা এ প্রবন্ধটি আবুল হাশিমের Islam and Economic Problems শীর্ষক প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ। ইতোপূর্বে ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর Creed of Islam গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আবুল হাশিম দাস প্রথার বিলোপ সাধন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, আল কুরআন এমন এক যুগে নাযিল হয় যে সময় দাস প্রথা তৎকালীন উৎপাদনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তখন পর্যন্ত মানব জাতি মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়নি। তাই দাস-প্রথা অকস্মাত বিলোপ সাধন করা সম্ভব হয়নি। আবুল হাশিম বলেন, যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে আমরা ইতর প্রাণীকে ভাবরাহী জন্তু হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারি। তেমনি দাস-প্রথার বিধানটি বিলোপ করা মুসলমানের উচিত।

---

571 ঐ, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

"ইসলামে পরিবারের মর্যাদা ও নারীর স্থান" এই প্রবন্ধটি আবুল হাশিমের Muslum views of the Family and the Place of Women in Islamic Society এর বাংলা অনুবাদ। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইতোপূর্বেও Creed of Islam গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

"ফারুকী লিখাফত" শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল হাশিম হযরত উমর (রা) এর খিলাফত-কালকে (৬৩৪-৬৪৪) সর্বকালের আদর্শ খিলাফত বলে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি প্রথম ১৯৫১ সালে পুস্তিকারে প্রকাশ করেন জনাব ফকির মুহাম্মদ। দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। পরে এটি ইসলামিক একাডেমীর ত্রৈমাসিক পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

প্রবন্ধটির প্রথম অনুচ্ছেদে উপমহাদেশে মুসলমানদের একটি আবাসভূমির সৃষ্টির উদ্দেশ্যের কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন হলো আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মেই একটা আদর্শ রাজ্যের কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দুদের আদর্শ রাজ্য বলতে রামরাজ্যকে কল্পনা করা হয়। খ্রিষ্টানদের আদর্শ রাজ্য হলো ঈশ্বর নগরী। আর মুসলমানদের আদর্শ রাজ্যের নমূনা তুলে ধরা হয়েছে ফারুকী খিলাফতের মধ্যে। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য যে জীবন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়, তার সার্থক রূপকার হলেন হযরত উমর (রা)। আল্লাহর রাসূল ইসলামি শরীয়তের ভিত্তিতে যে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তা ষোলকলায় পূর্ণ হয় হযরত উমরের হাতে। তিনি সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক মমত্ববোধের নযীর পেশ করে গেছেন। পরিচ্ছন্ন প্রশাসন, প্রজারঞ্জক ও যোদ্ধা উমর ছিলেন সততা ও কর্তব্য নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথমে তিনি চৌদ্দশত বছর পূর্বে মদিনার জীবনপ্রবাহের সঙ্গে আজকের বিজ্ঞানের যুগের জটিল জীবন প্রবাহের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। অতঃপর তিনি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে হযরত উমরের শাসন ব্যবস্থাকে মদীনায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁকে বিশ্ব আঙ্গিকে সকল যুগ ও কালের জন্য আদর্শরূপে জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন।[৩৭২]

"আতিশয্যের শেষ পরিণতি" শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল হাশিম বিভিন্ন সময় মুসলিমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ায় তাদের জীবনবোধে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, তা তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের পর থেকে ইসলামি জীবনধারা মুসলিম জীবন থেকে অনেকাংশে নির্বাসিত হয়। তাঁর মতে, মুসলিম জগতের আমীর-উমারা,

---

372 আবুল হাশিম, রব্বানী দৃষ্টিতে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

শাহানশাহ ও সুলতানেরা বিশাল ভূখণ্ড জয় করে ইসলামের খেদমতো করেছেন বলেন যে বুলি আওড়ে থাকেন, তা সত্য নয়, বরং তা হলো ব্যক্তিগত ও বংশগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি সেই বুলির স্বরূপ উদঘাটন করে মুসলিম জাতিকে সজাগ করেছেন। এই সুবাদে তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের পর থেকে আরম্ভ করে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত নামসর্বস্ব মুসলমান শাসকদের শাসনকার্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

আবুল হাশিম এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমীরে মু'আবিয়া (রা) এর সময় থেকেই ইসলামের প্রকৃত রূপ হারিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তীতে বংশের অনেক খলীফা ভোগ-বিলাসে মেতে উঠেছিল। উমাইয়া সম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে রাষ্ট্রের সর্বত্র সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আসে। এ সুযোগে উমাইয়া শাসকবর্গ আরাম-আয়েশ ও আড়ম্বর-প্রিয় হয়ে উঠে। তাঁদের নৈতিক অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে উমাইয়া শাসনের পতনের পর থেকে মুসলমানের যে পতন শুরু হলো, তা আর রোধ করা যায়নি। আবুল হাশিম মনে করেন, বস্তুতান্ত্রিক দিক দিয়ে আব্বাসী যুগ মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগ; কিন্তু আদর্শের দিক থেকে তা চরম পতনের যুগ। মুসলমানরা যেদিন থেকে ভোগ বিলাস ও জাঁকমকপূর্ণ জীবন যাপন শুরু করে, সেদিন থেকেই ইসলামের পতনের সূচনা হয়"[৫৭৩] ১৭৫৭ খ্রী. পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিতো হওয়ার জন্য আবুল হাশিম মুসলমানদের ভোগ-বিলাসিতাকেই দায়ী করেছেন।

৯. In Retrospect

বইটি প্রকাশ করেছে সুবর্ণ পাবলিশার্স

২২ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৭৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৯২।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি', ১৯৭৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২১৬।

Retrospect শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো স্মৃতি মন্থন, অতীতের চিন্তা, অতীতের দিকে দৃষ্টি View of post events.[574] এটি আবুল হাশিমের কর্মস্থল উদ্দীপনাময় জীবনের রাজনীতির সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, এই গ্রন্থটি তাঁর পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিকথা নয়।

---

573 A.T Dev, Op.cit, p. 724.

574. A.T Dev, Op. cit, p. 724

Dhaka University Institutional Repository

এটা মুখ্যতঃ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সেই পর্ব নিয়ে রচিত, যখন অবিভক্ত বাঙলার রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বইটির সূচীপত্রের শিরোনামগুলো হলো:

Childhood

In school and College

As a Lawyer

Mr. Fazlul Huq leaves the Muslim League

The Provincial Muslim League Office and the Party House

The Financial Policy of the provincial Muslim League

Tour Begins

Amendment of the COnstitution

The Battle of Dacca

The Battle of Calcutta

The Draft Manifesto

The Long Tour

The Chalakchar Conference

The Provincial Parliamentary Board

The General Election

Suhrawardy Ministry in Bengal

The Direct Action Resolution

The Riots

The Cabinet Mission

The Interim Government

The Contest for Presidentship of Bengal Muslim League

Partition of Bengal

Appendices

Index

আত্মচরিত গ্রন্থ দুই কারণে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এক, এর মাধ্যমে ব্যক্তি মানসের পরিচিতি লাভ করা যায়, যা নানা কারণে লোভনীয় হয়ে থাকে।

দুই, এতে বিশেষ যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ নানাবিধ ছবি ফুটে উঠে, যা পাঠককে জ্ঞান ও আনন্দ দান করে।[৫৭৫] বাংলা ভাষায় অসংখ্য আত্মজীবনী লেখা হয়েছে। এগুলো লেখা না হলে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত। আত্মজীবনী লেখা মানে জীবন পথে পিছনের দিকে ফিরে দেখা। রাজনীতির স্মৃতিই এতে বেশি স্থান পেয়েছে। এজন্যই আবুল হাশিম বইটির নাম দিয়েছে 'In Retrospection' বইটি লেখা না হলে আজকের বাংলাদেশ কোনো ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাতে আবুল হাশিমের ভূমিকা কি ছিল, তার অনেক কিছুই জানা সম্ভব হতো না।

আত্মজীবনী লেখা কঠিন। কঠিন এজন্য যে, এর বেশিরভাগ কথাই স্মৃতি হতে লিখতে হয়। এজন্যই পর্যায়ক্রমিক ধারা রক্ষা করে আবুল হাশিম তাঁর জীবনের ঘটনার বর্ণনা এই বইতে দিতে পারেননি। জীবনের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা দিতে গিয়ে যখন যা মনে পড়েছে, তাই তিনি গ্রন্থে সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এজন্য কারো কারো কাছে হয়ত বইটি কিছুটা এলোমেলো ও অসংগত মনে হতে পারে। আবুল হাশিমের ন্যায় বৃটিশ এবং পাকিস্তানি কালোত্তর বাংলাদেশে আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও ইসলামি রেনেসাঁর একনিষ্ঠ সেবক তেমন বেশি নেই। দীর্ঘদিন ব্যাপী তিনি সেই সময়কার উপমহাদেশীয় রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, পারিবারিক জীবনপ্রাণালী অবলোকন করেছিলেন এবং উপমহাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ যেমন মহাত্মাগান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাওলানা আকরাম খাঁ, শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আরো অনেকের সাথে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই আর পাঁচজন মানুষের মতো আবুল হাশিমের জীবনও ছিল ঘটনাবহুল।

বইটিতে আবুল হাশিম তাঁর পূর্বপুরুষ, তাঁর শৈশবকাল, স্কুল ও কলেজ জীবনের বিবরণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর কর্মময় বিশাল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে- এমনটা বলা যাবে না।

---

575 আত্মজীবনী লেখা কোন আধুনিক ব্যাপার নয়। যুগে যুগে পৃথিবীর ভাষায় আত্মজীবনী রচিত হয়। প্রাচীন কাল থেকে সব দেশেই আত্মজীবনী লেখার রেওয়াজ চলে আসছে। এদিক দিয়ে জুলিয়াস সরার, বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো না থাকলে রোমান ও ভারতীয় ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই অজানা থেকে যেতে। নীরোদ চন্দ্র চৌধুরীর "Autobiography of the Unknown Indian" পড়ে উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন যে, এত ভাল বই তিনি জীবনে কমই পড়েছেন। এই আত্মজীবনী লেখার পর নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী অখ্যাত ভারতীয় থেকে বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও ব্যক্তিরূপে পরিচালিত হয়েছিলেন। (বরুদ্দীন উমর, আমার জীবন (১ম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. মুখবন্ধ ২য় পৃষ্ঠা দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

এর বাইরেও তাঁর জীবনের অনেক কিছু বলার আছে তা বলাই বাহুল্য। আবুল হাশিম নিজেও তাঁর এই বইটি আত্মচরিত গ্রন্থ নয় এমন কথাই বলেছেন।[৫৭৬] আত্মজীবনীতে নিজের কথা বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক। আবুল হাশিম নিজের কথা বললেও নিজেকে বড় করে উপস্থাপন করেননি। অনেকে আত্মজীবনী লেখেন অহংকারবোধ থেকে। আবুল হাশিমের বইতে তা লক্ষ্য করা যায় না। বিভাগপূর্ব বাঙালার নানা ঘটনা প্রবাহে তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক নেতাদের কি ভূমিকা ছিল, শুধু তা-ই আলোচ্য গ্রন্থে বলার চেষ্টা করেছেন। যদিও তা অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। মূলত বইটিতে তিনি ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অখন্ড বাঙলার ১১ বছর মুসলীম লীগের রাজনীতি তথা ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি বাস্তব চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন।[৫৭৭] বিশেষত অবিভক্ত ভারতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারিরূপে তাঁর মুসলিম লীগকে নওয়াব ও খাজা গোষ্ঠী মুক্ত করে তৃণমূল থেকে গড়ে তোলা, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে বিতর্ক করা, মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিরোধের কথা, ১৯৪৭ সালে বাঙালা বিভক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন পরিচালনা করা প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মুসলিম লীগের গন্ডির বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর যে গভীর সম্পর্ক ছিল, সেগুলোও তিনি তাতে বর্ণনা করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে ইহা শুধু একখানা বই-ই নয়- ইহা জাতির একটি রাজনৈতিক দলিলও বটে। এতে আরো বিবৃতি হয়েছে সমসাময়িক দেশকালের কথা। কিন্তু তাঁর শিশু, বাল্য ও কিশোর বয়সের সময়কালে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনাই অনুপস্থিত। বাদ পড়েছে বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থসামাজিক প্রেক্ষপটের কথা। আবুল হাশিমের সময়কাল তথা ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তৎকালীন অখণ্ড বাংলায় যে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন, বঙ্গ ভঙ্গ রদ আন্দোলন, স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলন, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল, সেগুলোর কোন কিছুই বইতে উল্লেখ নেই। অনুরোপভাবে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কাল পর্যন্ত যে রক্তক্ষয়ী ঘটনাসমূহ ঘটেছিল সেগুলোর কথাও সেটাতে বাদ পড়েছে। অথচ আবুল হাশিম জীবিত ছিলেন ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এবং বইটি ছাপা হয়েছিল ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে। ১৯৫০ সালে ঢাকায় চলে আসার পর আবুল হাশিম পুনরায় রাজনীতিতে যোগ দেন।

---

576 Abul Hashim, In Retrospect, Op.cit,P. Auther's Preface.

577 Ibid, P. Auther's Preface.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান ইসলামিক একাডেমী প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। এর মাধ্যমে মানুষ ইসলামের ব্যাপক জ্ঞান লাভে সমর্থ হচ্ছে। অথচ এই কথাগুলোর কথা বইটিতে স্থান পায়নি। তিনি কেন জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বাদ দিয়েছেন, তা আমার বোধগম্য নয়।

আমার মতে, আবুল হাশিমের পুরো জীবনের বিবরণ যদি বইটিতে স্থান পেত, তবে এটি তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করতে পারত এবং সমাজ তাঁর রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক ও ইসলামি কৃষ্টি প্রচারে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন সে সম্পর্কে আরো তথ্য পেত।

জানা কথা, আত্মজীবনী লেখকরা সাধারণত নিজের দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরতে চায় না। এটা নির্ভর করে লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর। অনেক লেখক আত্মজীবনীতে শুধু নিজের গুণ ও সাফল্যের কথা লিখে থাকেন। অনেকে আবার নিজেকে বড় করে প্রকাশ করেন। কিন্তু আবুল হাশিম তা করেননি। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ মানুষ। সত্য উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি নিজের ভুলভ্রান্তিও তুলে ধরেছেন। তাই আমাদের দেশের রাজনীতির ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর বইটিকে একটি মূলবান ও নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে।

তাঁর পরও কথা থাকে, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। এ ভুল অজানার কারণেও হতে পারে। এ গ্রন্থের একটি প্রধান ভুল হলো এই: দাঙ্গা পীড়িত হিন্দুদের নৈতিক সমর্থন দেওয়ার জন্য গান্ধীজী নোয়াখালী সফর করলেও পীড়িত মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য "গান্ধী কলকাতা বা পাটনা সফর করেননি" বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৭৮] এ তথ্যটিও ঠিক নয়। আবুল হাশিম নিজেই তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, "গান্ধী ১৯৪৭ খ্রী. ২৮ ফেব্রুয়ারী পাটনার উদ্দেশ্যে নোয়াখালী ত্যাগ করেন।"[৫৭৯]

পরিশেষে বলতে চাই বইটিতে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বলতে হয় যে, এখন যারা রাজনীতি করেন এবং ভবিষ্যতে যারা রাজনীতি করার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ করতে চান, তাদের জন্য এই বইখানা দিকনির্দেশনা দেবে। তাছাড়া পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে আজকের যুবসমাজের তেমন একটা ধারণা নেই আশা করা যায়, এই বইটি তাঁদেরও বিশেষ উপকারে আসবে।

---

[578] Ibid, P. 136.

[579] Ibid, P. 147.

Dhaka University Institutional Repository

১০. আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি

In Retrospect বইটি পরবর্তীতে আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি শিরোনামে অনূদিত হয়। অনুবাদ করেছেন আবুল হাশিমের কনিষ্ঠ পুত্র শাহাবুদ্দিন মুহাম্মদ আলী।

প্রকাশক: আব্দুল কাদির খান, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা-১, অনুবাদকাল: ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ১৯৫। ১৯৮৮ সালে গ্রন্থটির ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক: শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৭৩।

বস্তুত আবুল হাশিম যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তার প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর ইসলামি দর্শন-সাহিত্যে ভাষার মধুময়তা, গতিশীলতা ও সাবলিলতায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মনেপ্রাণে আগেব-আবেশ সহকারেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এই আবেগ আবেশের মধ্যে কোনো রকম কৃত্রিমতো বা খুঁত ছিল না। তাঁর সমস্ত রচনা ইসলামি পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। ফলে তাঁর বইগুলো বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাঁর লেখা থেকে শিক্ষিত সমাজ ইসলামের সৌন্দর্য ও বিপ্লবী রূপ যেমন অনুধাবনের সুযোগ পাবে, তেমনি সমাজ, দেশ ও জাতি অনেক উপকৃত হবে। তাঁর রচনাসমূহ গুরুত্ববহ বলে প্রায় সব লেখাই পরবর্তীতে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। আবুল হাশি তাঁর দুর্লভ সাহিত্যেকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষিতজনের জন্য যে চিন্তার খোরাক রেখে গেছেন, সেগুলোর জন্যই জাতি তাঁকে চিরদিন স্মরণীয় বরণীয় করে রাখবে বলে আমি মনে করি।

আল্লামা আবুল হাশিমের শিল্প, শিক্ষা ইসলামি সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর মৃত্যুর ২৩ বছর পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতা দিবসে ১৯৭৬ পূর্ববর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মরহুম মৌলভী আবুল হাশিমকে স্বাধীনতা দিবস (মরণোত্তর) পুরস্কার প্রদান করে।[৫৮০] পাকিস্তান আন্দোলনে অসামান্য ত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯১ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ আবুল হাশিমকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করেন।[৫৮১] আবুল হাশিমের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁরই পরম ভক্ত অধ্যাপক আবদুল গফুর ১৯৮৭ সালে তাঁর লিখিত "আসমান যমিনের মালিক" পরম শ্রদ্ধেয় আল্লামা আবুল হাশিম এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।"[৫৮২]

---

580 মনসুর আহমদ, সৈয়দ (সম্পা:), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৬।

581 ঐ, পৃ. ৪৭৬-৭৭।

582 অধ্যাপক আবদুল গফুর, আসমান যমিনের মালিক, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ক

On Education

Abul Hashim

21st March 1949

Janab Abul Hashim: Mr. Speaker, Sir. We are told that we have achieved freedom but we do not feel like that. If we have achieved freedom, in that case, development of our culture should be considered as our foremost duty. During foreign rule we had been kept as slaves politically economically, but. Sir, the worst that happened is that we were all made the cultural slaves of our rulers. Perhaps realisation of this inspired our poet-I mean Dwijendralal Roy-to say.

"আমরা বিলেতী ধরনে হাঁসি, আমরা ফরাসী ধরনে কাশি" ।

That is, we smile as an Englishman smiles and cough as a Frenchman does, Sir, it is really true that we think in terms of what we cal European civilisation. Whatever is certified by Europe as good we accept, as good without any reservation. Whatever is characterized as bad by Europeans we accept that as bad equally without reservation. Now that we have attained freedom, we must try to re-discover our own culture and therein discover ourselves. I congratulate the Hon'ble Finance Minister when he says that in future education at least up to the secondary stage shall be given through the medium of Bengali, so far as West Bengal is concerned. But, sir, in order that people of Bengal may really get the education they like through the medium of their mother -

Dhaka University Institutional Repository

language, certain preliminary arrangements must be made. I t; ink the Hon'ble Education Minister will not differ form me if I say that the first step that should he taken in this direction should be to create and organisation for translating knowledge of the world into Bengali. Sir, English Language is rich and universal because in that language you can find all the treasures of the world both past and present. If you want to know what is there in the teachings of the Holy Quran you will find it there; if you want to know what are the teaching of the Vedas, Upanishads and ancient philosophy of India you will find them in that language. If you want to know what was the wisdom of Socraes, Plato, Aristotle, ancient Greeks and Romans you will bind them in that language. If, Sir, we want to raise ourselves to that height we will have to raise our language to that height too. If we want that our mother-tougue should be raised to the level of world's one of the first-class languages, in that case the step that I have suggested should be considered as the first and the most important step. It is a pity. Sir, if I want to know something of ancient India I will have to take assistance of the English language. It is with great difficulty that one can find here in Calcutta even a standard copy of the Bengali translation of Srimad Bhagavat Gita. The other day I hound to my satisfaction-satisfaction because I feel happy when I find that the people of Bengal are taking interest in their own culture-in the room of any esteemed friend Sri Dhirendra Narayan Mukherji a Bengali translation of Yoga Vasishta Ramayana. I asked him if that book was available in the market. He said that was the last copy that he

Dhaka University Institutional Repository

could procure from the publishers. Therefore, not to speak of the intellectual giants' contributions to world knowledge of Europe, America, the Middle East the Far East, it is very difficult even to find Bengali translation of classic Books of Indian philosophy and Indian culture. Therefore, Sir, I would urge upon the Governort consider very seriously if money spent on this account they would consider as spanner manufactured by Great Britain who had stability of their empire in India Uppermost of knowledge were taught to us from text-books written from that standpoint. Only a few years age the people of Bengal, Hindus, and Muslims alike, I remember, created a serious agitation for removing the Blank Hole Monument from where it was. The people of Bengal, Hindus and Mislims jointly organised the Serajuddowla Day. Why? Because they learnt from the researches of all disinterested and patriotic Bengali historians that Nawab Serajuddowla, the last independent king of Bengal, was just not the same man as he was represented by the British and others, Sir, the other day I came across a very nice radio talk given by a reputed professor of Calcutta, Sri Tripurari Chakraverty. The talk was a Bengali talk "Bharater Ithasen moulik niti" - the fundaments and the basic principles of Indian history. That appealed to me so much that I personally met him and requested him to write a comprehensive book on that subject. If the history of India be re-written in the light of the learned professor's thesis, in that case that and that alone will create an atmosphere in which Hindus and Muslims will forget all communalism and really become one people. Mere change of

Dhaka University Institutional Repository

name of a college would not help creation of that atmosphere which we so much desire. Similarly, Sir, the geography of India was written in a manner that kept us blind of our own resources and potentialities. Sir, today we talk of secular state and secular education. But in my humble opinion I do not find anywhere any such thing as secular education strictly speaking. Every nation, every civilisation has some "ism" as the foundation of its civilisation. That may not be religion. For instances, in Russia, the rulers of Russia have also an 'ism", I call it their religion and everybody knows. Sir, from the beginning up to the end of education the whole system has been so altered that none is permitted to get any education which is not consistent with their "Ism" *of* life. I do not want to be so many fanatics. I want to b e liberal but, Sir, in the name of liberalism. I am not prepared to sacrifice our own culture. Here I am not. peculiar geographical and historical conditions of India and for that mater Bengal within India PS such has also distinctive culture of its own. Let us all combine together to re-discover that culture, for that all the branches of knowledge will have to be re-written.

Even in Russia communist history, communist geography, communist chemistry and communist physics, etc. exist. So we must understand and realise the importance of this. By mere Slogans, by the promulgation of section 144, *by* passing of the Security Act and all these and by repressive and oppressive measures we cannot protect our own culture from outside attacks. Sir, if it be necessary for the maintenance of law and order- since

Dhaka University Institutional Repository

this is not the occasion for that-I leave it at that. But in order to protect ourselves from external aggression of ideas and ideologies we must bring home the treasures of our cultural knowledge by translating the world knowledge into Bengali and re-writing text-books for our schools and colleges as also for common readers from the standpoint of our own culture. These are the two things that are absolutely necessary. I feel perfectly sure that if this be done you will find that in the whole of Bengal Muslims and Hindus together will be proud and conscious of their own culture which they do not know now.

With these words, Sir, I command my motion for serious consideration of the Hon'ble minister in charge of Education and his honorable colleague n the present Ministry as also the honourable members of his party; and as, Sir, the Hon'ble Minister in his speech addressed an appeal to the members of this chamber as also the out side world, so by this resolution I want to draw the serious attention of the members of this House and also of the world outside to my proposition.

Dhaka University Institutional Repository

The ideals of Bangladesh

Secularism

By Abu Hashim

For proper understanding of Secularism one must consult history rather that dictionary. The concept of Secularism emerged from the conflict of Martin Luther with the Roman catholic church of the then Christian World. Any theory or practice of Civilians private or public which appeared in consistent with or repugnant to church dogma defined by acclcsiastical authority was severely punished. This amounted to violent interference of the church with every sphere of human existence of the Christian world. Great thinkers and scientists had to suffer excommunication and even physical annihilating Joan of Arc was brunt of death. Gallileo was forced to make public apology in writing for declaring that the earth moves round the sun which was inconsistent with geocentric dogma of the church. Valtaire had to be buried secretly outside the city of Paris for fear of the church Newton for fear of excommunication dared not publish his famous bool Principia Mathematica during his lifetime. In this dark age of Europe Martin Luther succeeded in winning his war against the Roman Catholic Church and the Protestant Church came into existence; interference of the church with the affairs of the state was negated. Thus secularism is not negation of religion but is negation of interference of a privileged class of priests with freedom of thought and affairs of the state.

Dhaka University Institutional Repository

England is a secular state. According to constitutional tradition of England the Sovereign of England must be a Protestant Christian and Defender of Faith. The State maintains the Church of England, an official religious organization. Religious instructions are given in educational institutions. But there is no interference of church with the affairs of the state. To take another example India is a secular state. The Government of India does not interfere with religious institutions and even with political parties based on religion like the Hindu Mohashova and the Muslim League. Similar conditions obtain in noncommunist secular States of the world. 1 repeat secularism is not negation of religion but negation of interference of privileged class of priests, pundits and mullahs with the affairs of the states; herein lies the distinction between secularism and communism. Negation of religion is the corner stone of Marxism.

Abstract terms do not have any universally accepted meaning and as such abstract terms *do* not convey and sense unless they are defined. Definition of abstract terms is variable .-So it is with the term Secularism. According to the Communists Secularism may menu abolition of religion. In Islam there is no such thing as a privileged class of priests. So the question of interference of priests, .pundits and Mullahs with the affairs of the State docs not arise in Islam. Thus Islam is a secular Religion and it has no conflict with secularism as it is understood in the noncommunist World.

Dhaka University Institutional Repository

When Baghdad and Cordova were seats of learning where seekers after learning came from all parts of the civilized world there was only one single system of education, which taught every subject considered necessary for proper education of the people. After imposition of British rule in India education was bifurcated in India. San rit Schools and Madrassahs grew side by side with institutions for general education .In institution for general education English was the medium of instruction. In Madrassahs and Sanskrit schools Theology and functional religion were taught with the result that a privileged class of pundits and mullahs grew. The madrassahs pretended to teach Arabic language Al-Quran, Hadis and Muslim jurisprudence but in fact these institutions succeeded only in manufacturing an un-Islamic class of priests ignorant of real values of Islam. Like-wise Sanskrit schools produced Hindu Priests and Pundits the so-called guaroians of Hindu religion. By creating these educational institutions British Imperialism sowed the seed of communalism, which successfully helped British policy of divide and rule. In the secular state of Bangladesh bifurcation of education must immediately be abolished and a single system of education must be evolved capable of giving specialized knowledge at higher stage of education according to individual genius of students. In primary stage of education religious instruction must be given, but in the secondary and higher stage religious instruction must be elective. Boys and girls must have a general idea of the fundamental of his or her religion and must know how to perform and observe rituals

Dhaka University Institutional Repository

of his or her religion. This system of education shall be in perfect harmony with secularism as it should be interpreted in Bangladesh.

British imperialism introduced in the sub-continent a system of education which had little or nothing to do with promotion of spiritual and moral values of the peoples of the subcontinent and it did completely black out the wisdom of the East. Textbooks for schools, college and Universities were patterned accordingly. A college passed young man left his college with the impression that all contributions to human civilization c-one from the West and that the East contributed nothing to evolution of-human thought and action. The Text Books and the course of study must be so patterned as may give to every educated youth an objective view of contributions of the East and of the West to human civilization.

Another very important aspect of Secularism is that in a secular state no right shall be reserved for any religious community. All citizens must en‡jvoy equal right and privileges of citizenship in every sphere of national existence.

(The article was published in The Daily People on Monday, April 24, 1972)

Dhaka University Institutional Repository

Ideals of Bangladesh democracy

ABUL HASHIM

Democracy is not a system of Government where opinion of fiftyouc & used is considered superior to the opinion of forty nine Arab horses. Democracy is an ideal. An ideal, however silicone, is of no use if it is not implemented practiced in everyday business of life. For implementation of an ideal a certain method, process and a from of Government is necessary, ideals are not variable but method of implementation of ideals must necessarily vary with varying conditions of living. Thus, any form of Government considered most suitable for implementation of ideals of democracy in a given time and place shall be perfectly democratic & method, a process or a form of Government is a means to an end, not an end in itself. Thus if the ideal of democracy is ignored and form of Government is Instituted through university about suffrage and decisions are made merely by counting onset shall be anything but democracy. Bangladesh must, therefore, clearly define the contents of democracy in clear and unequivocal terms, and its constitution must be formulated in due consideration of the now obtaining conditions of the country.

Equal rights

In theory and in practice democracy moans equal rights and opportunity of every citizen irrespective of tests to actively participate I social reconstruction for the welfare of the people.

Dhaka University Institutional Repository

Equality of man means equality of opportunity and not equality of ability. Nevertheless, in a democratic social order every man and woman must have the right and opportunity to develop his or her individual gentles. This alone can make a nation great. A Government which guarantees this fundamental right of man is in fact, a Government of the people, by the people and for the people.

Politics is not a vulgar art for capturing power but it is an art sublime for molding the destiny of the people. In backward countries of Asia and Africa power is seized either by Military Coupd' etat or by scoring majority in the parliament by demagogues efficient in the art of deceiving the people by deliberately false and fantastic promises. Such Government cannot by the farthest stretch of imagination by styled as Government of the people by the people and for the people.

Democracy in U.K

As a form of Government British Parliamerltary Democracy is most efficient. It must, however, be very carefully noticed and remember that British Parliamentary Democracy grew through centuries in the context of tradition, conventions and judicial pronouncement and clearly expressed public opinion created by intellectuals. It cannot, therefore, grafted or transplanted successfully in any other part of the world. British parliamentary democracy is beautiful blend of monarchy, oligarchy and democracy; it is not a monocracy. Hunction of members of the British parliamentary is not to interfero with the administo in

Dhaka University Institutional Repository

every-day business administration. Their function is merely to formulate policy and to legislate under the guidance of the cablnet. Judiciary is completely independent of the executive and the executive is responsible for falthful implementation of the policy fouunulated by the legistature. Ocntleman of the permanent serzices of the administrative machinery of the State function independently without any interference of the gentleman of the legislature. Every department of the state, the legislature judiciary and the executive is rally conscious of its rights and obligations and knows its limitations.

How it is at home

In Bangladesh democracy must also grow with the growth and development of social conditions. In politically undeveloped countries of the East, members of the legislature invariable transgress into the orbit of the judiciary and the executive and keep themselves busy in molding their personal material interest and the interest of their friends.

Nationalism can be ethnological or ideological of both. Nationalism of Bengal is ethnological. According to political thinkers a mass of people integrated on the basis of community of blood and language living in a particular geographical conditions constitute a nation. Geographical conditions, by and large, pattern condition of living of man, his habits, customs, culture, traditions and history. Ideologically, people having a common outlook on lite and living constitute a nation transcending the bounds of blood, language and Geography. Thus, athnologically the

Dhaka University Institutional Repository

Germans, the French, the Iranians, the Banglaes, the Marathas and Pakhtoons are nations. Ideological nationalism is a brotherhood based on common ideology. The people of the Indian subcontinent are not a nation, ethnological or ideological. They do not live in any auiculs geographical condition and they do not have same outlook on life and living. Look at the fortile plains of the gangetic basin, icy region of the Himalayas, the deserte of Rajasthan and the rocky plateau of the Decean! The history of the sub-continent is replete with history of horriable battles and wars between countries and countires and nations and nations of the sub-continent. The Lahore Resolution of the Muslim League of 1940 did not eontemplete partition of any country or nation of the sub-country; it did not contemplate partition of Bengai and the Bangalaes or partition of Pun‡jvab or Pun‡jvabeos.

Bengal has a culture of its own. Culture of a county is predominantly influenced by its geographical conditions. The lofty Himalayas on the north, the Bay of Bengal on the south and the plane interwoven with hundreds of rivers and rivilutes give the country exhilarating environment which tend to creat, in the minds of people a love for quiet and peaceful existence, plain living and high thinking. The six seasons, the summer, the rainy season, winter, spring etc. distinctly appear in the land and make its people highly sentimental and emotional. The culture of Bengal must be developed keeping in view the salient features of its natural character.

Dhaka University Institutional Repository

When nationalism is accepted as an ideal it must not mean Chauvinsm but it must near spontaneous growth and developed of a life congenial to its natural environment and conditions which determine its being and becoming. In concrete terms Bengali nationalism means culture and development of Bengali language and literature with devotion, and respect for habits, customs, traditions and history of the people of Bengal. The days of Chauzinism or the days of may nation right or wrong must be taken as dead.

Zealots of nationalism must not ignore universal culture of man. There are values which are respected and are implemented by man irrespective of geographical conditions religious persuasions. The culture based on these values is universal culture of man. There is no conflict between universal culture and particular culture of man determined by particular ethnological or geographical conditions if it does not offend sentiment and feeling of secularists of communist indoctrination. It may be said that the culture of Islam is a universal culture and is not in conflict with particular culture of Bangladesh. If there is any conflate between universal and particular culture of man in respect of any particular matter then it must be resolved in the light of the universal culture of man.

It is unfortunate that those who talks loud of Bengali nationalism do, in fact, adopt in the name of modernism undesirable habits and practice of the West; for instance, food habits of Bengal are perfectly congenial to the geographical

Dhaka University Institutional Repository

conditions of Bengal. If we adopt food habits of Arabia, Europe or China uncongenial to our elinatic conditions it would be unhygienic. The people of Asia are squatting people. We are comfortable when we sit on our hams and heels. So, our apparels are designed accordingly. In Dhoti Lungi and Sari we can squat very easily and make ourselves comfortable. If we are in tight Western dress we are never comfortable. For the people of Bengal the Western food habit is an aequired habit and not a natural habit. Fighting sainst nature is bad. You can hrow nature with a pitchfone for a while but it keeps on coming with vengeance. So, if we really mean to promote Bengali culture we must pattcrn our everyday life strekly in harmony with our natural environment.

উপসংহারঃ

আল্লাহ্ তা'আলা হলেন এ মহাবিশ্বের 'রব' বা প্রতিপালক। আর মানুষ হলো এই পৃথিবীতে তাঁর 'রব' গুণের প্রতিনিধি। প্রতিনিধির দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে, যারা কল্যাণের পথে মানুষকে ডাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন, তোমরা তোমাদের রবের খাঁটি অনুসারী হয়ে যাও। আল কুরআনের এসব উৎসাহব্যঞ্জক আহবানে অনুপ্রাণিত হয়ে যিনি রুবূবিয়্যাত তথা পালনবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে রাজনীতি, সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করেন এবং দেশের আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, দলীয় ও রাজনৈতিক মতোমতো সৃজন, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ সাধন এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতির উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন আল্লামা আবুল হাশিম। অবিভক্ত বাঙলার সবুজ শ্যামল ভূমিতে ইসলামের দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য।

আবুল হাশিমের জীবন কালকে দু'টি ভাগ করা যায়। এক ভাগে হলো ১৯০৫-১৯৫০ সময়কাল পর্যন্ত এবং অপর অংশে হলো ১৯৫১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫-১৯৫০ সালের মধ্যকার সময়কালে তিনি ভারতে কাটান। বাল্যকালে মাতাকে হারিয়ে খালার কাছে বড় হন। অতপর স্কুল, কলেজ পার হয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ক্লাসে পা রাখেন তখন তিনি ইসলামের তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতি মনোযোগী হন। এ সময় তিনি ইসলাম ও কমিউনিজমের তুলনামূলক পড়াশোনায় উৎসাহ বোধ করেন। রাজ্যহারা এবং সম্পদহারা মুসলিম সমাজ যখন আত্মবিস্মৃতির অতল গহবরে নিমজ্জিত, তখন রাজনৈতিক পরিবারে সদস্য আবুল হাশিম ১৯৩৬ সালে রাজনীতিতে পদার্পণ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে ভারতের বিখ্যাত আলিম আল্লামা আযাদ সোবহানীর সাথে তাঁর পরিচিত ঘটে এবং তাঁর রব্বানী চিন্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এর পর তিনি স্বীয় মন-প্রাণকে ইসলামের জন্য এমনভাবে উৎসর্গ করেন যে, পুরো মুসলিম লীগের ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি মুসলিম লীগের সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগের রাজনীতি করলেও তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না বরং সকল ধর্মের মানুষের ঐক্য ও সৌহাদ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে আবুল হাশিম ছিলেন আদর্শ ও নীতিবান নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত পুরুষ। অনুনয়-বিনয়, তোষামোধ ও পরোয়া করার মতো ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। সত্য কথাকে তিনি মুখের উপর বলে দিতে পারতেন। তিনি নিজেই বলতেন আমার যেহেতু চক্ষু নেই, তাই চক্ষু লজ্জাও নেই। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন, শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, মাওলানা আকরাম খাঁর মতো বিশাল জননেতারা ছিলেন তাঁর সহকর্মী। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তিনি নিখিল ভারতীয় রাজনীতি করেছেন। দৃঢ়তা ছিল আবুল হাশিমের প্রধান অবলম্বন। নির্ভীকতা ও স্বাধীনচেতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কারণে তিনি জিন্নাহ, শেরে বাংলার ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে মাঝে মধ্যে বিতর্কে জড়িয়ে পরতেন। ক্ষমতোার প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। তিনি কখনোও মন্ত্রিত্ব কিংবা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা গ্রহণ করেননি। এদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রম নেতৃত্বের অধিকারী। এক কথায় তিনি ছিলেন বাংলার আপোসহীন আদর্শবাদী সংগ্রামী জাতীয় নেত।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে মুসলমানদেরকে সচেতন করা এবং মওলানা আকরাম খাঁর দৈনিক আজাদ পত্রিকার মোকাবিলা করার জন্য আবুল হাশিম সাপ্তাহিক মিল্লাত প্রকাশ করেন। তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে জনগণকে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উজ্জীবিত

Dhaka University Institutional Repository

করে তুলেছিলেন। ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজকে তিনি একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।

আবুল হাশিম মানে একজন বিপ্লবী নেতার নাম। এ বিপ্লব যেমন রাজনীতির দিক থেকে তেমনি ধর্মীয় দিক থেকেও। ইসলাম নিশ্চল নয় বরং প্রগতিশীল একটি ধর্ম তিনি ছিলেন সত্যের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। আধুনিক মুসলিম জাতিসত্তা বিনির্মাণে তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। ইসলামের ধর্মীয় দিক অপেক্ষা এর অন্তর্নিহিতো মর্মবাণীই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ইসলামের আত্মিক প্রেরণা, জেহাদি সুলভ মনোভাব ও কর্মময় গতিশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন। যে পন্থা অবলম্বন করলে মুসলিম জাতি বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, সেই দিকে তাঁদের ধাবিত করার জন্যই তিনি আমৃত্যু চেষ্টা করে গেছেনে। ইসলামের জীবন্ত রূপকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্রের রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এভাবেই ১৯৩৬-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি উপমহাদেশের রাজনীতিতে ১ম শ্রেণির ইসলামি রাজনীতিবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৪৮ সালে দিকে তিনি অভিমান বশতঃ মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে বিদায় নেন।

১৯৫০ সালে আবুল হাশিমের পৈত্রিক ভূমির পরিবর্তন ঘটে। বর্ধমান ছেড়ে তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। এখানে তিনি পুনরায় কিছুদিনের জন্য রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রথমে তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। আইয়ুব খানের পরম ভক্ত হয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরোধিতা করেন। পরবর্তীতে আবুল হাশিম খিলাফতে রব্বানী পার্টিতে যোগদান করেন এবং এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এখানেও তিনি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেননি। অবশেষে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে একান্তভাবে মনোযোগী হন ইসলাকি একাডেমী চত্বরে। এখানে তিনি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে জ্ঞান-চর্চা ও জ্ঞান বিতরণে এমনভাবে মনোনিবেশ করেন যে, তার রাজনৈতিক পরিচিতি কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

বিশ্ব প্রকৃতি, কুরআন, হাদিস এবং যুক্তিই ছিল আবুল হাশিমের চিন্তাধারার একমাত্র উৎস। ইসলামি শরীঅতে প্রাকৃতিক বিধান বিরোধী কিছু নেই-এ নীতির উপর তিনি ইসলামকে যুক্তি ও বুদ্ধিসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। ইসলামের ব্যবহারিক বিধি-বিধানকে যুগোপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি মুজতাহিদের ভূমিকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টান মিশনারী ও এক শ্রেণীর ইউরোপীয় মনীষী এবং কিছু সংখ্যক মোল্লা মৌলভী কর্তৃক ইসলামের অপব্যাখ্যা হতে দেখে তিনি মর্মাহতো হতেন। গতানুগতিক ও গোড়াপন্থী আলিমদের তিনি তথাকথিত ইসলামি চিন্তাবিদ বলে অভিহিতো করেছেন। মুসলিম সমাজ কেন বিজাতীয় আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে থাকে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবুল হাশিম বুঝতে পেরেছেন যে, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে মুসলমানদের অজ্ঞতা। সেই অজ্ঞতা থেকে তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি যেমন ইসলামের দর্শনের উপর বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন, তেমনি সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি উৎসাহী করে তুলতে চেষ্টা করেন। ইসলাম বিষয়ক লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে নব জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ইসলামি দর্শন দ্বারা মুসলমানরা আধুনিক যুক্তিবাদের সাথে পরিচিত হতে সমর্থ হন।

আবুল হাশিম কুরআন-হাদিস উদ্ভুত বিষয়কে চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে যুক্তির কৃষ্টি পাথরে যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করেছেন। অযৌক্তিক কোনো কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদী, প্রগতিবাদী, স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী এবং সংস্কারপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। নিখুঁত যুক্তি ও মুক্তিবুদ্ধির আলোকে তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রচলিত চিন্তা খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি অনেকের দ্বরা যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছেন। কোনো কোনো আলিম তাঁর চিন্ত াধারার বিরোধীতা করেছেন। পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজে যে অবরোধ প্রথা জিইয়ে রাখা হয়েছে, বাল্যবিবাহ বৈধ বলে যে যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে, তিনি কুরআন-হাদীসের বিধান দিয়েই তা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। উপমহাদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, সৈয়দ আমীর আলী, আবুল, আলা মওদুদী, ড. আল্লামা ইকবাল, প্রমুখ প্রগতিবাদী ইসলামি চিন্তাবিদগণ যেভাবে মুসলিমদের এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন আবুল হাশিমও ছিলেন তেমনি একজন মানুষ।

প্রত্যেক দার্শনিকের নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। হিটলার ও মুসোলিনির দর্শন হলো "জোর যার, মুল্লুক তার"। কমিউনিজমের মূলনীতি হলো বস্তুসত্ত্বাকেই পরমসত্ত্বা হিসেবে গ্রহণ করা। কিন্তু আবুল হাশিম জড়বাদী দর্শণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারা আবর্তিত হতো কালিমা তায়্যিবা যা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কে কেন্দ্র করে। এই দর্শনের মূল কথা হলো- স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবা করা।

আধুনিক যুগের অনেক চিন্তাবিদ যখন ধর্ম তথা ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে বলে মনে করছেন, তখন আবুল হাশিম ইসলামের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করে কালিমাকে চিন্তার জগতে

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিপ্লবী শ্লোগান বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনে করেন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ এবং খুলাফায়ে রাশিদীন কালিমাকে বুকে ধারণ করে ঈমানের বলে বলিয়ান হয়েছিলেন বলেই তাঁরা সাফল্য অর্জন করেছিল জীবনের সকল স্তরে। নিজেদের হিদায়াতের জন্য সাহাবীগণ আল-কুর'আনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন বলেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আজও সেই কুরআন বিদ্যমান। প্রতিনিয়ত আমরা শুনতে পাই পৃথিবীর কোটি কোটি মসজিদে নামাযের সময় হলে ধ্বনিত হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শত শত মাদ্রাসা মক্তবে শত শত পীরের খানকায় নফী ইসবাতের যিকর-এর নামে উচ্চারিত হচ্ছে ঐ কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। কিন্তু আজ সেই কালিমা পরিণত হয়েছে ভিক্ষুকের মন্ত্রে। "আল্লামা ইকবাল কালিমার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছিলেন:

অর্থাৎ আযানের প্রথা বাকী আছে; কিন্তু তাতে হযরত বিলালের আধ্যাত্মিক সুর নেই। দর্শন শাস্ত্র বাকি আছে; কিন্তু ইমাম গাজ্জালী (রা) এর প্রেমউজ্জীবিত অনুসরণ ও চর্চা নেই।

কালিমার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কালিমার শব্দাবলি পৃথিবীব্যাপী উচ্চারিত হলেও এর শিক্ষা আজ মুসলমানদের নিকট বিস্মৃত প্রায়। দুর্ভাগ্য, মুসলমানরা আজ কালিমার শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। মুসলিম বিশ্ব আজ ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মন্যবাদীদের দ্বারা চরমভাবে আক্রান্ত, নির্যাতিত ও নিগ্রেহিতো। এর অবসান কল্পে আল্লামা আবুল হাশিম কালিমার বিপ্লবী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁর উজ্জ্বল মেধা, মনন ও শক্তিশালী লেখনি ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, নাই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া কালিমারএই ডগম্যাটিক অর্থকে অতিক্রম করে এর প্রাগমেটিক তথা বাস্তব ও প্রায়োগিক অর্থ সাহাবায়ে কিরাম অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। যে কারণে তাদের জীবনে এসেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কালিমার অর্থ ও তাৎপর্য ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। তা ছিল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল (সা:) প্রদত্ত বিধানকে গ্রহণ করা। সময়ের ধারাবাহিকতায় ও যুগের পরিবর্তনে মুসলমানরা আজ কালিমার প্রাগমেটিক অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে তাদের কাছে কালিমার অর্থ ও কর্মপরিধি ধীরে ধীরে সংকোচিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন যুগে নবী ও রাসূলগণ কালিমার মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার একমাত্র অধিকার হলো আল্লাহ তা'আলার। কিন্তু খুলাফায়ে রাশিদার পরবর্তী কালে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, চিন্তার জগতে বিভিন্ন দর্শনের উদ্ভব, খ্রীষ্ট ধর্মের বেরাগ্যবাদী চিন্তা, গ্রীস ইরানী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনের প্রভাব মুসলিম বিশ্বকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করে যে, মুসলমানরা কালিমা যে একটা মহাবিপ্লবের উৎস একথা তারা প্রায় ভুলে গেল। ফলে আজ দিকে দিকে কালিমার ধ্বনি উচ্চরিত হলেও মুসলিম জাতির জীবনে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে সমাজের কিছু লোক পবিত্র কুর'আন গ্রন্থটি কেবলই ছাওয়াবের আশায় তেলাওয়াত করে, কপালে ঠেকায়, কখনো বা বুকে লাগায়, কিংবা বার বার চুমু খায়; কিন্তু তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের আশায় তা বুঝতে চেষ্টা করে না। কুর'আনের মতো কালিমাও এখন নিছক জপমালায় পরিণত হয়েছে। এ ধরনের মানুষের চিন্তা ও কর্মে কালিমার শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ হয় না। বর্তমান দুনিয়ায় কালিমার যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় সর্বক্ষেত্রে বিশৃংখলা দেখা যাচ্ছে। কালিমার বাস্তব প্রয়োগ হলে সর্বত্র অবশ্যই পুন: শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আবুল হাশিম মনে করেন। তাঁর মতে, কেউ যদি মনে করে যে, বর্তমান যুগে কালিমার শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়, তবে তা হবে ভ্রান্ত। ইতিহাস সাক্ষী, কালিমা তথা লা-ইলাহার ঈমানী শক্তি চিরঞ্জীব। এটাই বিপ্লবের হাতিয়ার। কিয়ামতো অবধি এ শক্তি মানুষকে কল্যাণের দিকে অগ্রবর্তী করতে পারে। আল্লাহ বলেন, যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের 'ওলী,। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।[৫৮৩]

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন, আর আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন এবং আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণকারী।[৫৮৪]

কতই না সুন্দর কথা। দুনিয়ার জীবনে দেখা যায় যে, কেউ যদি অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে তার জীবন সুখের হয়ে উঠে। আর আল্লাহকে অভিভাবক হিসেবে পেলে তার থেকে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে? আল্লাহ্ যাদের অভিভাবক আজ তারা সারা পৃথিবীতে মার খাবে কেন? তারা আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত কেন? অথচ আল্লাহ বলেছেন মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।[৫৮৫]

আল্লাহ আরো বলেছেন, আর তোমরা হীনমন্য হয়োনা এবং দুঃখ করোনা তোমরাই জয়ী হবে,যদি তোমরা মুমিন হও।[৫৮৬]

আবুল হাশিম দেখানো চেষ্টা করেছে যে, মুসলমানদের আজকের দুরবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে, তাদের সেই খাঁটি ঈমানী শক্তি আজ আর নেই। পার্থিব মোহের কারণে তাদের অন্তরে আজ মরিচা ধরেছে। আজকের মুলমানরা বিভ্রান্ত। পাশ্চাত্য জগতে আজকের মুসলামন মানে সন্ত্রাসী,

---

583 আল-কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৭

584 আল কুরআন, সূরা রূম, আয়াত: ৪৭

585 আল কুরআন, সূরা রূম, আয়াত: ৪৭

586 আল কুরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্রিয়াশীলতা, মৌলবাদ, কিংবা জঙ্গীবাদ। বিশ্বে বর্তমানে ৫টি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, কিন্তু কোথাও ইসলামের পুরোপুরি রূপায়ন নেই। শক্তি-সামর্থ্যে আজ তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর।

আরব বিশ্বে সম্পদের অভাব নেই। প্রয়োজন ছিল এগুলো সুষ্ঠুভাবে মানুষের মধ্যে বণ্টন করা। কিন্তু মুসলমানরা আজ কেবল খাচ্ছে আর বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। বিশ্বের মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ আজ মার খাচ্ছে, অথচ তার পাশেই অন্য মুসলিম রাষ্ট্র দেখেও না দেখার ভান করছে। আল কুর'আনে শক্তি সঞ্চয় করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই মুসলমানের নেই কোনো চেতনা। মুসলমানরা আজ কালিমা তথা ইসলামের রূপ ও সৌন্দর্য যেমন পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, তেমনি আশানুরূপভাবে তা বিশ্ববাসীর সামনেও তুলে ধরতে পারেনি। মুসলমানরা আজ বিভ্রান্ত। মুসলমানরা আজ পথভ্রষ্ট, কিন্তু তাদের ভ্রান্তি কোথায়, তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। মনীষী আল্লামা আবুল হাশিম সেই গলদ কোথায়, তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে। তিনি মনে করেন অনুরূপ কতিপয় সুন্দর সুন্দর বাক্য মুখে উচ্চারণ করলেই সত্য পথ ও কল্যাণের ফল্গুধারা আকাশ থেকে মুসলমানদের কাছে নেমে আসবে না। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

বলতে গেলে কালিমার মূল কথা ছিল যে, মানুষ আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে নৈতিক শক্তি অর্জন করবে।[৫৮৭] কিন্তু আজ সেই নৈতিকতা তথা মনুষ্যত্ববোধেরই যেন বড় অভাব। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। কৃষি বিপ্লবের ফলে পৃথিবীব্যাপী মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানো এখন অসম্ভব নয়। মানবজাতির কাপড়ের চাহিদা এখন অনেকটা পূরণ হয়েছে। তবুও এখনো পৃথিবীর সব দেশেই গরীব আছে, মানুষের অন্নাভাব,বস্ত্রভাব আছে। তার কারণ মানবজাতির উৎপাদন-সামর্থ্যের ঘাটতি নয়; ঘাটতি হলো- মূল্যবোধের, নৈতিক চেতনার, সামাজিক ন্যায় বিচারের, রাজনীতির স্থিতিশীলতার, যুগোপযোগী আদর্শ, নীতি ও পরিকল্পনার। সভ্যতার সঙ্কট বা সংস্কৃতির সঙ্কট আজ গোটা মানব জাতিকে গ্রাস করে ফেলেছে। যুদ্ধ, সন্ত্রাস, দূর্নীতি, জুলুম-জবরদস্তিতে মানুষ আজ দিশেহারা। যদি প্রশ্ন করা হয়, এ সব সঙ্কট থেকে উত্তরণের কি কোনো উপায় নেই? এর উত্তরে আবুল হাশিম বলার চেষ্টা করেছেন যে, উপায় অবশ্যই আছে। এর জন্য আজ প্রয়োজন ইসলামের চর্চার। যার কেন্দ্রবিন্দু হলো কালিমায়ে তায়্যিবা।

---

৫৮৭ আল্লাহ বলেন (আল কুরআন, সূরা রাআদ, আয়াত: ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস সাক্ষী যে, যেকালে হযরত মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাব ঘটে, সেকালে আরবেরা নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সব দিক থেকেই ছিল চরম অধঃপতিত ও নিকৃষ্টতম জাতি। কিন্তু নবীজীর সংস্পর্শে এসে সব দিক দিয়েই তারা পরিণত হয়ে গিয়েছিল সর্বোৎকৃষ্ট মানুষে। আবুল হাশিমের বিশ্বাস হলো, সেই কালিমা এখনো বিদ্যমান। দুনিয়ার কোনো মতোবাদই কালিমার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না। অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার না জানলে যেমন তার ক্ষমতো আঁচ করা যায় না, কালিমা সম্পর্কেও ব্যাপারটা ঠিক তাই। যদি কালিমার গুণ ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়, তবে সন্দেহ নেই যে, আগামীতেও তা বিপ্লব ঘটাবে জীবনের সকল স্তরে।

আবুল হাশিমের অভিমতো হলো, রাসূল (স) প্রদর্শিত ইসলামের রূপ ও সৌন্দর্য বিভিন্ন সময় স্বার্থবাদীদের দ্বারা বিকৃত হয়ে আসছে। এ কারণেই ইসলামের নামে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধারা-উপধারার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য তিনি সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার আহবান জানান। বস্তুত, আজও যদি মানুষ আপন তাগিদে, আপন কাজ, আপন কর্তব্য সম্পাদন করে, অপরের কাজে যদি এতেঠটুকু বাধার সৃষ্টি না করে, তবে এ সমাজ বাতিলের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরে আসতে পারে। সন্দেহ নেই, তখন সমাজ থেকে অন্যায়, অধর্ম, অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, প্রবঞ্চনা, বিবাদ,বিসম্বাদ তথা নৈতিকতা বিরোধী সকল অপরাধ দূর হতে পারে।

আল্লামা আবুল হাশিমের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এখানেই নিহিতো যে, তিনি কালিমায়ে তায়্যিবার শিক্ষার বৈপ্লবিক দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের জড়বাদী মন-মানসিকতা থেকে রক্ষা করেছেন। কালিমার মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক দর্শন নিহিতো আছে, তিনি তা উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর সব লেখায়। কালিমার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি ইসলামের সকল দিক ও বিভাগকে সেই কালিমার সীমার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। তবে কালিমার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি ইসলামের সকল দিক ও বিভাগকে তুলে ধরতে পেরেছেন-এমন বলা বলা যাবে না। বরং ইসলামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে মুসলিম উম্মাহকে কালিমার ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। জীবনের সকল স্তরে কালিমার চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি বক্তৃতা করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন এবং রচনা করেছেন দর্শন-সাহিত্যে। প্রতিষ্ঠা করেছেন "ইসলামি একাডেমী"।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাশিম ছিলেন, বাংলার মুসলমানদের ইসলামের দর্শন বিষয়ক ও রাজনৈতিক আকাশের দিকপাল। তাঁর ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব বাংলায় কমই জন্ম লাভ করেছে। জীবনের আসল সময় যখন তাঁর অনেক কিছু করে যাবার সময় তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতিতেও প্রচুর সময় দিতেন। যদি রাজনীতিতে জড়িত না হতেন, তবে তিনি দেশ, জাতি, মিল্লাত ও সমাজের উপকারার্থে ইসলামের আরো অনেক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে পারতেন। বস্তুত তিনি অনেক কিছু করার চেষ্টা করলেও সাফল্যের মুখ দেখেছেন কম। জীবনের শেষভাগে আদর্শবাদী রাজনীতিকের অভাবে আবুল হাশিম যখন প্রায় নি:সঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, তখনও তিনি মনোবল হারান নি। বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি তাঁর মিশন অব্যাহতো রাখেন।

পরিশেষে বলতে হয় যে, তাঁর মতো একজন মুক্তবুদ্ধির, মুক্তমনা, সৃজনশীল লেখকের মৃত্যু যে বয়সেই হোক, তাকে পরিণত বয়স বলা যায় না। তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে ইসলামি-দর্শন সমৃদ্ধি লাভ করতো। যুগ জিজ্ঞাসার আলোকে বর্তমান প্রজন্মের জন্য তাঁর রচনাবলি প্রচার-প্রসারের একান্ত প্রয়োজন। এই মনীষীর রচনাবলিকে ক্লাসের জন্য পাঠ্যভুক্ত করার এবং এসব রচনা পাঠ করা আধুনিক লোকদের একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুর রহীম, মাওলানা : সূরা ফাতিহার তাফসীর
ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৫৮

আহমেদ দিদাদ, : অলৌকিক কিতাব আল কোরআন
অনু: এ কে মোহাম্মদ আলী
ঢাকা, ১৯৯৩

ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর, হাফেজ : তাফসীর ইবনে কাসীর
অনু: ড. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান
ঢাকা, তাফসীর পাবলিকেশনা কমিটি, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫

শফিকুল্লাহ, মুহাম্মদ, ডঃ : উলুমুল কুরআন (১ম খন্ড)
রাজশাহী, আল-মাকতাবাতুশ শাফিঈয়্যাহ, ২০০১

Muhammad Taqu-ud-Din
Al Hilali, Dr. : The Nobel Qur'an
King Fahd Complex the Printing of the Holy Qur'an, Madina, K.S.A 1417 H

Mushaf Al-Madinah
An-Nabawiyah : The Holy Quran
Revised and Edited by the Presidency of Islami Researches, IFTA, Saudi Arabia, 1413 H.

আবদুল মান্নান তালিব, (সম্পাদনা) : সহীদ বুখারী
ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮১

আবদুল গাফফার হাসান নদভী : এন্তেখাবে হাদিস (১ম ও ২য় খন্ড)
অনু: আবদুস শহীদ নাসিম
আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

আল হাদিস : কানযুল উম্মল
প্রকাশক, আত-তুরাসুল ইসলামি।

ইয়াহ্ ইবনে শারাফ আন নববী : সহীহ মুসলিম বি শরহিন নববী (১ম খন্ড)
বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : মসনাদে আহমদ
দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৩

মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিজি : সুনানুত তিরমিজি
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, তা, বি।

এম আফলাতুন কায়সার, : মেশকাত শরীফ (৭ম খন্ড, ৯ম খন্ড)
এমদাদিা লাইব্রেরী, ১৯৮৮

নূর মোহাম্মদ আজমী, মাওলানা : মেশকাত শরীফ (২য় ও ৪থ খন্ড)
ঢাকা, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ২০০৩

Abul Hashim : The Creed of Islam
or. The Revolutionary character of Kalima, Dacca, Al-Helal Press, 1st Publishied 1950

: ইসলামের মর্মকথা (বাংলা)
অনু: মুসলিম চৌধুরী,
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১

: As I see It
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd,
Chittagong, Dhaka, 1997

: Arabic made Easy
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niazman, Chittagong, Dhaka, 1999

Dhaka University Institutional Repository

: রব্বানী দৃষ্টিতে
প্রকাশক: আবজুর গিফারী সোসাইটি, প্রকাশকাল ১৯৭০

: পাকিস্তান সংহতি
অনু: মোহাম্মদ ইবত্মাহিম
ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৭০

: মানবতার সংকটে পাকিস্তানের ভূমিকা (বঙ্গানুবাদ)
Contributionb of Pakistan to Humanity)
ঢাকা,
ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, জুন-মার্চ সংখ্যা, ১৯৬৪
: মুসলিম দর্শনের রূপরেখা
অনু: কামাল উদ্দিন খান
ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, সংখ্যা
১৯৬৬

: ঐশী অভিপ্রায় ও ক্রিয়া উপলব্ধির মুল ধারণা সমূহ
ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, জুন-জুলাই সংখ্যা,
১৯৬৪-৬৫

আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি
অনু: জনাব শাহাবুদ্দিন মুহম্মদ আলী
নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৮৭
: সাপ্তাহিক মিলাত
কলকাতা, ১৯৪৫

: Let us go to war
৬ষ্ঠ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫
: How to Begin

: Economic problems and their solution in
Islam

Dhaka University Institutional Repository

: In Retrospect
Chitagong-Dhaka, Bangladesh Co-operative
Book Society, 1974
: The ideals of Bangladesh Secularism
(২৪ এপ্রিল ১৯৭২ ইং 'দি ডেইলী পিপল' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ।)

: The ideals of Bangladesh Nationalism.
(১৯৭২ সালে 'দি ডেইলী পিপল' পত্রিকায় প্রকাশিত ।)

: The ideals of Bangladesh Socialism
১৯৭২ সালে 'দি ডেইলী পিপল' পত্রিকায় প্রকাশিত ।)

আবুল হাশিম এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত

: কুরআনুল করিম
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, সপ্তদশ মুদ্রণ, ১৯৯৩ ।

আবূ সাঈদ : ইসলামের বিপ্লবী ভাষ্যকার: আল্লামা আবুল হাশিম
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯৯৯ ।

আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর

: আবুল হাশিম (প্রবন্ধ)
(দ্র. মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

এস মুজিবুল্লাহ : আবুল হাশিম ও জীবন-দর্শন (প্রবন্ধ)
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৮২ ।

: আবুল হাশিম: তাঁর চিন্তা ও অবদান
(দ্র: যৎকিঞ্চিত, চট্রগ্রাম-ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ
বুক সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭)

: বিতন্ডা
ঢাকা, ১৯৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

: আবুল হাশিম: জীবন ও চিন্তাধারা
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০০২।

Rana Rezzaque

: Abul Hashim as a political thinker
(Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum), Vol.51(1) 2006.

অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫
চট্টগ্রাম-ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৮।

আজিজ আহমেদ : ইসলামিক মর্ডানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান (১৮৫৭-১৯৬৪),
লন্ডন, ১৯৬৭।

আতহার হোসেন, সায়্যিদ

: গৌরবময় খিলাফত
অনু: মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৬।

আবদুল ওদূদ, ড. মোহাম্মদ

: আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞা (৩য় কণ্ড) ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৭।

আবদুল করিম, ড. : মোহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল, কলিকাতা,
ম্যাটকালফে প্রেস, ১৯০০।

: বাংলার ইতিহাস
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

: বাঙলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস
অনু: মোকাদ্দেসুর রহমান
ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৯৩।
মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল কাদির (সম্পা:) : আবুল হুসেনের রচনাবলী
ঢাকা, শিখা প্রকাশন, ২০০১ ।

আবদুল খালেক এম.এ : সাইয়েদুল মুরসালীন (১ম খন্ড)
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সং, ১৯৯০ ।

আবদুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. : বাংলাদেশ আরবি, ফার্সি ও উর্দূতে ইসলামি সাহিত্যে চর্চা
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ ।

আবদুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ ।

আবদুর রহিম, মুহম্মদ ড. : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস
অনু: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি
ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৮২ ।

: বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস: ১৭৫৭-১৯৪৭
ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬ ।

আবদুর রশীদ, মাওলানাও
আল্লাউদ্দিন আল আযহারী: উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিয়াত, ঢাকা, কোরআন মহলো, ১৯৮৫ ।
আবদুর রশীদ, মাওলানা : ইসলামি জীবনাদর্শ, ঢাকা, কুরআন মহলো, ১৯৮০ ।

আবদুস সালাম, নাদবী,
মাওলানা : সীরাতে উমর ইবনে আবদুল আযীয, আযমগড়: মাতবায়ে মাআরিফ, ১৯৪৬ ।

আবদুল মওদূদ : মুসলিম মনীষা
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪

আবদুল হক : নি:সঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হক ফরিদী : মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

আবদুল হালিম আবু শুককাহ : রাসূলের (স) যুগে নারী স্বাধীনতা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫

আবু বকর : আরবি সাহিত্যে সমালোচনা
ঢাকা, সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯ ।

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ : মহাগ্রন্থ আল কুরআন কি ও কেন
ঢাকা, খেলাফত পাবিলিকেশন্স, ১৯৯৮ ।

আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর
ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহলো, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৯ ।

: আত্মকথা
ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহলো, ১৯৭৮ ।

আবুল ফজল হক : বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ ।

আবুল জাফর শামসুদ্দীন বেনজীর আহমদ ঃ মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি
ঢাকা, ৮৮ ।

আবদুল হাই, মুহম্মদ ও আলী আহসান, সৈয়দ, ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)
চট্টগ্রাম, বইঘর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮১ ।

আব্বাস আলী খান, ঃ জামায়াতে ইসলামির ইতিহাস
ঢাকা, বই বিতান প্রকাশনী, ১৯৮৬ ।

ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ ।

আনিসুজ্জামান, ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যে
ঢাকা, ১৯৬৪ ।

আনোয়ার হোসেন সৈয়দ, ঃ ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) ঐতিহ্য
ঢাকা, ২০০৫ ।

আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ সম্পাদনাঃ দেলোয়ার হোসেন, আবু, মোঃ, ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষতা
প্রেরনা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ-১৯৯৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দিন খান — ঃ রাষ্ট্র ও খিলাফত
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১ম প্রকাশ, ১৩৯০

আলাউদ্দীন আল আজহারী ও আ, ন,ম ইব্রাহীম, অধ্যাপক — ঃ ইসলামিয়াত (৩য় পত্র)
ঢাকা, কোরআন মহলো, ১৯৮৬ ।

আমিনুল ইসলাম, — ঃ মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ।

আমীর আলী, স্যার সৈয়দ — ঃ দ্য স্পিরিট অব ইসলাম
অনু ঃ ড. রশীদুল আলম
কলিকাতা, মলিক ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭ ।
ঃ এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস
অনুঃ হাবিব আহসান
কলিকাতা, মলিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ ১৯৯২ ।

আমীমুল ইহসান, মুফতী সায়্যেদ মু. — ঃ কাওয়ায়িদুল ফিকহ্
পাকিস্তান, ১৯৮৬ ।
ঃ তারিখে ইসলাম
অনুঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক
ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ ।

আযাদ সুবহানী, — বিপ্লবী নবী
অনুঃ মওলানা মুজিবুর রহমান
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সং, ১৯৮০ ।

আ, ন, ম রইছউদ্দীন, ড. — ঃ সূফীবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়
ঢাকা, বইপত্র, ১ম প্রকাশ, ২০০১ ।

আসাদ বিন হাফিজ, — ঃ ইসলামি সংস্কৃতি
ঢাকা, প্রীতি প্রকাশন, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫ ।

ইউসুফ উদ্দীন, ড. — ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক মতোদর্শ (১ম খন্ড)
অনুঃ মুহাম্মদ আবদুল মতৌীন জালালাবাদী
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১ম প্রকাশ, ১৯৮০

ইনাম-উল-হক, মুহম্মদ — ঃ ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম গাযযালী — ঃ সৃষ্টি দর্শন
অনুঃ মাওলানা নূরুদ্দীন আহমদ
ঢাকা, হাবিবিয়া বুক ডিপোঃ, ১ম প্রকাশ ১৯৮২ ।
ঃ তাহাফাতুল ফালাসিফা
অনুঃ আবুল কাসেম
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ ।

ইমরান হোসেন, — ঃ বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ।

ইসহাক ওবায়দী — ঃ যুগে যুগে নারী
ঢাকা, শান্তি ধারা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬ ।

উইলিয়াম হান্টার — দি ইন্ডিয়ান মুসলামানস
অনুঃ এম আনিসুজ্জামান
ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহলো, ২০০০ ।

এ, এস, এম মোফাখখর, আলহাজ্ব (এডভোকেট) — ঃ স্মৃতির মিনার
ঢাকা, উষা আর্ট প্রেস, ১ম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯১ ।

এ.কে.এম.ইদ্রিস আলী, — ঃ বঙ্গ–ভঙ্গ আন্দোলন ও সমসাময়িক রাজনীতি
উদ্ধৃতিঃ আবদুল গফুর (সম্পাদিত) আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

এ,টি,খলীল, — ঃ আত্মদর্শনে সত্যদর্শন
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭১ ।

এটিএম আতিকুর রহমান, — ঃ বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ ।

এবনে গোলাম সামাদ, — ঃ বাংলাদেশ ঃ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া
ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ ।

এ বি এম হাবিবুলাহ — ঃ ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ
ভাষান্তরঃ লতিফুর রহমান
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ ।

এম, এ হাশেম — ঃ মুসলিম দর্শনের মূলকথা
চুয়াডাঙ্গা, ১৯৭৫ ।

এম হুদা, ড. — ঃ মুসলিম দর্শনের মুল তত্ত্ব
ঢাকা, ইউরেকা বুক হাউস, ১৯৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

এমাজ উদ্দীন আহমদ, ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি (১ম পত্র)
ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ১৯৯৮ ।

এমাজ উদ্দিন আহমদ, ড. ঃ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা
ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, লিঃ, ২০০০ ।

ওয়াকিল আহমদ, ড. ঃ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা
(১ম খন্ড ও ২য় খন্ড)
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ ।

কাজী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, ঃ খেলাফতে রাশেদা
অনুঃ মাওলানা লিয়াকত আলী,
ঢাকা, কলিম প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ ।

কামরুদ্দীন আহমদ, ঃ বাংলার মধ্য বিত্তের আত্মবিকাশ (২য় খন্ড)
ঢাকা, ১৯৭৫ ।
ঃ পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি
ঢাকা, ১৯৮৩ বঙ্গাব্দ ।

কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ ঃ ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমকালীন পরিস্থিতি
ঢাকা, মমতোজ বুকস্ এন্ড স্পোর্টস, ১৯৮৪ ।

কামারুজ্জামান, মুহাম্মদ ঃ আধুনিক যুগে ইসলামি বিপ্লব
ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ ।

কুতুব শহীদ, সাইয়্যেদ ঃ ইসলামে সামাজিক সুবিচার
অনুঃ মাওলানা কারামতো আলী নিযামী
ঢাকা, ইসলামিয়া কুরআন মহলো, ২০০২ ।

কে, আলী, ঃ ইসলামের ইতিহাস
ঢাকা, আলী পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০ ।

কে, এম রাইছউদ্দীন খান, ঃ বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা
ঢাকা, খান ব্রাদার্স, ১৯৮৬ ।

কেনেথ ডবিউ মর্গাম ঃ ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা
অনুঃ অধ্যাপক মুয়াযযম হুসাইন খান ও অন্যান্য
মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৯৮৬ ।

খন্দকার আবুল খায়ের, ঃ সুরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
ঢাকা, জামেয়া প্রকাশনী, ২০০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা আবদুল হাকীম, — ইসলামি ভাবধারা
অনুঃ আবদুল হাই
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭০ ।

গোলাম মোস্তফা — ঃ বিশ্বনবী
ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস ১ম মুদ্রণ ১৯৪২ ।

তাহমিনা আখতার — ঃ মহিলো উন্নয়ণ ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫ ।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, — ঃ ইসলাম ও মানবাধিকার
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।

দেলোয়ার হোসেন, আবু মোঃ — ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষতা
সম্পাদনা, প্রেরনা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ–১৯৯৩ ।

নজরুল ইসলাম, কাজী — ঃ সঞ্চিতা
ঢাকা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম মুদ্রন, ২০০৫ ।

নাযির আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন — ঃ মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস
ঢাকা, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ ।

নিতাই দাস, — ঃ পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ।

নূরুল করিম, মাওলানা, অধ্যক্ষ — ঃ ইসলামি আদর্শের মর্মকথা
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫

নূরুল হুদা, মুহাম্মদ (সম্পাঃ) — ঃ নজরুলের কবিতা সমগ্র
ঢাকা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১ম প্রকাশ, ২০০০ ।

নুরুযযামান, মুহাম্মদ — ঃ ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ইসলামি রাজনীতি
ঢাকা, প্রাচী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০৪ ।

ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ, অধ্যক্ষ — আকায়িদুল ইসলাম
ঢাকা, পুস্তকঘর, ১৯৮৮ ।

ফিরোজা বেগম, — ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি
ঢাকা, কাকলী প্রকাশন, ২০০০ ।

যরীফ, মুহাম্মদ, কাজী — ঃ ইকবাল কুরআন কি রশনী মে
লাহোর, ১৯৫৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

মকসুদ আলী, সৈয়দ — ঃ রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ ।

মরিয়ম জামিলা — ঃ ইসলাম ও আধুনিকতা
অনু ঃ এ কে এম হানিফ
ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩ ।

মরিস বুকাইলী. ড. — ঃ বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান
অনুঃ আখতারুল আলম
ঢাকা, রংপুর পাবলিকেশন্স লিঃ ১৯৯১ ।

মাহমুদুল হাসান, ড. সৈয়দ — ঃ ইসলামের ইতিহাস
ঢাকা, গোব লাইব্রেরী (প্রা.) লিমিটেড, ১ম প্রকাশ ১৯৭৫ ।

মাহবুবর রহমান ডঃ মুহাম্মদ — ঃ আল্ –সিহাহ আস্–সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা
রাজশাহী, আল–মাকতাবাতুশ্ শাফিঈয়্যাহ, ২০০২ ।

মীম ফজলুর রহমান, — ঃ আল আল–মাউল হুসনা
ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০২

মুহিউদ্দিন খান, সম্পাদনা, — ঃ কোরআন পরিচিতি
ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২ ।

মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, ড. — ঃ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী
অনুঃ আকরাম ফারুক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০২ ।

মুহাম্মদ 'আলী, — ঃ 'উমর ফারুক (উর্দ্দু)
আঞ্জুমানে আহমদিয়া, লাহোর, তারিখ বিহীন ।

মোস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ — ঃ দারিদ্র বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ
ঢাকা, স্টাডি পাবলিকেশন, ২০০২ ।

রফিক কায়সার, — ঃ তিন পুরুষের রাজনীতি
ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭ ।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার, — ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড)
কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এনাড পাবলিসশার্স লিঃ,
১৩৮১ বাংলা ।

রশীদুল আলম, ড. — ঃ মুসলিম দর্শনের ভূমিকা
বগুড়া, সাহিত্যে কুটির, ১ম সংস্করণ ১৯৬৯ ।

রুহুল আমিন, মোহাম্মদ — ঃ ফুরফুরার হযরত পীর ছাহেব
কলকাতা, মোঃ আবদুল মাজেদ, ১৩৪৬/১৯৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

রুহুল আমিন, এম — ঃ বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ।

লায়লা জামান, — ঃ সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯ ।

বজলুল হক, — ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২০ঃ১ জুলাই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ।

বদরুদ্দোজা, সৈয়দ — ঃ কুরআনের জ্যোতি
ঢাকা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৫ ।

বদরুদ্দীন ওমর — ঃ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খন্ড)
ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৮৫ ।
ঃ পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (৩য় খন্ড) চট্টগ্রাম–ঢাকা, বইঘর, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ ।
ঃ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন
ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭ ।
ঃ বঙ্গভঙ্গ ও সম্প্রদায়িক রাজনীতি
কলকাতা, ১৯৮৭ ।
ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলাদেশের কৃষক
ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ।
ঃ আমার জীবন (১ম খন্ড)
ঢাকা, সাহিত্যিকা, ২০০৪ ।

বশির আল্ হেলোল, — ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ।

বিনয় ঘোষ, — ঃ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ
কলিকাতা, ১৯৭৮ ।

শামসুল হক, — ঃ বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সং, ১৯৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুল আলম, এ.জেড এম	ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা চট্টগ্রাম–ঢাকা, বাংলাদেশ, কো–অপারেটিভ বুক সোসাইটি, লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ ।
	ঃ ইসলামি প্রবন্ধমালা ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম মুদ্রন,১৯৮৪ ।
শামসুল হক, গাজী	ঃ ইসলামের দন্ডবিধি ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ ।
শাহ্‌রিয়ার কবির (সম্পাঃ)	ঃ মওলানা ভাসানীঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৮ ।
শাহাবুদ্দীন মুহাম্মদ আলী,	ঃ ইসলাম পরিচিতি ঢাকা, মীরা প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০০২ । নাফিস একাডেমী, করাচী, পাকিস্তান, ১৯৭৯ ।
শিবলী নু'মানী ও সৈয়দ সুলাইমান নাদ্‌ভী	ঃ সীরাতুন নবী, (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড) অনুবাদঃ এ, কে, এম ফজলুল রহমান মুন্সী । ঢাকা, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি, ১৯৮৮ ।
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ From Plassey to Partition অনু কৃষ্ণেন্দু রায় পলাশী থেকে পার্টিশন, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, প্রথম প্রকাশনা, ২০০৪ ।
শেখ সা'দী (সম্পাঃ) মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ	ঃ সহজ গুলিস্তা ঢাকা, আল কাউসার প্রকাশনী, হি. ১৪২০ ।
শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	ঃ ইসলাম: রাষ্ট্র ও সমাজ ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ ।
শৈলেশ কুমার বন্দোপ্যাধীয়	ঃ জিনা পাকিস্তান নতুন ভাবনা কলকাতা, ১৯৮৮ ।
সদরুদ্দীন ইসলাহী, মাওলানা	ঃ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ অনুঃ আব্বাস আলী খান ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

সরকার শাহাবুদ্দিন আহমেদ, ঃ ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র–নজরুল চরিত
ঢাকা–চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ কো–অপারেটিভ বুক সোসাইটি
লিঃ ১৯৯৮ ।

সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত ঃ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্যে
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮ ।

সাইদ উর রহমান, ঃ পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা
ঢাকা, ১৯৬৩ ।

সিরাজ উদ্দীন আহমদ, ঃ শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক
ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭ ।

সিরাজুল ইসলাম, সম্পাদক: ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪–১৯৭১) ১ম খন্ড
ঢাকা, ১৯৯৩ ।

সিরাজুল হোসেন খান, ঃ উপমহাদেশে সামাজিক–রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত
ঢাকা, ২০০২ ।

সুফিয়া আহমেদ, ঃ বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় (১৮৮৪–১৯১২)
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০২ ।

সেলিনা হোসেন ও নূরুপ ইসলাম সম্পাদিত: ঃ বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ ।

স্যার সৈয়দ আহমদ ঃ মালাকালাতে স্যার সৈয়দ (১২ তম খন্ড)
লাহোর, ১৯৬১ ।

হামিদুদ্দীন, ড. ঃ তারিখে ইসলাম
করাচী, ফিরোজ সন্স, ১৯৬৮ ।

হারুনূর রশীদ, মোহাম্মদ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ –এর সমাজ
কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ একটি সমীক্ষা
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ,২০০৪

ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১ ।

হোসাইন হায়কল, মুহাম্মদ, ড. ঃ মহানবীর জীবনচরিত
অনুঃ মাওলানা আবদুল আউয়াল
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল,	ঃ গীতি সংকলন (৩)
জুলফিকার,	ঃ নজরুল-রচনাবলী (১)
ফরিয়াদ, সর্বহারা,	ঃ নজরুল রচনাবলী (১)
	ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।
বঙ্কিম চন্দ্র	ঃ বঙ্কিম রচনাবল (২য় খন্ড)
	সাহিত্যে সংসদ ১৩৬৬।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা নং ঃ ১৯৭১

ইংরেজি গ্রন্থ

Abdul Hamid	: Muslim separtism in India
	Lahore, 1967
Abdur Rahim	: History of the University of Dacca
	Dacca University of Dacca, 1981
Azizur Rahman Mallick	: British Policy and the Muslims in Bengal
	Dacca, Bangla Academy, 1977.
Enamul Haque,	: Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents
	Dacca, Samudra Prokashani, 1968
Fazlur Rahma, M	: The Bengali Muslims and English Education Dacca, Bangla Academy, 1973
Humaira Momen	: Muslim Politics in Bengal
	Paramount Press, Dhaka, 1972
Jamil-uddin-Ahmed	Speeches and Writings of Mr. Jinnah
	Lahore, 1964, Vol.
Kamruddin Ahmed	: A Social History of Bengal
	Dacca, 1970

Dhaka University Institutional Repository

Khaliquzzaman, Cuoudhry	: Path way to Pakistan Longman's Pakistan Branch, 1961
M.M Sharif,	: A History of Muslim Philosophy, V-1 Low Price Publications, Delhi, 1961.
Maulana Muhammad Ali	: The Philosophy of Islam S Chand & Company Ltd, New Delhi.
Muhammad Abdur Rahim,	: Muslim Society and Politics in Bengal A.D 1757-1947, Dhaka, 1978
Muhammad Mohar Ali	: History of the Muslims of Bengal, (1757-1871) V.II A, Riyadh, 1988
Mojibur Rahman	: History of Modrasdh Education Calcutta, 1977
Muin-Ud-Din, Dr	: Muslim Struggle For Freedom in Bengal Islamic Foundation Bangladesh. First Edition, 1960
M. Fazlur Rahman,	: The Bengali Muslims and English Education Dacca, Bangali Academy, 1973
Nazmul Karim,	: Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh.
Peter Hardy	: Muslim of British India Cambridge, 1972

Dhaka University Institutional Repository

Romesh Dutta,	: The Economic History of India in the Victorian Age: London, 1908 (3rd Ed.)
Saiyed Abdul Hai,	: Muslim Philosophy Dhaka, Islamic Foundation Banglish, 1982
Shila Sen,	: Muslim Politics in Bengal 1937-1947 New Delhi, 1976
Sufia Ahmed,	: Muslim Comminuty in Bengal 1884-1912 Dhaka, 1974
Sunil Sarker,	: The swadeshi Morement in Bengal 1903-1908 Dilhi, 1978
Tarachand	: History of the Freedom Movement in India Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1967, V. III.
W.W Hunter	: The Indian Musalmans Bangladesh First Edition, 1975.
William Wordsworth	: Selected Poems Unique Publishers, New Delhi, First Edition, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

কোষ গ্রন্থ/অভিধান

আ, ই উনসিন্ক, ড.	ঃ আল-মু'জামুল মুফাহ্‌রাস লি আলফাজিল হাদীসিন নববী মদীনা, লিডান, ১৯৪৩।
আবুল ফজল মাওলানা আবদুল হাফিজ	ঃ মিসবাহুল লুগাত করাচী, মজলিসে নাসরিয়াতে ইসলাম, ১৯৯২।
আবূ সুফয়ান, মাওলানা ও ফজলুদ্দীন শিবলী, মাওলানা	ঃ ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ (উর্দু বাংলা অভিধান) ঢাকা, রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮।
আবদুল হক ফরিদী, আ, ফ, ম (সম্পাঃ)	ঃ বাংলা বিশ্বকোষ ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২।
এ. বড়াল এম. এসসি	: সাধারণ জ্ঞান ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৬।
এস এম হাবীবুলাহ	ঃ বাংলাদেশের ডায়েরী ঢাকা, গোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৮৪।
জে. জি. হাভা,	ঃ আল ফারায়িজুল দুররিয়্যাহ বৈরুত, ক্যাথলিক প্রেস, ১৯৬৪
ফিরোজুদ্দীন, মৌলবী, আলহাজ,	ঃ ফীরূজুল লুগাত (১ম খন্ড, উর্দু) দিল্লী, ফরিদ বুক ডিপোঃ ১৯৮৭
ফুয়াদ আবদুল বাকী	ঃ আল-মু'জামুল মুফাহ্‌রাস লি আলফাজিল কুর'আন দারুল কুরআনিল কারীম, ১৯৭২।
মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত	ঃ আল কাউসার (আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান) ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬।
সম্পাদনা পরিষদ	ঃ ইসলামি বিশ্বকোষ (২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ১২তম, ১৮শ, ১৯তম, ২৩তম খন্ড) ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
	ঃ আল মুনজিদুল আবজাদী বৈরুত, লেবানন, দারুল মাশরিক, ১৯৮৬।
	ঃ আল মুনজিদ ফিল লুগাত বৈরুত, দারুল মাশরিক, ১৯৯২।
রাজশেখর বসু (সংকলিত)	ঃ চলন্তিকা (আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান) কলিকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৯ বাং

Dhaka University Institutional Repository

Ashu Tosh Dev	: Student's Favourite Dictionary Priti Art press, Dhaka, 1996
As Hornby	: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English Oxford University press, 1974.
Robi Baalbaki, Dr.	: Al-Mowrid (Arabic-English Dictionary) Bayrut, Dar el-lim Limlmalayin, 1996
J Milton cowen,	: A dictionary of Modern written Arabic London, Second Printing 1966

পান্ডলিপি/থিসিস

আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্	ঃ বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁ-ও অবদান পি এইচ. ডি গবেষণাপত্র, ১৯৯৭।
Md. Enamul Huq Khan,	: A.K. Fazlul Huq and Muslim League: 1906-1947 Ph.D. Thesis, The Faculty of Arts, Pan‡jvab University, Chandigarh, 1982
মোঃ তাওহীদুর রহমান	ঃ ""আল্লামা আবুল হাশিম-এর জীবন-দর্শন ও ইসলামি জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর অবদান" ডিসেম্বর ২০০৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত — ঃ বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ
(৯২ তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উদযাপন স্মারক)
প্রকাশকাল ১৯৯৭, ঢাকা ।

মুখলেছুর রহমান, মো (সম্পাঃ) — ঃ ইসলামিক ফাইন্যান্স
ঢাকা, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর' ২০০৪ ।

স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত — ঃ শাহেদ আলী স্মারক গ্রন্থ
চট্টগ্রাম–ঢাকা, বাংলাদেশ কো–অপারেটিভ বুক সোসাইটি
লিঃ, ২০০২ ।

জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত — ঃ সীরাতুন্নবী (সা.) স্মারক ১৪১৯
ঢাকা, ১৯৯৮ ।

অপরাপর অধীত রচনাবলী

আকরাম জিয়া আল উমরী, ড. — ঃ রাসূলের (স:) যুগে মদিনার সমাজ
অনু ঃ মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
ঢাকা, বি আই আই টি, ১৯৯৮ ।

আবদুর রউফ দানাপুরী — ঃ আসাহ্ হুস সিয়ার
অনুঃ আ,ছ,ম মাহ্মুদুল সাঈদ জালালাবাদী
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ ।

আবদুর রহীম, মোহাম্মদ, মওলানা — ঃ নবুয়্যাত ও রিসালাত
ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ ।
ঃ বিবর্তণবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব
ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ ।
ঃ ইষলামী রাজনীতির ভূমিকা
ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭ ।

আবদুল হাই, মুহাম্মদ, ডা. — ঃ ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম
অনু ঃ মুহিউদ্দীন খান
ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান আলী নদভী — ঃ ধর্ম ও কৃষ্টি
অনু ঃ মাওলানা লিয়াকত আলী
ঢাকা, কাসেমিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ ।

আবুল আসাদ — ঃ একশ' বছরের রাজনীতি
চট্টগ্রাম-ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি,
১ম প্রকাশ ১৯৯৪ ।

আ, ন, ম বজলুর রশীদ — ঃ আমাদের সুফী সাধক
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ ।

আস সায়্যিদ সাবিক — ঃ আল আকাঈদুল ইসলামিয়া
বৈরুত, দারুল ফিকার, ১৯৯২ ।

আহমদ মনসুর — ঃ বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স.)
ঢাকা, তাসনিম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ ।

ইবনে ইসহাক — ঃ সীরাতে রসূলুলাহ (স.)
অনুঃ শহীদ আকন্দ
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ।

ইমাম গাযযালী — ঃ এহইয়াউ উলূমিদ্দীন
অনু ঃ মুহিউদ্দীন খান
ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯ ।

উবায়দুলাহ, মুহাম্মদ, মুফতী — ঃ কুরআন সংকলনের ইতিহাস
ঢাকা, দারুল ইফতা ও গবেষণা পরিষদ ১৯৮৬ ।

গরীবুলাহ ইসলামবাদী, মোহাম্মদ — ঃ আশরা মোবাশ্‌শারাহ
ঢাকা, এমদাদিয়া, ১৯৯৬ ।

নূরুল মোমেন — ঃ মুসলিম আইন
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ ।

মতিউর রহমান ও হেদায়েতুল ইসলাম — ঃ ইসলামের তমদ্দুনিক ইতিহাস
ঢাকা, পি, এ কর্পোরেশন, ১৯৬৪ ।

মজীদ খাদ্দুরি — ঃ মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন
অনুঃ আবু জাফর
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ ।

মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি — ঃ ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ অনুঃ শেখ এনামুল হক
ঢাকা, বি আই আই টি, ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ শফী, মুফতি — ঃ সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া
অনুঃ মোহাম্মদ খালেদ
ঢাকা, কুতুব খানায়ে রশীদিয়া, ১৯৯২ ।

মোজাম্মেল হক (সম্পাঃ) — ঃ সীরাতেইবনে হিশাম
অনুঃ আকরাম ফারুক
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০ ।

শায়েখ হাফিয আহ্মদ মোলা জিউন — ঃ নূরুল আনওয়ার
ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তারিখ বিহীন ।

সম্পাদনা পরিষদ — ঃ হযরত রাসূলে করীম (স:) জীবন ও শিক্ষা
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ ।

সাহিদা বেগম — ঃ মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ ।

হাসান আইয়ুব — ঃ ইসলামের সামাজিক আচরণ
অনুঃ এ, এন, এম সিরাজুল ইসলাম
ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৪

Mohmmad Abul Ouasem — : Al-Ghazali on Islamic Guidance
National University of Malysiay 1979

Seraj Mannan, Mohammed — Muslim Political Parties in Banglish (1936-1947)
Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1987